ওরা আজও উদ্বাস্তু

ওরা আজও উদ্বাস্তু

দুলালেন্দু চট্টোপাধ্যায়

শরৎ পাবলিশিং হাউস
৯/৪ টেমার লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশিকা ঃ
ছায়া চ্যাটাজ্জী

প্রথম প্রকাশ ঃ
শুভ মহালয়া—৬ই অক্টোবর ১৯৬৩

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স
৫৭-এ, কারবালা ট্যাংক লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ
খালেদ চৌধুরী

পরমারাধ্যা দেবী স্বর্গীয় মাতার শ্রীচরণকমলে
উৎসর্গ করিলাম।

দুলালেন্দু চট্টোপাধ্যায়

মঙ্গলাচরণ

শ্রীশৈলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলাসাহিত্যে প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'ওরা আজও উদ্বাস্তু' নিয়ে। ভারত তথা বাংলার ইতিহাসের এক চরম সংকটের মুহূর্তে একজন বাঙালী হিসাবে যে জীবনসত্যের তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন, তার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় অনেকের আছে। যে সংগ্রাম ও সাধনার মূল্যে বাঙালী উদ্বাস্তু জীবনের জয়মাল্য অর্জন করেছেন, তার অকথিত ইতিহাস এ কাহিনীতে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত—ধীরে ধীরে একাধিক খণ্ডে তা প্রকাশিত হবে। এ কাহিনী তাই সামান্য পরিচিত হয়েও অনেকখানিই অপরিচিত। যেদিন ভারতবিভাগের সত্য পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হবে সেদিন এই ধূলি থেকে স্বর্গ রচনার কাহিনীর যথার্থ মূল্যায়ন হবে। আজও এ বইয়ের পাতায় আমরা ইতিহাস ও সাহিত্যের যুগলমিলন দেখতে পাবো। যাঁরা উদ্বাস্তু তাঁরা এ বইয়ের দর্পণে নিজেদের প্রতিফলন যেমন দেখতে পাবেন, যাঁরা উদ্বাস্তু ন'ন তাঁরা তেমনি এ যুগের বাঙালী হওয়ার পরিপূর্ণ স্বাদ এ বইয়ের পাতায় পাতায় উপলব্ধি করবেন।

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ছে, কোনো বোম্বেবিহারী ভদ্রজন বলেছিলেন, 'ভগবান বাঙালীকে শাস্তি দিয়েছেন বলেই বাংলাবিভাগ'। হেসে উত্তর দিয়েছিলাম, 'কোন্ সভায় ভগবান আপনাকে এ সংবাদ দিয়েছেন তাতো আমার জানা নেই। কিন্তু বাঙালীর মতামত না নিয়েই দিল্লীতে বসে এই ভাগ করা হয়েছিল'।

পাঠকেরা জানেন, অর্জুনসারথি শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদেরই পক্ষে ছিলেন। দুর্ভাগ্য যাদের সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরতো। এ গ্রন্থের নায়ক 'উদ্বাস্তু' তেমনি একমাত্র নিরস্ত্র ঈশ্বররূপ সারথির সহায়তায় আপন সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে উঠেছেন—জীবনের এই সংগ্রামে ও জয়গানে এ গ্রন্থের সার্থকতা।

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

১৯৫০ সাল।

স্থমিতের তখন শৈশবকাল। সেদিনের অনেক কথাই আজ আর পরিষ্কার মনে করা সম্ভব নয়। তবুও স্থমিতের মনে দাগ ফেলেছিল তার শৈশবের সেই উত্থানপতনের আবর্তিত জীবনের অনেক ঘটনাবলী, আজও যা স্মরণে এলে স্থমিতের মনকে করে তোলে বেদনায় বিহ্বল—অনুভবে চঞ্চল।

স্থমিতরা তখন থাকত কলকাতার খিদিরপুর অঞ্চলের একটা ভাড়া বাড়িতে। তিন ভাই, মা আর বাবা—এই নিয়েই স্থমিতদের ছোট্ট পরিবার। ওর বাবা ছিলেন এ. সি. রায় অ্যাণ্ড কোম্পানীর সাধারণ একজন কেরানী। তখনকার নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এই কোম্পানীটি অনুরূপ অন্যান্য কোম্পানীগুলির মত এজেণ্ট হিসেবে পোর্টের সকল কাজগুলি করত। কোম্পানীতে বাবার ঐ সামান্য কেরানীগিরির আয়ে স্থমিতদের পরিবার সম্পন্ন সচ্ছল না হলেও অসচ্ছল ছিল না, বলা যায়। খাওয়া-পরার কোনো কষ্টই তখন ছিল না তাদের।

দিনগুলি তাদের কাটছিল বেশ। কিন্তু সেই বেশটুকু চিরস্থায়ী হ'লো না। হঠাৎ এলো অকল্পনীয় বিরাট এক পরিবর্তন। পরিবর্তনটা প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গেল তাদের ভাগ্যকে। রাজনীতির কূট চক্রান্তে ওই সময়ে সুরু হয়েছিল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা! অনতিকালের মধ্যেই দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রলয়ঙ্কর ঢেউ গিয়ে আছড়ে পড়ল পূর্ববঙ্গেও। পূর্ববঙ্গেই যে ছিল স্থমিতদের দেশ। পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার অন্তর্গত নলচিটি থানার মালোয়ার গ্রামে ছিল ওদের পৈতৃক বাড়ি।

গ্রামের সেই পৈতৃক ভিটেয় তখন স্থমিতদের সকল নিকট আত্মীয়রা থাকতেন। এদিকে বহুদিন থেকেই চাকুরির সূত্রে বাবা তাদের নিয়ে কলকাতার এক জীর্ণ আশ্রয়ে থাকলেও, তাদের পরিবারের মেরুদণ্ডটা সোজা হয়ে ছিল যে পৈতৃক ভিটেমাটির ভরসায়, সেই ভরসার ভিত টলে

গেল হঠাৎ আসা দাঙ্গাহাঙ্গামার ঢেউ-এর দাপটে। তাদের ভাগ্যের আসল পরিবর্তন তাই বুঝি ঐ দাঙ্গাহাঙ্গার জন্যেই।

দেশ থেকে হঠাৎ একদিন খবর এলো—বাড়িঘর সব জ্বালিয়ে দিয়েছে, গোলার ধান সব নিয়ে নিয়েছে, বাড়ির সকলের জীবন বিপন্ন। এদিকে তখন দৈনিক সংবাদপত্রগুলির সর্বাংশ জুড়ে খবর বেরোচ্ছিল—প্রত্যহই রক্তাক্ত ট্রেনের কামারাগুলি শিয়ালদহে আসছে। পৈশাচিক জিঘাংসার উৎসব থেকে ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া নিঃস্ব-রিক্ত-ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের ভীড়ে ভরে গেল শিয়ালদহ স্টেশন-চত্বর। পূর্ববঙ্গাগত বাঙালী হিন্দুদের তখন সে এক অভাবনীয় ভয়ানক দুর্দিন।

সুমিতদের বাবার উৎকণ্ঠার আর সীমা রইল না। কারণ, তাদের পরিবারের সকলেই তখনও পূর্ববঙ্গে। তাদের কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে শুধু উদ্বাস্তুদের কান্না আর হাহাকার ছাড়া কিছুই জানতে পারা গেল না। সুমিতের ঠাকুরমা তখনও জীবিত। সে ছাড়াও জ্যেঠা-কাকারা দশজন, এক পিসিমা এবং জ্যেঠা-কাকাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রায় সত্তর-আশি জন তখনও পূর্ববঙ্গে তাদের পৈতৃক ভিটেয় বাস করছেন। সেই সব আত্মীয়স্বজনদের কথা ভেবে বাবার মনে শান্তি নেই। উৎকণ্ঠিত বাবা অগত্যা নিরুপায় হয়ে জীবন সংশয় করে ছুটে গেলেন পূর্ববঙ্গে—দেশের বাড়িতে।

ওর বাবা বিপদসংকুল পথে পা বাড়ালেন। এদিকে সুমিতদের মত অপগণ্ড ছোট ছোট কয়েকটি শিশুদের নিয়ে কলকাতার খিদিরপুর অঞ্চলের বাসায় একলা তাদের মা-র কি অবস্থা! আস্বস্থ হবার মতো কোনো খবর কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। পরিবর্তে সর্বত্র শোনা যাচ্ছে—আজ বনগাঁ পেরিয়ে আসা ট্রেনের কামরায় দশটা কাটা মাথা এসেছে। এসব শুনে মায়ের কি উৎকণ্ঠা! মায়ের চোখে ঘুম নেই, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনো মন নেই—শুধু ভাবনা আর ভাবনা!

দিন দশবারো পর একদিন বাবা ফিরে এলেন কলকাতার বাসায়। একাকী নন, পূর্ববঙ্গ থেকে তাদের বৃহৎ পরিবারের প্রায় পঞ্চাশ জন চলে আসতে পেরেছেন বাবার সঙ্গে—ভগবানের দয়ায় অক্ষত শরীরে। কিন্তু সমস্যা হল সুমিতদের কলকাতার ভাড়া-বাড়িতে অত লোক থাকবে কোথায়? তাদের সর্বসাকুল্যে ছোট্ট দুটো ঘর। তবু ওরই মধ্যে সকলকে সঙ্গে নিয়ে থাকতে হ'ল। আহা! নিরাশ্রয় হয়ে ওঁরা সকলে

কলকাতায় চলে এসেছেন। ওদের জীবনের ভরসা এখন শুধু সুমিতদের বাবা। তৎক্ষণাৎ অন্যত্র জায়গা পাবার আর কোনো উপায়ও নেই। উপায়ান্তর না পেয়ে চৌকির ওপর চৌকি ফেলে প্রতি ঘরেই তিনতলা তৈরী করে নেওয়া হ'লো। তার মধ্যেই গুঁড়ি মেরে থাকতে হ'লো সকলকে। দায়ে পড়লে মানুষে আর পশুতে কোনো তফাৎ থাকে না।

কিন্তু - বিপদের ওপর বিপদ। ঐ সময়ে প্রধান খাদ্য 'চাল' কণ্ট্রোল করা হ'ল। চালু হল রেশন প্রথা। পয়সা থাকলেও বাজারে চাল পাওয়া প্রায় অসম্ভব হতে লাগল। এই সময়ে সুমিতদের বাবাই তখন গোটা সংসারের একমাত্র চাকুরে। আয় যতই হোক না কেন, এতবড় সংসার একলা চালাতে খুব কষ্ট হতে লাগল। তবুও ওর বাবা একবারের জন্যও তাঁর ভাই বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের ঐ কষ্টের কথা বুঝতে দেননি। গোপনে মায়ের সংগে পরামর্শ করতে লাগলেন বাবা। একে একে মায়ের গা এবং বাক্স থেকে তার গয়নাগুলি উধাও হতে লাগল।

এখনও সুমিতের অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলির কথা। বাবা কর্মস্থল থেকে ফিরেই প্রত্যহ ছুটে যেতেন সুদূর মেটিয়াব্রুজ পর্য্যন্ত চালের সন্ধানে! তিনটি বছর এমনিভাবে কেটেছে সুমিতদের। কি কষ্টেই না বাবা তাঁর আশ্রিত সকল অত্মীয়স্বজনদের ভরণপোষণ চালিয়ে গেছেন! জীবন-মরণ সংগ্রামের সে দিনগুলির কথা মনে এলে আজও শিউরে উঠতে হয়।

ধীরে ধীরে তারপর আত্মীয়স্বজনরা সকলেই কলকাতার সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলেন। যেমন করেই হোক কিছু একটা চাকুরী বা উপার্জনের পথ পাবার আশায় হন্যে হয়ে সবাই খুঁজতে সুরু করলেন। তখন চাকুরীর বাজার আজকের মত এতো কঠিন ছিল না। ১৯৫৩ সালের মধ্যে ওরা সকলেই চাকুরী সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন। আত্মীয়স্বজনের মিলিত কষ্টের গ্রন্থিতে বাঁধা সুমিতদের যৌথ পরিবার আর রইল না। চাকুরী পাওয়ামাত্র যে যার মত আলাদা বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে যেতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে ওরা যখন সকলেই বাসা ছেড়ে চলে গেলেন, তখন দেখা গেল যে সুমিতের বাবা একেবারে রিক্তহস্ত হয়ে গেছেন। আর মা তাঁর শেষ সম্বলটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন। এমন রিক্ততার মাঝেও মা-বাবার মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না। প্রায়ই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন—যা গেছে তা যাক্, ওরা তো বেঁচেছে। সময়মত আবার সব করে নেওয়া যাবে।

ওদের ওই 'করে নেওয়া'র স্বপ্নটা তারপর হঠাৎ একদিন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এরপর এক অকল্পনীয় মোড়ের মুখোমুখি হল সুমিতদের গোটা পরিবারের ভাগ্য।

সুমিত তখন সবে খিদিরপুরের জনৈক গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। কোন বোন নেই ওদের, শুধু তিনটি ভাই ওরা। তিন ভাই-এর মধ্যে সুমিতই সবার বড়। অর্থাৎ এ বাড়ির ও-ই প্রথম সন্তান। প্রথম সন্তানের প্রতি সকল বাবা-মায়েরই বোধহয় একটু অতিরিক্ত নজর থাকে। বলাবাহুল্য, সুমিতের প্রতিও তা ছিল। এতদিন আত্মীয়-স্বজনেরা এসে ভীড় করায় সেই নজর থেকে সুমিত অবশ্য সাময়িক বঞ্চিত হয়েছিল। সেজন্য কিন্তু কোনো ক্ষোভই মনে দানা বেঁধে ওঠেনি।

তারপর আত্মীয়রা সবাই ধীরে ধীরে সুস্থির জীবনে চলে যেতেই তাদের বাবা-মা কিছুটা হাল্কা হলেন। তাদের দিকে আবার পুরোপুরি মন দিতে পারলেন। কোন বোন না থাকায় সেদিক থেকে দায়দায়িত্ব কমই ছিল। তবুও দুঃসময়ে আত্মীয়দের আশ্রয় দিতে ও প্রতিপালন করতে যে দেনা করতে হয়েছিল তা প্রথমেই শোধ দিতে শুরু করলেন ওর বাবা।

হঠাৎ অকল্পনীয় ভাগ্যের সেই মোড়টা এমনি সময়েই দেখা দিল। এরূপ মোড়ের মুখে এলে সকলেই সচরাচর বলে থাকেন—ইস্ ভাগ্যদেবতা কি নিষ্ঠুর !

হ্যাঁ, নিষ্ঠুরই বটে। আজও নির্জন অবসরে মায়ের সেই বুকফাটা কান্নাটা এক এক সময় হঠাৎ মনে পড়ে সুমিতের। ভুক্তভোগী ছাড়া সেই কান্নার ভয়াবহতা কেউ বুঝতে পারবে না। সেই রাতের কথা পরিষ্কার মনে আছে সুমিতের, যে রাতে তাদের মা চিৎকার করে কান্না শুরু করেছিলেন।

ওকি ! মা আর্তস্বরে কাঁদছেন কেন ? মায়ের অমন কান্না এর আগে তো কোনদিন শোনেনি তারা। কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল সুমিতের। দৌড়ে এগিয়ে গেল মা-বাবার বিছানার কাছে। দেখল বাবার বুকের ওপর অস্থিরভাবে হাত বুলোতে বুলোতে মা তখনও কাঁদছেন। ব্যাপারটা কি কিছুই বুঝলো না সুমিত। ইতিমধ্যে পাড়ার সকলেই ছুটে এলেন। ফিসফাস কথাবার্তা হচ্ছিল সকলের মধ্যে। কে যেন ছুটে গেলেন ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনতে। ডাক্তারবাবু কাছেই থাকতেন।

তাঁর নাম ডাঃ অজিত মুখার্জী। এক পাড়ায় পাশাপাশি বসবাসের দরুণ এই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সুমিতদের বাবার বহুদিনের বন্ধুত্ব ছিল।

লোকটির সাথে সাথে ডাক্তারবাবু এলেন। ডাক্তারবাবুকে দেখে মায়ের কান্না থামল। অন্য সবাইও চুপ। রাত তখন সাড়ে তিনটে হবে। ঘরে ঢুকেই গম্ভীরমুখে এগিয়ে গিয়ে একবার শুধু বাবার হাতটা তুলে কি যেন দেখলেন ডাক্তারবাবু, তারপর আস্তে বাবার হাতটা পাশে নামিয়ে রেখে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর তখনই মা আবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

কিছু না বলে ডাক্তারবাবু কেন বেরিয়ে গেলেন, মা কেন আকুল হয়ে আরো জোরে কেঁদে উঠলেন, উপস্থিত সকলের মুখ অত থমথমে কেন—এ সবের কিছুই সুমিত বুঝলো না। তবে ওর মনে আছে কে যেন ফিসফিসিয়ে বলেছিল : মারা গেছে!

মৃত্যু কি, অথবা বাবা মারা গেলে কি ক্ষতি হতে পারে কোন ধারণাই সুমিতের ছিল না। তখন সুমিতের বয়স সবেমাত্র সাত। আজও তার আবছা মনে পড়ে···বাবার মৃতদেহটার ওপর কতবারই না সে হামাগুড়ি খেল, নাক ধরে কত টানল, হাত ধরে নাড়ল কত বার। বাবা কিন্তু নিশ্চল পাথরের মত টানটান হয়ে শুয়েই রইলেন।

পাড়ার লোকজন সুমিতদের সকল আত্মীয়স্বজনদের খবর দিয়ে নিয়ে এল। রাতের অন্ধকার কেটে ভোরের ফিকে আলো তখন সবেমাত্র বাড়ির উঠোনে এসে পড়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই লোকজনেরা নিয়ে এল একটা দড়ির খাটিয়া। সেই খাটিয়ায় নতুন করে বিছানা পেতে ওর বাবাকে শুইয়ে দিল। ওদের মধ্যে সুমিতদের জ্যেঠা-কাকারাও ছিলেন।

শেষ যাত্রার পূর্বমুহূর্তে কাকারা সুমিতকে বললেন : তোকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

যেতে হবে! ওদের সঙ্গে যেতে হবে! বাঃ কি মজা! এর আগে বাড়ির বাইরে কেউ কখনও সুমিতকে নিয়ে যায়নি। স্কুল আর বাড়ি ছাড়া কলকাতার কিছুই চিনত না। অতএব সাথী হবার জন্য ওদের এই ডাকে সুমিত কিন্তু খুশীই হল। পূর্ব-গগনে সূর্য্য লাল শিখা নিয়ে সবে তখন জাগছে।

ওদের আত্মীয়স্বজনরা খাটিয়াটা কাঁধে নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরোলেন।

বাড়ীর ভিতরে গগনভেদি 'বল হরি, হরি বল' চিৎকারটা দেওয়ালে আঘাত খেয়ে ভন্ ভন্ করে ঘুরছে। আপনজন ও প্রতিবেশীদের কান্নার রোল নতুন করে শুরু হয়ে গেল। সুমিতও চলল ওদের সংগে। সুমিতের পরনে একটা হাফ্প্যাণ্ট আর একটি জামা। সুমিতের হাত ধরে রাখল তাদেরই এক জ্যাঠ্তুতো দাদা। তার নাম শোভন।

মা তখন আছাড়ি-বিছাড়ি করে কাঁদছেন। বীভৎস হয়ে উঠেছে মায়ের মুখটা। জ্যাঠাইমা ও কাকীমারা সকলেই মাকে জাপ্টে ধরে রাখতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। পিছন ফিরে ঐ দৃশ্য দেখে সুমিতের মনে হলো মায়ের কাছে একবার ছুটে যাবে। মা কেন অমন করছেন! কিন্তু না, কোনো উপায় নেই। সুমিতকে সবাই তখন শক্ত করে ধরে রেখেছেন। অগত্যা ঐ অবস্থায় মাকে রেখে সুমিতও সকলের সংগে বাইরে বেড়িয়ে পড়ল। বোধহয় সেইদিন প্রথম সুমিত সকলের সংগে শোভনদাদার হাত ধরে ডায়মণ্ডহারবার রোড পেরিয়ে জর্জ কোর্ট রোড-এর ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল কালীঘাটের দিকে।

পায়ে হেঁটে একসংগে এগোচ্ছে সবাই। দু'একটি করে দু'ধারের দোকান-পাট সবে তখন খুলছে। অগ্রবর্তী সংগীরা মাঝে মাঝে বলে উঠছে: বল হরি, হরিবোল। একজন কাগজের ঠোঙ্গা থেকে খই আর পয়সা ছড়াতে লাগল। ভোরের পাখীরা মহানন্দে তার সদগতি করছে। নিজেরা ঝগড়াও করছে।

যা খুশী বলুক না ওরা। সুমিত ওসবের কিছুই বোঝে না। সে শুধু পথ চলার আনন্দে বিভোর। তার মন বার বার উদ্বেল হয়ে উঠছে নতুন নতুন অনেক কিছু দেখার আনন্দে। মনে কোনো উদ্বেগও নেই। খাটিয়ার ওপর শুয়ে থাকা ওর বাবাও তো সংগেই যাচ্ছেন। তবে আর চিন্তা কি? পাশ দিয়ে মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছে কত রকমের গাড়ী, কত ট্রাম-বাস, কত লোকজনের কোলাহল—কী মজাই না লাগছে।

সুমিত দু'চোখ ভরে ঐসব দেখতে দেখতে চলেছে। না, সবাই সংগে থাকায় এত পথ হেঁটে যেতে তার কোনো কষ্টই হচ্ছে না। সেণ্ট্রাল জেলের পাশ দিয়ে এগিয়ে কালীঘাট ব্রিজ পেরিয়েই বাঁক ঘুরে স্বল্প পরিসর কালীঘাট রোড বরাবর চলতে চলতে অবশেষে একসময় সকলে পোঁছে গেল কেওড়াতলা মহাশ্মশানে।

এতক্ষণ ধরে কাঁধে করে বয়ে আনা খাটিয়াটা এখন একটা চিতার পাশে

নামানো হ'ল। সবাই ঘিরে রইল বাবার খাটিয়াটা। কি আশ্চর্য্য! এত হৈ-হট্টগোলেও বাবা কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছেন। সুমিত তখনও বুঝতেই পারছে না এ সবের অর্থ কি? অবাক হয়ে সে তাদের আত্মীয়স্বজনদের ছোটাছুটি লক্ষ্য করছে। অল্প সময়ের মধ্যেই একটা চিতায় কাঠ সাজানো হয়ে গেল। পাশের বিশ্রাম ঘরে সুমিতকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। শোভনদাদা তখনো তার হাত ধরে পাশেই বসে।

সুমিত দেখল, একটু পরে কয়েকজন তাদের বাবাকে ধরাধরি করে খাটিয়া থেকে তুলে জড়োকরা কাঠগুলির ওপর শুইয়ে দিল। সে বুঝতেই পারছে না বাবাকে নিয়ে এত সব কি করছে ওরা? কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। সেই কাঠের ওপর ঘুমন্ত বাবাকে শোয়ানো হলো কেন?

এবার সকলে সুমিতকে ধরে নিয়ে গেল বাবার কাছে। পুরোহিত তারপর বিড় বিড় করে যা বললেন সুমিতকেও তার কিছু কিছু বলতে হলো। পুরোহিতের আদেশমত চাল, তিল ও ঘি মিশিয়ে পিণ্ড তৈরী করে বাবার মুখে ছোঁয়াতে হল। তবুও সে মাঝে মাঝে ভাবছিলো, এতো কাণ্ডেও বাবার ঘুম ভাঙছে না কেন?

একটু পরেই কে যেন সুমিতের হাতে এক আঁটি পাটের কাঠি গুঁজে দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। সকলের নির্দেশে সেই জ্বলন্ত কাঠিগুলি হাতে নিয়ে সে কাঠগুলির ওপর ঘুমিয়ে থাকা বাবার চারিদিকে কয়েকবার ঘুরল। এবার সকলে তাকে তার হাতের সেই জ্বলন্ত কাঠিগুলি বাবার মুখে চেপে ধরতে বলল।

বয়স ও অনভিজ্ঞতার দরুণ মৃত্যুটা হয়তো তখনও সুমিতের বোধগম্যের বাইরে, কিন্তু তবু সুমিত বুঝতো কোনো লোকের মুখে কখনো জ্বলন্ত আগুন চেপে ধরা যায় না। তাই সে 'আমি বাবার মুখে আগুন চেপে ধরবো না' বলে কাঁদতে শুরু করল। সুমিতের চোখের জলে কারও করুণার উদয় হল না।

তার প্রতিবাদমুখর কান্নাটাকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করলেন না কেউ। জ্যেঠামশাইদের একজন শক্ত করে হাত চেপে ধরে সুমিতের হাতের জ্বলন্ত আগুনটা ঠেসে ধরলেন বাবার মুখে। পরক্ষণেই ওই আগুনটা সকলের কথামতো চিতার আসপাশের ফোকরের মাঝ দিয়ে কাঠগুলির নিচের দিকে দিতে হলো। সবাই তখন চারিদিক থেকে আরও জ্বালানি

কাঠিগুলির যোগান দিতে লাগল। আর শুধু চিৎকার, বলহরি,, হরিবোল। দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই চারদিকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে লাগল কাঠগুলিতে আগুনের লেলিহান শিখা। দেখে শিউরে উঠেছিল সুমিত। একি! এত জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে বাবাকে শুইয়ে রাখা হ'লো কেন? তবে কি বাবাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে?

দারুণ ভয় পেয়ে সুমিত কান্নায় মাটিতে গড়াতে শুরু করল। কিন্তু কে শোনে কার কথা। তাকে তার দাদা শোভন জোর করে ধরে নিয়ে শ্মশানের বাইরে চলে গেল। নানা কথা দিয়ে ভুলিয়ে তাকে অনেকক্ষণ বাইরে বাইরে আটকে রাখা হ'লো।

ঘণ্টা দুই পরে যখন আবার শ্মশানের মধ্যে সুমিতকে নিয়ে আসা হ'লো তখন বাবার চিহ্নটুকুও নেই। সকলে মিলে তাকে ধরে নিয়ে গেল গঙ্গার ঘাটে। হাঁড়িতে করে জল বয়ে এনে বাবার চিতায় ঢালতে হলো বারকয়েক।

এরপর এল ফেরার পালা।

দল বেঁধে সকলেই আবার বাড়ির দিকে যাচ্ছে। সুমিতও আছে ঐ দলে। এবার কিন্তু ওদের সঙ্গে আর সুমিতদের বাবা নেই। সুমিতের অভিমানি মনটা গুমরে গুমরে কেবলই তখন বলতে চাইছে: কেন—কেন ওরা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এলো না? কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল বাবা!

বাড়ি পৌঁছুতেই শুনতে পেলো মেয়েদের সমস্বরে কান্না। দলের সবাই একে একে আগুন ছুঁয়ে আর কি সব যেন মুখে দিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। এই সব আচার অনুষ্ঠান করতে করতেও সুমিত তখন তার মাকে খুঁজছে। উদ্বেগভরে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ দেখতে পেলো মাকে। ঘরের দেয়ালের এক পাশে মা বসে আছেন। বিষাদভরা মুখ। এখন যেন স্নান করেছেন, মাথার চুলে একটুও তেল পড়েনি। সিঁথিতে সিন্দুর নেই, দু'হাতেও নেই কোন গয়না। পরণে একখানা থান কাপড়। একেবারে নিথর—মূক—নিস্তব্ধ।

মায়ের ঐ বেশ এবং ভাব দেখে একটু থমকালেও সুমিত মুহূর্ত মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো মায়ের কোলে। মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করল, ওরা বাবাকে কোথায় রেখে দিয়ে এলো?

প্রত্যুত্তরে নিরুদ্ধ কান্নায় আবার ভেঙে পড়লেন মা।

বাবা যে চিরদিনের জন্য তাদের ছেড়ে চলে গেলেন তা বুঝবার মত বয়স তখনো হয়নি সুমিতের। সুমিতের মেজো ভাইএর নাম অমিত, সে সময়ে তার বয়স সবে মাত্র পাঁচ। সে তখন বাড়ির বারান্দায় ছোটা-ছুটি করছে। ওর মনে আনন্দের সীমা নেই। বাড়িতে কত লোক! আর ছোটভাইএর নাম অজিত; সে তো তখন মাত্র তিন মাসের। সে ও কাঁদছে, তবে দুধ খাবার জন্যে। জ্যাঠাইমাদের মধ্যে একজন ওকে দুধ খাইয়ে দিলেন।

এরপর শুরু হ'লো সুমিতদের নতুন জীবন। গলায় পরতে হলো ধড়া। মা কচি কচি তিনটি শিশুদের সম্বল করেই নতুন জীবনে পা বাড়ালেন।

অশৌচ পালন করতে হয়েছিল এগার দিন। এই সময়ের মধ্যে বহু আত্মীয়স্বজনে সুমিতদের বাড়িটা আবার ভরে গিয়েছিল। বাবার অনেক বন্ধুরাও এসেছিলেন। সকলেই হাতে নিয়ে এসেছিলেন ফল, ঘি আর আতপ চাল। বাবা যে কোম্পানীতে চাকুরী করতেন সেই কোম্পানীর মালিক এলেন অশৌচকালের মধ্যে একদিন। কিছু টাকাও তিনি দিয়ে গেলেন মায়ের হাতে। বাবার শ্রাদ্ধশান্তির কাজটা হয়েছিল বিশুবাবুর লেনে সুমিতদের এক জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি। ও'র নাম শ্রীশচীন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়। বাবার শ্রাদ্ধের সমস্ত কাজটা উনি বিশেষভাবে দেখাশোনা করেছিলেন।

তের দিনের দিন মৎসমুখ। এদিনের একটি ঘটনার কথা সুমিতের হয়তো চিরদিন মনে থাকবে। সব আত্মীয়স্বজনদের এদিন নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। বাড়ি ভরতি লোকজন। সকলেই ব্যস্ত, দুপুরবেলা খাবার আয়োজন করা হয়েছে। মা সুমিতের ছোটভাই আর মেজভাইদের নিয়ে ঘরের এক কোণে বসে কাঁদছেন। সুমিত কিন্তু ছুটে ছুটে বাড়ির লোকজনদের দেখছে আর এক একবার মাকে খবর দিতে ছুটে যাচ্ছে, আবার মাকে কাঁদতে দেখেই ছুটে পালিয়ে চলে আসছে মায়ের কাছ থেকে।

এমন সময় একদল নিমন্ত্রিতদের খাওয়ানো শুরু হ'ল। লোকজন খাচ্ছে। এবার এল মাছ দেবার পালা। একটা একটা করে বড মাছের

টুকরো প্রত্যেকের পাতে পড়ছে দেখে সুমিতও বায়না ধরল : আমাকে মাছ দাও, এখনি আমি মাছ খাব।

ছোটবেলা থেকে সুমিত মাছ খেতে ভালবাসত। সে ভাবতেও পারেনি যে এদিনের মাছ খাবার একটা অন্যরকম বিশেষ নিয়ম আছে। কিন্তু অতশত নিয়ম মেনে চলবার মতো বোধশক্তি তখনো তার হয়নি। তার আবদারে কান না দেওয়ায় প্রচণ্ড কান্না জুড়ে দিল। জ্যাঠামশাইর সংগে অন্যান্যরাও তাকে কত বোঝালেন।

কিন্তু বোঝবার পাত্র সে নয়। ওরা তো কেউ জানেন না যে সুমিতের মাছ খাবার এই বিশেষ আবদার তার বাবা চিরদিনই রক্ষা করেছেন। তাই যতই ওরা তাকে বোঝান না কেন, তার মাছখেকো মন কিছুতেই বুঝ মানল না। মুহূর্তমধ্যে সেই নাছোড়বান্দা বায়নাটা স্থান ও কালের কোনোরকম তোয়াক্কা না করেই উত্তরোত্তর বেড়ে উঠে ক্রমশঃ একটা অভাবিত পরিণতির মধ্যে তাকে ঠেলে দিল।

অবশেষে রেগে গেলেন জ্যাঠামশাই। অশেষ সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে যিনি নিজের দায়িত্বে শ্রাদ্ধাদির সবদিক সুষ্ঠুভাবে পরিদর্শন করছিলেন তিনিই অধৈর্য হয়ে তার মৃত ভাইএর প্রিয় পুত্রের গালে ঠাস্ করে একটা চড় মারলেন মাছ খাবার বায়নার জন্যে। তবু বায়না থেকে সুমিতকে কিছুতেই নিবৃত্ত করা গেল না। সে অবিরাম কাঁদতেই থাকল 'মাছ খাব' বলে। অসহিষ্ণু জ্যাঠামশাই তারপর আনলেন বেত। মৎসমুখের দিন সকলে যখন মৎসমুখ করছেন তখন সেই ভোজের আসরে সবার সামনেই সুমিতের পিঠে সপাং সপাং করে পড়তে লাগল বেতের পর বেত। তার পিঠে লম্বা লম্বা বেতের দাগ ফুটে উঠতে থাকল আর অসহায় মা তাকে জড়িয়ে ধরে শুধু কাঁদতেই থাকলেন।

আজও কোনো অসতর্ক মুহূর্তে পিঠে হাত পড়লে তার মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে সেদিনের দৃশ্যটা এবং এই সঙ্গে মনে পড়ে যায় মাছ খাওয়া নিয়ে মায়ের মুখে শোনা আর একটি গল্পের কথাও।

···সুমিত নাকি কখনও একটি মাছ খেয়ে খুশী হতো না। একদিন ভাত খেতে বসেছে, তার থালায় দেওয়া হয়েছে একটা কৈ মাছ। মাত্র একটা মাছ দেখেই সে বেঁকে বসল : না, ঐ একটা মাছে আমার চলবে না। অন্ততঃ আরও একটা বড় গোছের মাছ চাই।

সেদিনের মাছগুলো বোধহয় হিসেব করাই ছিল। কিন্তু হিসেবের ধার

ধারতে তার বয়ে গেছে। খাবার জিনিষ ইচ্ছামত পেতেই হবে তাকে। মাছের জন্যে তার যত কান্না বাড়ে, মায়ের বাড়ে রাগ। শেষে তার অসহ্য কান্নায় বিরক্ত হয়ে মা নিজেই ওর থালাটি সামনে টেনে নিয়ে থালার ভাতগুলো ঝোলে মেখে ঐ মাছটা দিয়ে খেয়ে নিলেন। এই দেখে সে তো হতবাক্—হাঁ করে মায়ের দিকে চেয়ে রইল। যখন দেখল খাওয়া শেষে ওর থালাটা পর্যন্ত নিয়ে চলে গেলেন মা, তখন মাটিতে গড়াতে লাগল সে। মা রেগে গুম্ গুম্ করে কয়েক ঘা তার পিঠে বসিয়ে দিলেন। তখন তার কান্নার চিৎকারে পাড়াশুদ্ধ লোক অস্থির।

এমন সময় হঠাৎ কি কারণে বাবা অফিস থেকে ফিরে এসেই দেখলেন সুমিত মাটিতে গড়াচ্ছে এবং সকল ব্যাপারটা জানতে পারলেন। সব শোনামাত্র নিজেই চলে গেলেন রান্নাঘরে। নিজের হাতে নিয়ে এলেন সবগুলি মাছ। পাঁচটা কি মাছ দিয়ে ভাত খাইয়ে সুমিতকে শান্ত করলেন ওর বাবা।···

হায়রে! সেদিন আর এদিন? আজ বাবার শেষ কাজ সুমিতের ভাগ্যে শেষ হল আজ তার জ্যাঠামশাইএর বেত খেয়ে! বাবার প্রতি সকলের শেষ কর্তব্য সেদিন হাসিকান্নায় এমনি করেই শেষ হ'ল। নিমন্ত্রিতরা সকলেই এসবের জন্য বহু দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর আহারান্তে বাবার প্রশংসা ও সুনাম করতে করতে যে যার বাড়ি চলে গেলেন। দিনশেষে বাড়ির এক ঘরের কোণে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রইল সুমিতরা তিন ভাই, তাদের মা, আর এদিকে ওদিকে ছড়ানো ছিটানো ভুক্তাবশিষ্ট এঁটোকাটাময় খানকয়েক কলার পাতা।

সবাই চলে যাবার পর একসময় জ্যাঠামশাই এলেন মায়ের কাছে। নিত্যকার অভ্যাসমত নাম ধরে ডেকে মাকে বললেন, সুনন্দা, যে চলে গেছে তাকে তো আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। এখন শোকে দুঃখে ভেঙে পড়লে চলবে না। ধৈর্য্য ধরতে হবে, তোমাকে কষ্ট করে সকলের মধ্যে থেকে ওদের মানুষ করতে হবে। আমরা তো আছি, তোমার চিন্তা কি?

মা নিরুত্তর। কারণ ও কথার ওপর মতামত জানাবার মত তার ভাষাও নেই—যোগ্যতাও নেই।

শচীন্দ্রবাবু কেন অগ্রণী হ'য়ে মাকে ওকথা বললেন তার সাম্ভাব্য কারণ জানাতে একটু গোড়া থেকে বলতে হয়।—সুমিতদের ঠাকুরমার এগারো ছেলে, এক মেয়ে। ছেলেদের মধ্যে সুমিতদের বাবার স্থান ছিল

দশম। ছেলে হিসেবে দশম স্থান হলেও সকল ভাইদের এবং বোনের কাছে বাবার বেশ আলাদা রকমের মর্যাদা ছিল। সবাইকার কাছ থেকে বাবা মর্য্যাদা পেয়েছেন হয়তো তার উপার্জন উদারভাবে সকলের প্রয়োজনে ব্যয় করতেন বলে। কি আত্মীয় কি অনাত্মীয়—সকলের কাছে সুমিতদের খাতিরটাও ছিল ঐ জন্যেই। এর ওপর দেশ ভাগের পরিণতি হিসেবে বহু আত্মীয়স্বজনরা উদ্বাস্তু হ'য়ে ওর বাবা-মার আশ্রয়ে কয়েকটি বছর বসবাস করায় তাদের খাতির বা মর্য্যাদা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সে আর কদিন! সে সৌভাগ্য সুমিতদের বেশিদিন সইল না। বাবার শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার পরই তা শেষ হয়ে গেল। আত্মীয়রা যখন আবার সচ্ছল জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন এবং সম্ভবত ওদের ঝক্কি সামলাতে গিয়ে অকালেই বাবার প্রাণটা চলে গেল তখন হতভাগ্য সন্তানদের নিয়ে মাকে আশ্রয়ের জন্য ধর্ণা দিতে হল ওদেরই এক পরিবারে।

তখনকার দিনে কোনো পরিবারের রোজগেরে কর্তাব্যক্তিটির অকালে মারা যাওয়া মানে গোটা পরিবারই ভিখারী হয়ে যাওয়া। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা তো ঐ আমলে ছিলই না। অন্য কোনো রকমের সাহায্য আসার রেওয়াজ না থাকায় মৃত্যুর পর বাবার কোম্পানী থেকেও সুমিতরা কিছুই পেলো না।

এ সত্বেও আশায় বুক বেঁধেছিলেন সুমিতের মা। হয়তো ভেবেছিলেন তার স্বামী বেঁচে থাকতে যেমন সকল আত্মীযস্বজনদের জন্য করেছেন তেমন এই বিপদের দিনে সেই আত্মীয়স্বজনরাও তাদের জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করবেনই।

হ্যাঁ, ওরা করেছিলেন বৈকি। সাময়িক হলেও তাদের জন্য ব্যবস্থা একটা হয়েছিল। উদ্যোগী হ'য়ে ব্যবস্থাটা করেছিলেন শচীন্দ্রবাবু।

শচীন্দ্রবাবু খুবই কর্তব্যনিষ্ঠ সজ্জন ব্যক্তি। না হলে অমন নিদারুণ বিপদের সময় কোনোরকম দ্বিধা না করে তাদের আশ্রয় দেবার জন্য আগ-বাড়িয়েই বা আসবেন কেন? অন্যান্য দাদাদের চেয়ে বাবার প্রতি বরাবরই শচীন্দ্রবাবুর টানটা ছিল একটু বেশী।

সুমিতরা শুনেছে, ছোটবেলায় তাদের বাবা এবং ওরা দেশের বাড়িতে এক মাটিতে খেলা করেছেন, পড়াশুনা করেছেন—এমনিভাবে এক ছাউনির নিচে থেকে, সুখে দুঃখে বহুদিন যাবৎ একত্রে বসবাস করেছেন।

শৈশবের সেই স্মৃতির রেশ ধরেই বোধ হয় বাবার প্রতি ও'র আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিল না। কর্তব্যবুদ্ধির তাড়নায় তাই বুঝি ভেবেছিলেন যে বাবার মৃত্যুর পর সুমিতরা যাতে একেবারে ভেসে না যায়।

সকলের পরামর্শ এবং শচীন্দ্রবাবুর বিশেষ আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে সুমিতরা তাদের এতদিনকার পৈতৃক ভাড়া বাড়িটা ছেড়ে দিল। একদিন মালপত্র নিয়ে মায়ের হাত ধরে তারা তিন ভাই চলে এলো বিশুবাবুর লেনে তাদের ঐ জ্যাঠামশাই শ্রীশচীন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে।

স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকা ঐসব ঘটনার কথা আজও যখন সুমিতের মনে পড়ে তখন ঐ জ্যাঠামশাই-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় তার মাথাটা নত হয়ে যায়।

কিন্তু তাদের আশ্রয়দানকে কেন্দ্র করে পরবর্তী সময়ে শচীন্দ্রবাবুর পরিবারে যে অশান্তি এবং দুর্যোগের ঝড় বয়ে গেল তা যেমন দুঃখজনক তেমনি কণ্টকর হয়ে উঠল সুমিতদের পক্ষে।

জ্যাঠাইমার মোটেই মত ছিল না সুমিতদের আশ্রয় দেবার। জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে আসার পর তাদের মা তা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন। দু'এক দিন যেতে না যেতেই পাড়াপড়শিদের ডেকে জ্যাঠাইমা আভাসে ইঙ্গিতে শোনাতে লাগলেন: দেখেছো, কর্তাকে নিয়ে আর পারা যায় না; কোথায় নিজের সংসারটা দেখবেন, তা নয় যতো সব উট্‌কো ঝামেলা ঘাড়ে আনলো।

একদিন পাশ দিয়ে যেতে যেতে মা শুনতে পেলেন জ্যাঠাইমার মুখের ঐ মন্তব্যটা।

ইচ্ছে করেই সুযোগ বুঝে মন্তব্যটা সকলের কাছে সোচ্চারে ব্যক্ত করলেন জ্যাঠাইমা যাতে পরোক্ষে মায়ের কানে কথাটা যায়।

অথচ শচীন্দ্রবাবু যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন ততক্ষণ দেখা যেত, বাড়ির সব লোকেরা যেন সুমিতদের জন্য বিশেষ চিন্তিত। তাদের ভাল হবে এমন কিছু একটা করবার জন্য ওদের কি ব্যস্ততা।

শচীন্দ্রবাবু তো সব সময়েই বাড়িতে উপস্থিত থাকতেন না। তাঁকে নানা কাজে বাড়ির বাইরে যেতেই হত। তিনি বাড়ির বাইরে পা দেওয়ামাত্র বাড়ির মধ্যে সুমিতদের নিয়ে নানান রকম জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে

যেত। অদ্ভুত এই অবস্থা মাকে সহ্য করতে হ'য়েছে দিনের পর দিন।

কিছুদিন যাবার পর ভালো করবার বাহ্যিক ঐ ভণিতাটুকুও খসে গেল। আশ্রিত হ'য়ে তাদের থাকার ব্যাপারটা দীর্ঘস্থায়ী হ'তে পারে ভেবে শঙ্কিত হ'য়ে জ্যাঠাইমা নানা অছিলায় মাকে শোনাতে লাগলেন : নিজেরটা খেয়ে এসেছিস, রাক্ষসী, এবার এসেছিস আমারটাও খেতে ?

কারণে অকারণে ঐ কথাটা মাকে শুনতেই হ'তো। কি করবে মা। তারা তখন একেবারে নিরাশ্রয়। সেই মুহূর্তে অন্য কোথাও চলে যাবার মত উপায় তাদের ছিল না।

একদিন শচীন্দ্রবাবু বাজারে যাবার সময় জ্যাঠাইমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি কি আনতে হবে বাজার থেকে ?

ঝাঁঝালো কণ্ঠে জ্যাঠাইমা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, আতপ চাল পাঁচ সের। এই চাল তো সুনন্দা পাঁচ দিনেই নাকের তলা দিয়ে গলিয়ে দেবে।

হায়রে ! মা এখন এক বেলা মাত্র নিরামিষ খান।

প্রথম প্রথম শচীন্দ্রবাবু জ্যাঠাইমার ঐসব কথায় আপত্তি জানাতেন। কিন্তু জ্যাঠাইমার মুখের সঙ্গে পেরে উঠতেন না বলে আর কথা বাড়াতেন না। তিনি শুধু তাঁর কর্তব্যটুকু করে যেতেন।

জ্যাঠাইমার মুখের ঐ উক্তিগুলি যতই কষ্টের হোক না কেন মার কিন্তু কিছুই বলার উপায় ছিল না, তবু একবার বলেছিলেন মা : এ কি বলছেন দিদি, উনি আমার গুরুজন, ওনার অমঙ্গল আমি চাইব কেমন করে ?

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠাইমা বলেছিলেন : ঢং করিস্ নে সুনন্দা। মতলবটা আমার সব জানা আছে। আর ভালমানুষীপনা করতে হবে না। এসেছিস্ ধ্বংস করতে, ধ্বংস করে যা।

আশ্রিত হ'য়ে থাকার দুর্ভাগ্যজনক জবালা এমনিভাবে সহ্য করতে হচ্ছিল মাকে।

একদিন ঘুম থেকে উঠেই জ্যাঠাইমা তম্বি করে বলতে লাগলেন : কাল রাতে তেলের টিন থেকে তেল ঢালার শব্দ পেয়েছি। নিশ্চয়ই সুনন্দা চুরি করে তেল ঢেলে নিয়েছে, বিক্রি করেছে হাত-খরচা চালাবার জন্যে।

শব্দটা কিন্তু তেল ঢালার নয়, ডাবরের ওপর একটানা জল পড়ার। রাতে বাইরে না বেরিয়ে জলের বা বাথরুমের কাজ সুমিতরা ডাবরেই

সারতো। রাতে ডাবর ব্যবহারের অভ্যাস তাদের বহুদিনের। শুধু মা কেন, ওর বাবারও এই অভ্যাসটা ছিল। বিশেষত এই অভ্যাসের পিছনে ছিল একটা মজার ব্যাপার।

বাপ-ঠাকুর্দার আমলে তাদের দেশের বাড়িতে মাঝে মাঝে ভীষণ ডাকাতি হ'তো। বাড়ির দেয়ালে সিঁধ কেটে ঘরে ডাকাত আসত। গয়নাগাটি, টাকা-পয়সা, এমন কি থালা-ঘটি-বাটি যা পেত সব নিয়ে সরে পড়তো। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে রাতে যদি মেয়েরা ঘুমের চোখে বাইরে গেছে, অমনি ওৎ পেতে পাশেই লুকিয়ে থাকা ডাকাত বৌ সেজে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এমন চোর-ডাকাত ঘেরা ভয়ের দেশে একা চৌকিদারের পক্ষে ঠেকাবার আর কতটা সাধ্য? ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে থাকা ছাড়া গ্রামবাসীদের আর কোনো উপায় ছিল না। তাই, অনেক ভেবেচিন্তে ওরই মধ্যে তাদের ঠাকুমা একটা ফন্দী বার ক'রেছিলেন। যে রাতে বড় বয়সী ছেলেরা বাড়িতে থাকত না সেই রাতে ঠাকুমা ঠাকুর্দার গড়গড়াটা বিছানার কাছে নিয়ে তাতে নল লাগিয়ে মাঝে মাঝে শুধু টানতেন যাতে গুড়ুক গুড়ুক করে শব্দ হয়, চোর বা ডাকাত এলে সেই শব্দ শুনে যেন ভাবে যে বাড়ির পুরুষরা এখনো জেগে আছে। আর, বাড়ির মেয়েরা রাতে কখনই ঘরের বাইরে যেতো না। ছেলেরাও তাই। বাথরুম-পায়খানার প্রয়োজন হ'লে ঘরের মধ্যেই ডাবরে সারা হ'তো। সেই থেকে রাতে ডাবরের ব্যবহারে ওর মা ও বাবা দুজনেই বরাবর অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। কালক্রমে কলকাতার বাসিন্দা হলেও ঐ পুরাতন অভ্যাসটা কেউ ছাড়তে পারেন নি, ছোট বলে সুমিতরা তো নয়-ই। হায়রে ভাগ্য! চোরদের ফাঁকি দেবার জন্য রাতে বাথরুমের প্রয়োজন ডাবরে সারার সেই অভ্যাসটা এতদিনের পর আজ জ্যাঠাইমার বর্ণনায় অবশেষে মাকেই চোর বানিয়ে দিল!

এতেও রেহাই নেই। ইতিমধ্যে সুমিতের স্কুলের রেজাল্ট বেরোল। রেজাল্টে দেখা গেল সুমিত ভালভাবে পাশ করে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠেছে। এবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছোট ঘর পেরিয়ে হাইস্কুলের বড় ঘরে যাবার পালা। কিন্ত সুমিতের ভর্তির জন্য টাকার দরকার। কে দেবে এই টাকা? ভাসুর বলে জ্যাঠামশাইএর সঙ্গে মা সামনাসামনি কথা বলতে পারেন না! অবশেষে ভয়সঙ্কোচ ত্যাগ করে একদিন জ্যাঠাইমার কাছেই কথাটা পাড়লেন মা: সুমিতাকে তো বড় স্কুলে ভর্তি করা দরকার, কি করবো

দিদি ?

পাশেই নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে সুমিত শুনছিল তার মা ও জ্যাঠাইমার কথোপকথন।

হাত ঘুরিয়ে শরীর দুলিয়ে জ্যাঠাইমা উত্তর দিলেন : খাওয়া দিচ্ছি, পরা দিচ্ছি, এরপর আবার স্কুল ! এ বাবা আমরা চালাতে পারবো না। কত ছেলে তো চা-এর দোকানে কাপ-ডিস ধুয়ে পেট চালাচ্ছে। ওকে কোনো চা-এর দোকানে দিয়ে দে, আর পড়াতে হবে না। ও কি পণ্ডিত হবে নাকি ?

একথা শোনার পর মায়ের মুখে আর কোন বাক্য সরল না, কিন্তু তার চোখের জল বাঁধা না মেনে প্রকাশ্যেই ঝরে পড়ল।

মায়ের চোখে জল দেখে জ্যাঠাইমা ক্ষিপ্ত হ'য়ে বললেন : নেকি কান্না কাঁদিব না সুনন্দা, এই সংসারে বিধবার চোখের জল পড়লে আমার স্বামীর অকল্যাণ হবে, বুঝলি ?

মা ছুটে চলে গেলেন তার ঘরে। সুমিতও তার মাকে অনুসরণ করলো।

দুঃখের দিন যখন আসে তখন হয়তো এমনি করেই আসে, আর সহজে যেতেও চায় না। বুকচাপা দুঃখ নিয়ে মুখ বুজে সবই সইতে হচ্ছিল অসহায়া মাকে। মনে মনে এক ঈশ্বরকে ছাড়া কাকে আর মা এইসব দারুণ দুঃখের কথা জানাবেন, জানিয়ে একটু হাল্কা হবেন !

সুমিতরা যখন বড় হ'য়েছে, ভালমন্দের কিছু ধারণা করতে শিখেছে, তখন ঐসব বেদনাময় অতীতের দিনগুলোর কথা স্মরণ করে কতনা চোখের জল ফেলেছে।

এমন অবস্থা যখন চলছে তখন হঠাৎ একদিন শোভনদা এলেন সুমিতদের দেখতে। সেই যে শোভনদা, যিনি শ্মশানে সুমিতকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সর্বদা তাকে আগলে রেখেছিলেন। শোভনদাকে দেখে মা তো হাতে স্বর্গ পেলেন। বুকভরা দুঃখের ভার একটু লাঘব করতে মা সব কথাই বললেন শোভনদাকে। শোভনদা আন্তরিকতার সঙ্গে মায়ের সব কথা শুনলেন। হয়তো ওর মনে হয়েছিল যে উনিও একদিন সুমিতের বাবার কাছে থাকতে পেরে আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'য়ে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন, তাই সুমিতের লেখাপড়ার ভার নিতে মায়ের আবেদনটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। অনেক

ভেবে অবশেষে সুমিতকে তার কাছে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিলেন জ্যাঠামশাই শচীন্দ্রলালবাবুকে। মত দিলেন জ্যাঠামশাই। সুমিত চলে গেল শোভদার সংগে।

শোভনদারা তখন থাকতেন ভূকৈলাশে। ভূকৈলাশ অঞ্চল শচীন্দ্র জ্যাঠামশায়ের বাড়ি থেকে অনেকটা দূর। তখন থেকে সুমিতের নতুন নিবাস হ'ল ভূকৈলাশ। মা সুমিতের পরের ছোট দুই ভাইকে নিয়ে রয়ে গেলেন বিশুবাবুর লেনে শচীন্দ্রলালবাবুর বাড়ি।

তাদের এই জ্যাঠতুতো ভাই শোভনদা নিজের বিধবা মা আর দুইটি ভাই নিয়ে থাকতেন ভূকৈলাশের এক বাড়িতে। ওদের পরিবারের চেহারাটা সুমিতদের পরিবারের মতই, তবে তফাৎ এই যে, ওরা কারো আশ্রিত নন। ওর বাবা সুমিতের বাবার বড় ভাই। সুতরাং ওর মা তাদের আর এক জ্যাঠাইমা। উনি সুমিতদের বিস্তৃত যৌথ পরিবারে 'বড় বৌ' বলেই পরিচিত। এই জ্যাঠাইমার অবশ্য সুমিতের প্রতি মমতার অন্ত ছিল না এবং অন্য সব দাদারাও তার ওপর যথাযোগ্য নজর রাখতেন। শোভনদা সুমিতকে ভর্তি করে দিলেন খিদিরপুর একাডেমি স্কুলে।

সুমিত এখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। রোজকার রুটিনমাফিক পড়াশুনা এবং যথারীতি স্কুলে যাতায়াত শুরু করল সুমিত। বই থেকে শুরু করে জামাকাপড়, এমন কি তার স্কুলের মাইনে পর্য্যন্ত শোভনদা একাই চালাতে লাগলেন।

সে সময়ে তাদের যৌথপরিবারভুক্ত লোকের কোনো ব্যক্তিগত দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য মত নিতে হত পরিবারস্থ সকলের। একা সুমিতের এই ভার নেওয়ার ব্যাপারে শোভনদাকেও সকলের মত নিতে হ'য়েছিল।

সেই থেকে সুমিতের থাকা এবং পড়ার সমস্যাটা চুকে গেল। স্কুল থেকেই তখন সকল ছাত্রদের টিফিন দেওয়া হ'ত। বরাদ্দমত সেও টিফিন পেতো, আর টিফিনের সময় মাঝে মাঝেই তার মা ও ভাইদের দেখতে যেতো।

প্রথম দিকে সরাসরি সে জ্যাঠামশাইর বাড়ির ভিতর ঢুকে যেতো। কিন্তু তার এই আসাটা এবং মায়ের সংগে দেখাসাক্ষাৎ হওয়াটা ঐ বাড়ির জ্যাঠাইমা আদৌ সহ্য করতে পারলেন না। দু'চার দিন পরেই শোনা গেল জ্যাঠাইমার নাকি ধারণা যে দুপুরে মা নিশ্চয়ই তার কাছে ঐ-বাড়ির সব জিনিষপত্র গোপনে পাচার করছেন।

মায়ের মুখে জ্যাঠাইমার ঐ ধারণার কথা শুনে মায়ের ওপরেই অভিমান হল সুমিতের। রাগ করে কয়েকটা দিন সে দেখাই করল না মায়ের সঙ্গে; তার মনে হয়েছিল মা-ই বুঝি ইচ্ছে করে ঐসব অজুহাত দেখিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছেন।

দু'একটা দিন যেতে না যেতেই সে আর থাকতে পারলো না। ছোট দুই ভাইএর জন্য এবং মাকে শুধু একবার চোখের দেখার জন্য মনের মধ্যে আনচান করতে লাগল। নিজেকে আর আড়াল করে রাখতে পারলো না। আবার একদিন টিফিনের সময় ছুটে গেল সে বিশুবাবুর লেনে। এবার সে আর বাড়ির মধ্যে গেল না। রাস্তার ধারেই জানালা। জানালায় গিয়ে ইশারায় মাকে ডাকল। পর্দাটাকে একটু সরিয়ে পর্দার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে জলভরা চোখে চেয়ে রইল মায়ের দিকে। দেখল মাও অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন তার দিকে। মায়ের দু'চোখ বেয়ে ঝরে পড়ছে নীরব অশ্রু। উভয়েরই মুখে কোনো কথা নেই। শুধু চেয়ে থাকা, শুধু প্রতীক্ষা। ভাইদের দিকে একবার তাকালো সুমিত। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ নেই। জোরে কথা বললে যদি পাশের ঘর থেকে জ্যাঠাইমা টের পেয়ে যান তো এই মুহূর্তেই কুরুক্ষেত্র বেঁধে যাবে। অতি অল্প ক্ষণই ছিল এই নীরব দেখাসাক্ষাতের সময়টা। সুমিতের মনে ভয়, ওদিকে হয়তো তার ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। তাই, হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে মায়ের দিকে বারকয়েক চেয়ে ছুটে পালিয়ে যেত সে। গভীর দুঃখে তার বুক ফেটে যেতে লাগল।

এমন করে আর ক'দিন থাকা যায়? তার তখনো দায়ীত্ববোধ হয়নি, লাঞ্ছনা বা গঞ্জনার জ্বালা কি তা সে বোঝে না। তবু মাকে কাঁদতে দেখলে সে স্থির থাকতে পারে না। এমন করে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখা করতে হয় বলে একদিন সুযোগ বুঝে ফিস্‌ফিস্ করে মাকে বলল সে: না মা, আর পারছি না, দরকার হয় সত্যি সত্যি কোনো চা-এর দোকানে কাজ জুটিয়ে নিয়ে সংসার চালাবার ব্যবস্থা করি। তাহ'লে তো আবার আমরা একসঙ্গে থাকতে পারবো।

মা কিন্তু সুমিতের ঐ কথায় কান দিলেন না, বরং উদাসীনভাবে বললেন,—নারে, আমরা এখানে বেশ আছি, তুই ওখানে থেকে লেখাপড়াটা কর বাবা।

পরের দিন সুমিত ভাবল এবার কয়েকটা দিন দেখতে না গিয়ে মাকে বেশ জব্দ করবো। কিন্তু টিফিনের সময় টিফিন খেতে গিয়ে ভাইদের কথা মনে পড়ল। ভাবতে লাগলো, ওদের তো ওখানে চেয়েচিন্তে খেতে হয়, ফলে ভালর কিছুই ওরা খেতে পায় না। মনের পর্দায় ভাইদের হতাশাভরা মুখগুলো ভেসে ওঠায় সেদিন আর তার টিফিন খাওয়া হ'লো না। টিফিনের খাবার হাতে করে গুটি গুটি পায়ে গিয়ে উপস্থিত হ'ল পুরোনো সেই জানালার ধারে।

মা জানালার শিকগুলোর মাঝ দিয়ে হাত বাড়িয়ে আগ্রহভরে সুমিতের বয়ে আনা খাবারটা নিয়ে ভাইদের দিলেন। ছোট ভাইটা তখনো ওসব কিছু খেতে শেখেনি। খাবার পেয়ে মেজো ভাইএর কি আনন্দ। পাছে আনন্দটা ও শব্দ করে প্রকাশ করে ফেলে, তাই ভয়ে সুমিত কাঁপছিলো।

এরপর থেকে টিফিনের এই খাবার লেনদেনএর ছুতো করে সুমিত রোজই ও-বাড়ি যেতো, আর প্রায়ই দেখতো যে, দুপুর হলেই জানালার পর্দা সরিয়ে ওরা শিকগুলো ধরে বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুমিতের আসার অপেক্ষায়। কোনোদিন কোনো কারণে সুমিত যদি না যেতে পেরেছে তো পরদিন গিয়ে শুনেছে যে ভাই নাকি সারাদিন তার জন্য কেঁদেছে।

বাবা মারা যাবার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেল এইভাবে। সুমিত তার মা ও ভাইদের ছেড়ে অন্য জায়গায় থেকে মানুষ হতে লাগল। মা মাঝে মাঝে গিয়ে তাকে দেখে আসতে থাকলেন।

বাইরে কিছু বুঝতে না দিলেও মা কিন্তু মনে মনে তার এই অবস্থাটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। একদিন যিনি ছিলেন একটি স্বচ্ছল সংসারের বৌ, আজ তার একি দুর্দশা! কতদিন আর তাদের এমনি পরের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকতে হবে? অথচ উপায় তো কিছু নেই। তবু—তবু কিছু কি করা যায় না? তার ভাবনার মূল কথা হ'য়ে দাঁড়াল যে গড্ডালিকা প্রবাহের মতো ভবিষ্যতের জীবনটাকে এভাবে চালিয়ে নিতে পারবেন না কিছুতেই।

শোভনদাদের বাড়ি গিয়ে প্রায়ই অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে নানান্ ভাবে পরামর্শ করতে শুরু করে দিলেন মা। ক্রমেই বাবার যাঁরা নিকট বন্ধু-স্থানীয় এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাঁরাও বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে তাদের সমস্যার কথা জানতে পারলেন এবং তাদের ব্যাপারে কিছু একটা

করা যায় কিনা, সে সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন।

সেই সময়ে তখনকার সরকার পূর্ববঙ্গ থেকে আসতে থাকা সকল উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। কয়েকজনের পরামর্শমত মা সরকারী কোনো ক্যাম্পে যাবার সুযোগটা পাবার জন্য ছোটাছুটি শুরু করে দিলেন। পূর্ববঙ্গ থেকে যেন সদ্য এসেছেন, তেমন কাগজপত্রগুলি তৈরী করে মা সুমিতকে সংগে নিয়ে চলে গেলেন সরকারের দ্বারে।

কে কিভাবে তখন সাহায্য করেছিলেন তা ঠিক মনে নেই, তবে ও'দের একজনের সহায়তার কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে সুমিতের। উনি হলেন ডাঃ অজিত মুখার্জী। এখনও উনি খিদিরপুরেই প্র্যাক্টিস করেন এবং বেহালার বাসিন্দা হ'লেও ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে আসা-যাওয়ার পথে যখন ঐ ডাক্তারের চেম্বারটি চোখে পড়ে তখন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আজও সুমিতের মাথা নত হয়ে পড়ে।

সেই শ্রদ্ধেয় ডাঃ অজিত মুখার্জীর আন্তরিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় মা তারপরে যাতায়াত শুরু করেছিলেন অকল্যাণ্ড রোডের উদ্বাস্তু অফিসে। মায়ের সংগে একমাত্র সংগী হ'তো সুমিত।

তারা যে উদ্বাস্তু শিবিরে চলে যাবার চেষ্টা করছেন মা সেকথা শচীন্দ্রলাল বাবুর বাড়িতে প্রকাশ করেন নি। সম্পর্কটা যা দাঁড়িয়েছিল তাতে প্রকাশ করার উপায়ও ছিল না। অথচ, উদ্বাস্তু অফিসে তদ্বিরের জন্য বেশ কিছুদিন হাঁটাহাঁটি করা দরকার। গোপনেই তা করতে হবে। অকল্যাণ্ড রোডের অফিসে যাবার দিন মাকে তাই মিথ্যে করে বলতে হত: আজকে একবার বড়দির বাড়ি যাবো, ওদের ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলে ফিরব দিদি!

বড়দির বাড়ি মানে শোভনদা-দের বাড়ি। শোভনদার মাকে সুমিতের মা 'বড়দি'ই বলতেন।

কোন কোন দিন এইরকম যাওয়ার ব্যাপারেও জ্যাঠাইমা বলতেন, একেবারেই যা না, ওরাই তো তোদের সবাইকে রেখে দিলে পারে, আবার ফেরার কথা হচ্ছে কেন?

তেমন সুযোগ থাকলে মা হয়তো তাই-ই করতেন। শোভনদা-দের বাড়িতে সকলের একসঙ্গে থাকার সত্যিই উপায় ছিল না। ওদের অবস্থা এত স্বচ্ছল ছিল না যে সকলের পক্ষে একসংগে ওখানে থাকা সম্ভব।

অগত্যা জ্যাঠাইমার ঐ টিপ্পনীটা হজম করেই মা গোপনে নিজের কাজ করে যাচ্ছিলেন। যেদিন যাবার প্রয়োজন হত সেদিন মা 'বড়দি'র বাড়ি যাবার ছুঁতো করে ছোট দুই ছেলেকে বড় জ্যাঠাইমার কাছে রেখে সুমিতের সঙ্গে বেরিয়ে পড়তেন অকল্যাণ্ড রোডের দিকে। মায়ের মনে তখন একান্ত ইচ্ছাটা জেগে উঠেছে যে, যেমন করেই হোক্ একবার উদ্বাস্তু শিবিরে ঢুকে নিজেদের আত্মরক্ষা করতেই হবে।

৬, কৈলাশের শোভনদাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে সোজা চলে যেতেন খিদিরপুরের ছোট বাজার পর্য্যন্ত, সেখান থেকে ট্রাম ধরে ধর্মতলা। মাকে খুব অন্যমনস্ক দেখাতো। সুমিত কিন্তু ট্রামের জানালার কাছে বসে বাইরের দৃশ্য দেখত, আর মনে মনে কত আনন্দই না পেতো। স্মৃতিচারণের গল্পে মায়ের কাছে শুনেছে, উদ্বাস্তু অফিসের লোকেরা প্রথমে মাকে তো উদবাস্তু বলে স্বীকৃতি দিতে চায়নি। মা কিন্তু নাছোড়বান্দা হয়ে লেগেই রইলেন। চারিদিকের নিষ্ঠুর আঘাত মাকে এমনিই মরিয়া করে তুলেছিল যে মার পক্ষে লেগে না থেকে উপায়ও ছিল না।

সব বাধা—সব হতাশা তুচ্ছ করে মা অনবরত হাঁটাহাঁটি করতেই লাগলেন। এমন দিনও তাদের গেছে—সারাদিনে মায়ের খাওয়া নেই, সুমিতের পেটেও দানা নেই। দু'জন শুধু লোহার জাল দিয়ে ঘেরা সরকারী অফিসের দরজায় ধর্ণা দিয়ে বসে আছেন কর্তাব্যাক্তি কেউ এলে সাক্ষাতে তার কাছে দয়াভিক্ষা চাইবার ভরসায়। কতোবার সারাদিনের অপেক্ষার পর ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। কতদিন এমনও হয়েছে যে বাড়ি ফেরার মত ট্রাম-ভাড়ার সামান্যতম পয়সাও মার কাছে নেই।

এই সময়ে অনুদান অথবা কিছু হাত-খরচা পাবার সুযোগ থাকলে বোধহয় ভাল হ'ত। কিন্তু কে বা কারা তা দেবে? হাত-খরচা চাওয়া তো দূরের কথা, শচীন্দ্রলালবাবুর বাড়িতে তখন তাদের সামান্য প্রাণটুকু নিয়ে বেঁচে থাকতেই প্রাণান্তকর অবস্থা। সুমিতও উদবাস্তু অফিসের খোঁজপাতি করার কাজটুকু সেরে বড়গঙ্গার পাশের পথ ধরে প্রায়ই মায়ের সঙ্গে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরত। এখনো তার মনে আছে, চলতে চলতে পথের পাশ থেকে গুণ্ডি ফল কুড়িয়ে পকেটে ভরে নিয়ে আসতো। বাড়িতে এনে ঐ ফলগুলি লাল, নীল, হলুদ ইত্যাদি বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে

নিত। ঐ কুড়িয়ে আনা ফলগুলি ছিল তার কৈশোরের প্রতিদিনকার খেলার উপকরণ।

কতবার যে তাদের অকল্যাণ্ড রোডের অফিসে যেতে হয়েছিল তা স্মরণ করলে সুমিত আজও আশ্চর্য্য হয়, চমকিত হয়। দিনের পর দিন তারা আশায় বুক বেঁধে অফিসের বারান্দায় বসে থাকতো। এক কথায় ধর্ণা দেওয়া আর কি। কখন কর্তাব্যাক্তি আসবেন, সাক্ষাৎ হওয়ামাত্র তাকে নিজেদের দুঃখদুর্দশার কথা সবিনয়ে বলতে পারবে। অথচ কর্তাব্যাক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ কখন যে হবে কেউই তার হদিস দিতে পারত না। হা-পিত্যেশ করে তবু তারা বসেই থাকতো।

বিহ্বল হয়ে তারা দেখতো, এদিকে এ অফিসের ব্যস্ত কর্মচারীদের কত ছোটাছুটি, আর ওদিকে কলকাতার সর্বোচ্চ বিচারালয়—অর্থাৎ হাইকোর্টে কত লোকের আনাগোনা। পাশের ব্যস্ত থাকা জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নের সরকারী দপ্তর বিধানসভার দিকেও চেয়ে চেয়ে থাকতো অবাক হয়ে। কাছাকাছি আকাশবাণী ভবনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভাবত ঐসব জায়গার সকলেই দেশের ও দশের জন্য কতই না ব্যস্ত, অথচ তাদের মত কত অনাথ তখনও দেশের কত জায়গায় নিরাশ্রয় হয়ে পথে পথে ঘুরছে, কেউ তার হিসাব পর্যন্ত রাখে না।

উদ্বেগভরা এমনি অনেকগুলো দিন ইতিমধ্যে গড়িয়ে গেল। একদিন হঠাৎ একজন ভদ্রলোক ভুকৈলাশে দাদার বাড়িতে এসে সুমিতের মায়ের নাম করে খোঁজ করলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে দাদা নিজের পরিচয় দিয়ে ভদ্রলোক কোত্থেকে এসেছেন তা জানতে চাইলেন। জানা গেল, ভদ্রলোক অকল্যাণ্ড রোডের উদ্বাস্তু অফিস থেকে এসেছেন সুমিতদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে। অর্থাৎ উনি জানতে চান সুমিতরা সত্যই অনাথ বা নিরাশ্রয় কিনা।

সুমিতদের পক্ষে যতটা সম্ভব সুবিধা করে দেবার জন্য ভদ্রলোককে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন শোভনদা। ভদ্রলোক শোভনদার অনুরোধ মত রিপোর্ট লিখলেন। রিপোর্টের মর্মকথা এই দাঁড়াল; সুমিতরা সপরিবারে পূর্বপাকিস্তান থেকে এসে শোভনবাবুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। যেহেতু সুমিতদের এক গ্রামেরই লোক, তাই খবর পেয়ে শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে সুমিতদের নিয়ে এসেছেন শোভনবাবু।

ভদ্রলোকটি যদিও পরিচিত নন বা ওর নাম সুমিতের মনেও নেই, তবু

সুবিধা পাবার মত ওর রিপোর্ট দেওয়ার ফলে সুমিতদের জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছিল বলে ভদ্রলোকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আজও সুমিতের মন ভরে আছে।

এরপর আর মাত্র কয়েকটা দিন আশ্রিত থাকার নির্মম অভিশাপ সহ্য করতে হয়েছিল তাদের। রিপোর্ট নিয়ে ভদ্রলোকটি ফিরে যাবার পর তাদের শুভার্থীরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা শুরু করলেন যাতে তারা নির্বিঘ্নে কলকাতার অবহেলিত পরিবেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু শিবিরে গিয়ে পেঁছুতে পারে।

এত কষ্ট আর চেষ্টাচরিত্র করে এখান থেকে চলে যাবার ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি করে ফেলার খবরটা শোনার পরও জ্যাঠাইমা মাকে যখন-তখন বলতে লাগলেন : যা না, কোথায় এমন সোনার থালায় তোদের ভাত পড়ে আছে দেখব। অত সহজ নয়রে, তাহলে আর পথে পথে এত ভিখিরী থাকত না।

কিছুদিন যেতে না যেতেই একদিন একটা চিঠি এসে হাজির হলো। এই চিঠিটাই তাদের উদ্বাস্তু শিবিরে যাবার ছাড়পত্র। স্থান ঠিক হলো—ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু শিবির।

ইতিপূর্বে কোনদিন ঐ শিবিরের নাম কেউ শোনেনি, কারণ শোনার প্রয়োজনও হয়নি। ওখানে যাবার পথও তাদের চেনা নয়। তারও চেয়ে বড় সমস্যা হল, এই অচেনা অজানা পথে একলা মা কয়েকটি অপগণ্ড শিশুদের নিয়ে কি করে যাবেন ? অথচ সরকারী চিঠিতে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছিল যে, নির্ধারিত উদ্বাস্তুকে নিজের দায়িত্বেই নির্দিষ্ট উদ্বাস্তু শিবিরে পেঁছুতে হবে।

২৪

মা চিঠির ঐ নির্দেশ দেখে দিশাহারা হয়ে সকল জ্যাঠামশাইদের হাতে পায়ে ধরলেন, ভাইদের কাছেও গেলেন। হায়রে ভাগ্য! কেউই কিন্তু সাহায্য করার এই শেষ কাজটা করতে চাইলেন না। কেউ অজুহাত দেখালেন ; নিজের আপন ভাইএর বৌকে এভাবে নির্বাসন দিতে তারা নাকি পারবেন না। কেউ বললেন, নানা কাজে এতই ব্যস্ত যে সময় করতে পারছেন না। কেউবা আবার বললেন : সঙ্গে বেশী লোকজন থাকলে এবং সরকারের লোকদের তা নজরে পড়লে হয়তো হিতে বিপরীত হতে পারে।

অগত্যা মা স্মরণাপন্ন হলেন সুমিতদের এক জামাইবাবু শ্রীচিন্তাহরণ

ভট্টাচার্য্যের। উনি সুমিতদের এক মাসতুতো দিদি—অনীতার স্বামী। খিদিরপুরেই দুর্গাদাস লেনে ওরা থাকতেন। একমাত্র চিন্তাহরণবাবু সেই মহা সমস্যার দিনে সুমিতদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। মন স্থির করে উনিই একদিন হঠাৎ উপস্থিত হ'লেন তাদের জ্যাঠামশাই শ্রীশচীন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। সুমিতদের যাত্রার ব্যবস্থায় নিখুঁত সহযোগিতা করতে ক'দিন আগেই এলেন উনি। স্বহস্তে গুছিয়ে দিলেন তাদের মালপত্র। সমস্যা দাঁড়াল একটা অসমাপ্ত কাঠের আলমারি নিয়ে। এটি ছিল সুমিতদের বাবার বিশেষ সখের জিনিষ। কাঁচের পাল্লা দেয়া একটি সুদৃশ্য দরজা আলমারিটার সামনে লাগাবার ইচ্ছে ছিল ওর বাবার। কিন্তু বাবার সেই আশাটুকু আর পূর্ণ হয়নি। সবে কাঠের ফ্রেমটা তৈরী করানো হয়েছিল এমন সময়েই বাবা মারা গেলেন। সেই স্মৃতি মনে পড়ায় কলকাতা থেকে বিদায় নেবার আগে অগত্যা মা কাঁচের বদলে সস্তার টিন লাগিয়ে আলমারিটা ঠিক করে নিলেন। এই আলমারিটা ছাড়া তাদের মালপত্রও তেমন কিছু বেশী হ'ল না। সামান্য একটা বিছানা, খানকয়েক থালাবাসন এবং কিছু টুকিটাকি আসবাব পত্র। তাদের ব্যবহৃত চৌকিটা মায়ের ইচ্ছেমত নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন শোভনদা। ঐ চৌকিটা বাবার স্মৃতি হিসেবে নিজের কাছে রাখার বাসনাই অবশ্য ছিল তাঁরও।

এই ব্যবস্থায় ভালই হ'ল সুমিতদের। ওটা নিয়ে তো উদ্বাস্তু শিবিরে যাওয়া সম্ভব।

রাত ন'টা পঞ্চান্ন মিনিটের লালগোলাগামী ট্রেনে করে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যাবার কথা বললেন সুমিতদের জামাইবাবু শ্রীচিন্তাহরণ ভট্টাচার্য্য। তাঁর ঐ প্রস্তাবমত যাত্রার দিনও স্থির হয়ে গেল। নির্দিষ্ট দিনে একটা ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে উনি এলেন বিশুবাবুর লেনে শচীন্দ্রলালবাবুর বাড়ি।

পরিষ্কার মনে আছে সুমিতের, ইংরাজী ১৯৫৪ সালে তারা কলকাতা থেকে বিদায় নিয়েছিল। সময়টা ছিল ভাদ্র মাস। ভাদ্র মাসে বাঙ্গালীরা নিজেদের বাড়ি থেকে কখনো বেড়াল কুকুর পর্য্যন্ত তাড়ায় না। অথচ তাদের জন্য সেদিন এক ফোঁটা চোখের জল ফেলা তো দূরের কথা বরং বাড়ির সকলেই যেন খুশী হয়ে উঠেছিল। ওদের চোখেমুখে দেখা যাচ্ছিল এতদিনে আপদ দূর করতে পেরে ওরা যেন বেঁচে গেল।

ঐদিন সকালেই ভূকৈলাশের শোভনদার বাড়ির সকলকে বিদায়

জানিয়ে সুমিত তার পড়ার বইখাতা এবং জামা-প্যাণ্ট ইত্যাদি নিয়ে চলে এসেছিল এ বাড়িতে।

মালপত্রগুলি হাতে হাতে ঘোড়ার গাড়ীতে ওঠানো হতে লাগল। এ বাড়ির সকলেই হাত লাগালেন মাল ওঠানোয়। এই কাজে সকলের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং আগ্রহ যে কত তা ওদের হাঁকডাক শুনেই বোঝা যাচ্ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের মালপত্রে গাড়ীটা বোঝাই হয়ে গেল।

একটা সদ্য ধোপ ভাঙ্গা শাদা কাপড় পরে ঘরের এক পাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে মা তখন কাঁদছিলেন। ছোট ভাই দুটিকে সঙ্গে নিয়ে সুমিত তাদের মাকে ঘিরে বসেছিল।

জ্যাঠাইমা বললেন, সুনন্দা যেতে যখন হবেই তখন আর কাঁদিস নে। এখান থেকে ষ্টেশন বহু দূরের পথ, দেরী করাও ঠিক হবে না। ঘোড়ার গাড়ীতে যেতে অনেক সময় লাগবে।

জ্যাঠামশাইও জ্যাঠাইমার কথায় সায় দিয়ে বললেন. সুনন্দা আমার একদম ইচ্ছে নয় যে তোমরা এখান থেকে চলে যাও। আমার শাক-ভাত জুটলে তোমাদেরও জুটত। যাক, যা ভাল বুঝেছ তাই করেছো। এখন যেতে যখন হবেই তখন আর দেরী করো না।

এবার মা উঠে দাঁড়ালেন অকূল সমুদ্রে পাড়ি দেবার জন্য। প্রথমে শচীন্দ্রলালবাবুকে প্রণাম করলেন, পরে জ্যাঠাইমাকেও প্রণাম করলেন, তারপর মুখে কাপড় দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। মায়ের সঙ্গে সুমিতরাও তাদের গুরুজনদের একে একে প্রণাম করে ঘোড়ার গাড়ীতে গিয়ে বসল। সুমিতের পাশেই রাখা হয়েছিল একটা বড় হাঁড়ি। খিদিরপুরে থাকতে তাদের বাড়িতে এক সময় এই হাঁড়ির তিন হাঁড়ি করে ভাত নাকি প্রত্যেক বেলায় লাগত। এই হাঁড়িতে তখনকার দিনের ছয় সের চাল ধরত। হায়রে অদৃষ্ট! আজ সেই মূল্যবান হাঁড়িটা সঙ্গে নিয়ে দু'মুঠো অন্নের জন্য তাদের কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে।

তখন সবে সন্ধ্যা। রাস্তায় বিজলীবাতির রোশনাই জ্বলে উঠছে। কেউ কেউ ব্যাগভর্তি করে বাজার নিয়ে নিজেদের বাড়ি ফিরছেন। সুমিতরা গাড়ীর মধ্যে থেকে বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে ঐসব দেখছিলো।

সব শেষে তাদের মা কাঁদতে কাঁদতে এসে গাড়ীর একপাশে বসলেন। জামাইবাবুর নির্দেশে গাড়োয়ান গাড়ী ছেড়ে দিল। সকলেই রাস্তায়

গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বিদায় জানাল। মুহূর্তের মধ্যেই তাদের গাড়ীটা রাস্তার বাঁক ঘুরে সকলের দৃষ্টির সীমানা পেরিয়ে চলে গেল।

যেতে যেতে কিছুক্ষণ নীরবে চোখ মোছার পর একবার মা ভগ্নস্বরে বললেন, চিন্তাহরণ এতও আমার ভাগ্যে ছিল! এমনটা যে হবে তা কখনো বুঝতে পারিনি। আজ আমি রিক্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছি জানি না। কে আমাকে দেখবে, কে ওদের মানুষ করবে—ওদের দুমুঠো খেতে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো কিনা তাও জানি না। আমি জীবনে এত কি পাপ করেছিলাম যে আমার এই শাস্তি!

মাকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন জামাইবাবু।

কিন্তু যার সিঁথির সিদুঁর একবার মুছে যায় তাকে এমনি নিঃসম্বল পরাশ্রয়ী হয়েই এ-দুয়ার ও-দুয়ার ঘুরতে হয়। এই বেদনাই তখন বোধ হয় মায়ের বুকে তীরের মতো বিঁধেছিলো।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মা আবার বললেন, বুঝলে চিন্তাহরণ আমার বাবা বলতেন—'স্বামীরা সাতভাই, স্বামী মরলে কেউ নাই' এ কথার আসল অর্থ আজ আমি কাঁটায় কাঁটায় বুঝতে পারছি। যাক—তোমরা আছ, মাঝে মাঝে আমাদের খোঁজখবর নিও, তোমরাই আমার একান্ত আপনার। বাবা-মা-ভাই বলতে যারা আমার আপনজন আছেন তারা সবাই আজও পূর্বপাকিস্থানে।

চলন্ত ঘোড়ার গাড়ীটা ওয়াটগঞ্জের মোড় ঘুরে গিয়ে খিদিরপুর ট্রাম লাইনের রাস্তায় পড়ল। বাঁদিক ঘুরে গাড়ী আদিগংগার ছোট ব্রিজের ওপর উঠতেই মা দু'হাত জড়ো করে পূর্বদিকের কালীঘাটের মা কালীর উদ্দেশ্যে অস্ফুটে বললেন, মা তুমিই এখন একমাত্র ভরসা, তুমিই আমাদের রক্ষা ক'রো মা।

গাড়ী এগিয়ে চলল। একটু পরেই ওদের চোখে পড়ল কলকাতার রেসগ্রাউন্ড। সেই দিনটা ছিল ঘোড়াদৌড় খেলার দিন। তখনও রেসগ্রাউণ্ডের চারিদিক ফাঁকা হয়নি। নতুন-পুরাতন বহু প্রাইভেট মোটর গাড়ী সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলিকে পিছনে ফেলে তারা তাদের পথে এগিয়ে চলেছে। যেতে যেতে সামনেই দেখা গেল ফোর্ট উইলিয়াম গেট। অন্যদিকে রাণী ভিক্টোরিয়ার বিশাল স্মৃতিসৌধটা গড়ের মাঠের

ওপ্রান্তে দেখা যাচ্ছিল। এদিকে আলোর রশ্মিতে ঝলমল করছে নীচের চওড়া রাস্তাটা। অনেকক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই।

বাঁক ঘুরতেই উৎসাহভরে জামাইবাবু সুমিতকে লক্ষ্য করে বললেন, এতক্ষণ যে পথ ধরে আমরা এলাম তার নাম রেড রোড। এবার আমরা লাটসাহেবের বাড়ি পেরোচ্ছি, আর ঐ যে সামনে ধর্মতলা। আর ঐ যে দেখছো ডানদিকে ট্রামগুলো ঘুরছে—ওই জায়গাকে এসপ্লানেড বলে, ট্রাম ঘোরার পাশে যে পার্কটা দেখা যাচ্ছে, ওটার নাম কার্জন পার্ক।

সেদিনের কার্জন পার্কের এখন নতুন নামকরণ হয়েছে সুরেন্দ্রনাথ পার্ক।

সুমিত দেখল, কার্জন পার্কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রামের নিত্য-যাত্রীদের বাড়ি ফেরার জন্য কি ব্যাকুল আগ্রহ! আর, সেই দিনই তার জীবনে প্রথম দেখল রাতের ধর্মতলা।

ছেলেমেয়েদের হাত ধরে কত লোক কার্জন পার্কের ভিতরে ও পাশের রাস্তায় খুশীমনে সান্ধ্যভ্রমণ করছে। আলোয় আলোয় ঝলমল করছে দু'ধারের সকল দোকান, রেঁস্তোরা ইত্যাদি। বিশাল কলকাতা শহরের এদিকটায় কতনা সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি! অনবরত লোক সমাগমে সেই সৌন্দর্য্যকে আরও মধুর করে তুলেছে।

কার্জন পার্ক ছাড়িয়ে ঘোড়ার গাড়ীটা ধর্মতলা ষ্ট্রীট ধরে মৌলালীর দিকে এগিয়ে চলেছে। সুমিত অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছিল দু'দিকের প্রত্যেক দোকানের গায়ে অজস্র জামা, প্যাণ্ট, ব্যাগ, কাপড় ও খেলনা ইত্যাদি ঝুলছে।

একবার হাত দিয়ে তার মায়ের মুখটাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল মা, আমার এই প্যাণ্টটা বাবা বুঝি ঐ দোকান থেকে নিয়েছে?

মা শুধু 'হুঁ' ছাড়া কোন উত্তরই করলেন না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা মৌলালীর মোড়ে পেঁছে গেল। গাড়ীটা বাঁদিকে ঘুরে শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে চলল। খানিকটা এগোতেই ডানদিকে তাদের চোখে পড়ল নীলরতন সরকার হাসপাতাল, হাসপাতালের উল্টোদিকে কোলে মার্কেট। যেতে যেতে জামাইবাবু ঐসব তাদের চিনিয়ে দিচ্ছিলেন। ঝাঁকায় ঝাঁকায় তরিতরকারি মাথায় নিয়ে অগুনতি কুলিরা বাজারে ঢুকছে, আবার কেউ কেউ মাল নিয়ে বাজারের বাইরেও

বেরিয়ে আসছে। ওদের ঐ ছুটন্ত যাতায়াত দেখতে বেশ মজাই লাগছিল সুমিতদের।

হঠাৎ তাদের কানে এসে বাজতে লাগল : বল হরি হরিবোল।

সকলেই মুখ ঘুরিয়ে দেখতে পেল, কোন একজন তার জীবনের কাজ শেষ করে ইহলোকের মায়া কাটিয়ে নতুন সাজে ফুলের মালা পরে খাটিয়ায় শুয়ে লোকজনদের ঘাড়ে চেপে পরলোকের দিকে রওনা দিয়েছে। বাহকেরা হাসপাতালের দরজা পেরিয়ে বড় রাস্তায় এগোতেই ওদের পিছন পিছন জনৈকা মহিলাকে ধরাধরি করে কারা যেন নিয়ে আসছে দেখা গেল। মহিলাটির বয়স তেমন বেশী মনে হল না, বড় জোর পঁয়ত্রিশ হবে।

মা একবার সামনের মৃতদেহটির উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বললেন, বোধ হয় আমারই মতো ঐ বৌটিরও কপাল পুড়ল।

এবার ট্রাফিক পুলিশের হাতের গন্ডী ছাড়িয়ে শিয়ালদহ মেইন ষ্টেশনের সিঁড়ির ধারে তাদের গাড়ী দাঁড়াল। গাড়ী থামামাত্র গাড়োয়ান লাফিয়ে নেমেই তলাকার ঝোলানো ব্যাগ থেকে ঘাস বের করে ঘোড়া-দুটোকে খেতে দিল। ঘোড়া দুটো মাথা নীচু করে ঘাস খেতে শুরু করল।

জামাইবাবু সবার আগে গাড়ী থেকে নেমে বললেন, মাসী, ওদের নিয়ে নেমে এসে একপাশে দাঁড়ান।

মা সবাইকে নিয়ে মেইন প্লাটফর্মের নীচের রাস্তায় নেমে দাঁড়ালেন।

জামাইবাবু ছুটে গিয়ে একটা কুলিকে ডেকে নিয়ে এলেন এবং কুলির সাহায্যে মালগুলি নামিয়ে ষ্টেশনের ভেতরে বয়ে নিতে লাগলেন। সুমিতরা তাদের মায়ের সংগে তখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে। সুমিত তো নতুন পরিবেশের আনন্দে আত্মহারা হয়ে ষ্টেশনের বিরাট চাতাল, আলোর রশ্মি আর মানুষদের আসাযাওয়া দেখছিল।

মাঝে মাঝেই একটা দু'টো ট্যাক্সি এসে প্লাটফর্মের ধার ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছিল। ট্যাক্সির যাত্রীরা তাদের মালপত্রগুলি গাড়ী থেকে নামিয়ে নিয়েই ছুটছিল ষ্টেশনের ভেতর।

মালপত্র নামানো শেষ হতেই সুমিতদের জামাইবাবু মাকে ষ্টেশনের মধ্যে এগিয়ে যেতে বললেন। মা ছোটভাইকে কোলে নিয়ে মেজভাইএর হাত ধরে বাইরের সিঁড়ি বেয়ে ষ্টেশন-চত্বরের ওপরে উঠলেন। সুমিত মার পিছন পিছন এগোল।

ওপরে উঠতেই তারা দেখল টিকিট কাটার কি বিরাট লাইন! তাদের অবশ্য টিকিট কাটতে হ'ল না, ট্রেনে যাবার জন্য সরকার থেকে আগেই তাদের টিকিট দেওয়া হয়েছিল। সেই টিকিটগুলো দেখিয়ে তারা লোহার গ্রীল দেয়া গেটটা পেরিয়ে হাজির হ'ল পাঁচ নম্বর প্লাটফর্মে। তখনও লালগোলা প্যাসেঞ্জার স্টেশনে আসেনি, প্লাটফর্ম ফাঁকা।

ঐ ট্রেনটা এসে আবার নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে যাবে। তাদের যেতে হবে সেই ট্রেনে। দেখা গেল, আরো কিছু কিছু যাত্রীরা মালপত্রসহ ঐ ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে।

প্লাটফর্মের শেষ দিকে পেঁাছে এক জায়গায় মালপত্র জড়ো করে বসে রইল সুমিতরা। মা মাটিতেই বসে পড়লেন ছোটভাইটিকে কোলে নিয়ে। মেজভাইও একটু পরে মায়ের কোলের একপাশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। সুমিত একপাশে বসে নতুন করে অবাক চোখে সমস্ত লোকজনদের আসাযাওয়া দেখতে লাগল।

লালগোলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনটির ছাড়বার সময় ছিল রাত ৯টা ৫৫ মিনিট। ট্রেনটি আসতে তখনও অনেক দেরী। এই অবসরে বসে না থেকে সুমিত প্লাটফর্মের এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করছিল আর দেখছিল। কোথাও ছোটদের খেলনার দোকান, কোথাও আবার ছোট্ট ট্রলির ওপরে বসানো মিষ্টির আলমারি। দোকানদাররা এই দোকানগুলি কেমন সুন্দরভাবে প্লাটফর্মের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। বিস্ময়ভরা আনন্দে সুমিত ঐসব চলন্ত দোকানগুলি দেখছিল।

ইতিমধ্যে মুখ থেকে মুখে হঠাৎ খবরটা ছড়িয়ে পড়ল: লাল্ট লালগোলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি পাঁচ নম্বর প্লাটফর্মে আসছে।

খবর শোনামাত্র স্টেশনের বেঞ্চগুলিতে বসে থাকা যাত্রীরা নড়েচড়ে উঠল এবং সবাই নিজেদের মালপত্র হাতের কাছে জড়ো করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কেউবা তার ছেলেমেয়েদের হাতের কাছে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দূর থেকে তখন একটা তীব্র আলো সমস্ত প্লাটফর্মটিকে আলোয় আলোময় করে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

জামাইবাবুও উঠে দাঁড়ালেন। মা ঘুমন্ত মেজভাইকে ডাকতে শুরু করলেন। কয়েকটা ধাক্কা দেবার পর ভাইএর ঘুম ভাঙল। ঘুম ভাঙতেই ও কাঁদতে শুরু করে দিল। শিশু মন তো! গাড়ীতে ওঠার জন্যে ঐ অত্যাবশ্যক ব্যস্ততার গুরুত্ব ও বুঝবে কেমন করে?

বিরক্ত হয়ে মা ওকে একটা প্রচণ্ড ধমক দিলেন। সুমিতের ঐ মেজভাই অমিত তখন সদ্য ঘুমভাঙা চোখ রগড়াতে রগড়াতে বায়না ধরে বসল, সে তখনি মায়ের কোলে উঠবেই। মা কিন্তু ওকে কোলে নিতে পারছেন না। মায়ের কোলে তখন ঘুমিয়ে রয়েছে ছোটভাই অজিত।

জামাইবাবু মাকে একবার সতর্ক করে দিয়ে বললেন, গাড়ী এসে প্লাটফর্মে দাঁড়ানোমাত্র যেমন করে হোক ওদের নিয়ে কোনো কামরায় উঠে পড়বেন। আমি কুলি দিয়ে আপনাদের মালপত্রগুলি ধীরে ধীরে তুলে নেবো।

ঠিক রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে ডাউন লালগোলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি পাঁচ নম্বর প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াল। অমনি যাত্রীদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল হুড়োহুড়ি, কান-ফাটানো চিৎকার আর চেঁচামেচি। কে আগে উঠবে—এই নিয়ে সকলেই একসঙ্গে ততক্ষণে প্রত্যেক কামরার মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সব মুখেই নামার যাত্রীদের সঙ্গে ওঠার যাত্রীদের দস্তুরমতো ঠেলাঠেলি চলছে। এই বিমল, এই সমীর, এই কুলি—ইত্যাদি নানা কলরবে তখন গোটা প্লাটফর্মটি মুখর।

ওরই মধ্যে মা ছোটভাই অজিতকে কোলে নিয়ে এবং মেজভাই অমিতের হাত ধরে টানতে টানতে একটা কামরার গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাপড়ের আঁচল ধরে সুমিতও মার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু একা মায়ের পক্ষে এই বাচ্চা বয়সের তিন শিশুদের নিয়ে অত ভীড় ঠেলে কামরায় ওঠা দুঃসাধ্য।

কুড়ি মিনিট পর এই ট্রেন আবার ছাড়বে। অথচ যাত্রীদের ব্যস্ততা দেখে মনে হচ্ছে যেন ট্রেনটা ছাড়তে আর দেরী নেই। এই মুহূর্তে সবাই স্বার্থপর হয়ে গেছে। সবাই তখন চাইছে দুর্বলতরদের পিছনে ফেলে আগে উঠে আরাম করে বসার জন্য নিজেদের জায়গাটা দখল করে নিতে। কে পিছনে পড়ে রইল সেদিকে কারোরই কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। এইরকম ধস্তাধ্বস্তির সঙ্গে মা পেরে উঠবেন কেন? সম্মুখবর্তী একটা কামরার গেটের মুখে থতমত খেয়ে সুমিতদের মা ওদের নিয়ে বোকার মত প্লাটফর্মের ওপরই দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইতিমধ্যে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন জামাইবাবু। ঐ অবস্থায় সবাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, একি, এখনো আপনি ওঠেন নি? আমি সব মালপত্র ভেণ্ডারের কামরায় তুলে দিয়ে এলাম। আসুন

—আসুন—এগিয়ে আসুন, উঠুন আমার সঙ্গে।

সুমিতের হাত ধরে টেনে তুললেন জামাইবাবু। মাও তখন অন্য ভাইদের নিয়ে তাদের পিছন পিছন সামনের কামরায়। ভিতরের সকলকে অনুরোধ করে অবশেষে বহু কষ্টে মার জন্য একটু বসার জায়গা পাওয়া গেল। তাদের ঐভাবে ভিতরে বসিয়ে দিয়ে জামাইবাবু আবার চলে গেলেন ভেণ্ডারের কামরায়। মায়ের কোলে গভীর ঘুমে লেপটে রইল ছোটভাই অজিত, আর মেজভাই অমিত পাশ ঘেঁসে বসে মায়ের কাঁধে মাথা রেখে তার ছোট্ট শরীরটাকে এলিয়ে দিল। সুমিতের চোখ তখন অন্যদিকে। অত কষ্টে বসে থাকার দুঃখ ভুলে সে তখন দেখছে কিছু লোক কেমন সীটের পাশ দিয়ে লাফিয়ে উঠে ওপরের বাঙ্কে নিজেদের শোবার জায়গা করে নিচ্ছে। গুছিয়ে নিজের জায়গায় বসে কেউ কেউ নিশ্চিন্তে বিড়ি টানছে, কেউবা চা-ওয়ালার কাছ থেকে ভাড়ে করে চা নিয়ে মেজাজ করে সেই চা খাচ্ছে।

বাইরে থেকে কিছু কিছু লোক ইতিমধ্যে জানালা দিয়ে ভিতরের দিকে এক একবার উঁকি দিয়ে নিরাশ হয়ে চলে গেল। ওদের কেউ যেন একবার জিজ্ঞাসা করল, দাদা জায়গা আছে?

ভিতরকার যাত্রীরা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিচ্ছে না, দাদা নেই, সামনের দিকে দেখুন গে।

এই 'না' উত্তরটা যেন সকলের একেবারে মুখস্ত।

রাত ৯টা ৫৫ মিনিটের জন্য এখন সবাই উদ্‌গ্রীব। যাদের ঘড়ি আছে তারা অনেকেই বার বার হাতের ঘড়িটা দেখছেন। প্রত্যেকেই গাড়ী ছাড়ার ঐ নির্দিষ্ট মুহূর্তের জন্য ছট্‌ফট্ করছেন। মাঝে মাঝে কারো মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ভাষা শোনা যাচ্ছে। এই অবস্থায় ট্রেনটা হঠাৎ একবার পিছনের দিকে একটু পিছিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে আবার থেমে গেল। দু'একজন যাত্রী অমনি বলে উঠল, যাক্ বাঁচা গেল, এবার গাড়ীটা নিশ্চয়ই ছাড়বে।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অনেকেই ষ্টেশনের বড় ঘড়িটার সময় দেখে নিচ্ছিল। সুমিতও উঁকি মেরে দেখছিল, স্থির কাঁটাটা কিছুক্ষণ পরপরই দুলে উঠে কট্‌কট্ শব্দ করে সরে যাচ্ছে।

তখন ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র এক মিনিট বাকি। জামাইবাবু হঠাৎ দৌড়ে এসে সুমিতদের কামরায় আবার উঠলেন। এবার তার হাতে ছিল

কাগজের একটা ঠোঙা। মায়ের হাতে ঠোঙাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এতে কয়েকটা কচুরি আছে, রাতে যদি আর কিছু ব্যবস্থা না করা যায় তাই ওদের জন্য এই কচুরি ক'টা নিয়ে এলাম, সুমিত আর অমিতকে এগুলো খাইয়ে দিন। এক্ষুনি ট্রেন ছেড়ে দেবে। আমি পিছনের দিকে আছি, স্টেশনে ট্রেন থামলেই মাঝে মাঝে আমি এসে খোঁজ নিয়ে যাবো, কোন চিন্তা নেই।

হাত বাড়িয়ে মা খাবারের ঠোঙাটা ধরে নিলেন। জামাইবাবুও দ্রুত তাদের কামরা থেকে নেমে পিছনের কামরায় চলে গেলেন!

রাত ৯টা ৫৫ মিনিট হবার সংগে সংগেই ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা বাজল। পিছন থেকে ভেসে এল গার্ড সাহেবের বাঁশী বাজানোর শব্দ। মুখ বাড়িয়ে সুমিত দেখতে পেলো, অনেকটা দূরে ট্রেনের পাশে প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে সবুজ বাতিটা হাতে ধরে দোলাচ্ছেন গার্ডসাহেব। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে শোনা গেল ইঞ্জিনের দিক থেকে তীব্র স্বরের হুইসল। তারপর ফোঁস ফোঁস শব্দ করে দুলে উঠল তাদের ট্রেনটা।

সুমিত তখন উত্তেজিত হ'য়ে মনে মনে ভাবছে ঃ বিদায়—বিদায় কলকাতা। আমরা সত্যিই এবার চললাম সেই অজানা অচেনা জায়গায়, যার নাম ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু শিবির।

ওদিকে তখন তাদের মা দু'হাত জোড় করে চোখ বুঁজে আপন মনে প্রণাম করছেন।

প্রথমে সুমিত ভাবল হয়তো অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যেই এইভাবে প্রণাম জানাচ্ছেন। পরে তার মনে হল, এমনও হতে পারে, মা বোধ হয় কলকাতাকে তার শেষ বিদায় অভিবাদন দিচ্ছেন। আবার মনে হল, না ওসব কিছু নয়, মা হয়তো তার আগামী দিনের নতুন ঠিকানা— কেয়ার অব ধুবুলিয়া পি, এল, ক্যাম্পকে মনে মনে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

আড়চোখে প্রণামরত অবস্থায় মাকে একবার দেখে নিয়েই সুমিত সোৎসাহে তার দৃষ্টিটাকে আবার মেলে ধরল বাইরের দিকে। দেখতে দেখতে সমুখের দোকানপাটগুলি ক্রমশঃ পিছনের দিকে যেন সরে সরে মিলিয়ে গেল। ছুটন্ত কুলিরা দাঁড়িয়ে পড়ল, স্টেশনের সবরকম ব্যস্ততা মুহূর্তের মধ্যেই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

এদিকে তাদের ট্রেনের গতিও ধীরে ধীরে বাড়ছে। একটু ঝুঁকে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে পেলো ট্রেনের শেষ কম্পার্টমেণ্টও স্টেশন ছেড়ে

বেরিয়ে এল। মাঝে মাঝেই অন্ধকার সমস্ত ট্রেনটাকে গ্রাস করছিল। আবার বাইরে থেকে হঠাৎ আসা ক্ষণিকের আলো চকিতে তাদের স্পর্শ করে দূরে সরে যেতে লাগল।

লালগোলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি সমস্ত স্টেশনে দাঁড়ায় না। এক একবার ঝম্ ঝম্ শব্দ করে আলোকিত স্টেশনগুলি ভেদ করে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল তাদের ট্রেন। কোথাওবা রাস্তার লোকজনদের যাতায়াত সুমিতের চোখকে চঞ্চল করে তুলছিল। কোনো কোনো ছোট্ট ষ্টেশনের ঘর ও প্রতিক্ষারত অল্প কয়েকজন লোকদের ছুঁয়ে এবং পরক্ষণেই তাদের পাশ কাটিয়ে দ্রুতবেগে তাদের ট্রেনটা আবার এগিয়ে চলল।

ধীরে ধীরে রাতের গভীরতা বাড়ছিল। সুমিতেরও চোখদুটো ঘুমে ভেঙ্গে আসতে লাগল। পাশের ভদ্রলোকটি অনুকম্পাভরে একটু জায়গা করে দিলেন। অচিরে গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সুমিত।

ইতিমধ্যে কত স্টেশন পেরিয়ে গেল কত অবাক-করা দৃশ্য তার কৈশোরের স্বপ্নভরা মনকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল তার হিসেব নেই। তবুও কিন্তু সে মাঝে মাঝে আচমকা ঘুমের মধ্যেই তার মাকে জিজ্ঞাসা করে চলেছে ঃ মা, আমরা কখন নামব ?

মা নিজেও সঠিক জানেন না সেকথা। তবু তাকে প্রবোধ দিতে ফিস্ ফিস্ করে বলছিলেন ঃ আর একটুখানি। ঘুমো, সময়মতো আমি ডাকব।

মার ঐ আশ্বাসে নিশ্চিন্ত মনে সুমিত আবার মাথা নীচু করে নিদ্রার কোলে নিজেকে সঁপে দিতে লাগল।

এইভাবে কতটা সময় চলে গেল তার জানা নেই। আলগা ঘুমের মধ্যে একবার সে শুনতে পেলো নানা কণ্ঠের কলরব! হঠাৎ যেন চারিদিক আলোয় আলোময়। তার চোখের ওপর একরাশ আলোর তীব্র রশ্মি সজোরে এসে আঘাত করল। অমনি সে হুড়মুড় করে জেগে উঠেই তার মাকে বলল, মা···মা, এইতো স্টেশন, চল নামবে না ?

মা বললেন, নারে বাবা, এই স্টেশন নয়, এর পরেই।

ওদিকে জামাইবাবুর মুখ দেখা গেল জানালায়। উনি মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি মাসীমা, সব ঠিক আছে তো ?

সচকিত হয়ে উত্তর দিলেন মা, হ্যাঁ সব ঠিক আছে।

পরমুহূর্তেই উৎকণ্ঠিত হ'য়ে মা আবার বললেন, তুমি এমন করে

সব স্টেশনেই নেমো না, চিন্তাহরণ। কখন গাড়ী ছেড়ে দেবে, তখন হয়তো একটা বিপদ হতে পারে। দেখ্ছো তো আমার কপাল—!

মায়ের ব্যথাভরা মানসিক অবস্থাটা বুঝেই বোধ হয় প্রসংগটা পাল্টে দিলেন জামাইবাবু। আগ্রহভরে বললেন, একটু চা খাবেন মাসীমা?

না বাবা, আমি তো বাইরের চা খাবো না, বরং তুমি খাও। নিস্পৃহ কণ্ঠে কথা ক'টি বললেন মা।

চ্যা—চ্যা চাই চ্যা—। তারস্বরে চীৎকার করতে করতে চা-ওয়ালারা আসা-যাওয়া করছিল। আরও নানারকম হকারদের বিচিত্র ধরণের হাঁকডাক ও উঁকিঝুঁকিও চমকিত করছিল সুমিতকে।

মা একবার জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কোন্ স্টেশন, চিন্তাহরণ?

নৈহাটি। বললেন জামাইবাবু।

এরপর আর ক'টা স্টেশন পেরিয়ে কোথায় গিয়ে নামতে হবে তা' মা নিজেই চেনেন না বা জানেনও না। তাই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আর কত সময় লাগবে?

জামাইবাবু বললেন, আরও দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগবে হয়তো।

ঢ্যাং—ঢ্যাং—করে ট্রেন ছাড়ার সংকেত দিল এই ষ্টেশনের ঘণ্টা। বাজানোর শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই হুইস্‌ল বেজে উঠল গার্ড-সাহেবের। জামাইবাবুও জানালার শিকগুলো ছেড়ে দিয়ে দ্রুত পিছিয়ে গেলেন। আবার ট্রেন ঘস্ ঘস্ শব্দ তুলে একপা' দুপা' করে এগোতে শুরু করল। সুমিতদের কামরার মধ্যে তখন হকারদের ভীড় লেগে গেছে। এরা চলন্ত যাত্রীদের মুস্কিলআসান। কেউ চা, কেউ পানবিড়ি, কেউবা চানাচুর-লেবু ইত্যাদি নিয়ে যাত্রীদের পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরছে।

কাছে ডেকে ডেকে যাত্রীরা কেউ কেউ ঐসব কিনছে। হকারদের চীৎকারে কেউবা বিরক্তও বোধ করছে। সুখনিদ্রা ভেংগে যাবার জন্যে কারো কারো মুখে শোনা যাচেছ কটুকাটব্যভরা নানা মন্তব্য।

অবাক হয়ে সুমিত দেখছিল একজন যাত্রী কেমন নির্বিকার চিত্তে নিজের পকেটের একটা কৌটো বের করে তা থেকে একটা বিড়ি নিয়ে ফুঁ দিয়ে ঠোটে চেপে লাইটার জেলে বিড়িটা ধরিয়ে শুয়ে শুয়েই টানতে শুরু করলো।

বাইরে ভীষন অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবু সুমিতের মন মানছে না। ঘুরে ঘুরে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাচ্ছে সে। মিশকালো আঁধারে ঢেকে গেছে সব কিছু। না, আর না। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে তার ব্যাগ্র চোখদুটোকে ফিরিয়ে নিল। ঘুম আবার আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে।

এরপর কত পথ গেল বা কতদূর তারা এগলো তার কিছুই বুঝতে পারল না। হঠাৎ জামাইবাবুর ডাকাডাকিতে সুমিতের ঘুম ভেংগে গেল। ঘুমন্ত চোখেই দেখল জামাইবাবু কখন এসে জানালার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাদের ট্রেনটা কোনো এক অজানা স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে না থেকে তাদের কামরায় উঠে এসে মাকে জামাইবাবু বললেন, এবার তৈরী হয়ে নিন মাসীমা। এরপরই বাহাদুরপুর ষ্টেশন, ওখানে ট্রেন দাঁড়াবে খুবই সামান্য সময়। তারপরই কিন্তু ধুবুলিয়া।

জামাইবাবুর কথাগুলো শোনামাত্র মা সুমিতকে ধাক্কা দিয়ে তুলে দিলেন। নির্দিষ্ট জায়গায় পেঁছিতে আরো কিছু সময় হাতে থাকলেও মা আর দেরী করা আদৌ সমীচিন বলে মনে করলেন না। ভাইদেরও তৈরী করে নেবার জন্য দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একবার জামাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ক'টা বাজে?

'রাত একটা'—বলেই জামাইবাবু তাদের কামরা ছেড়ে চলে গেলেন। গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টাটা ঢ্যাং ঢ্যাং করে বেজে উঠল। আলোর মালায় সাজানো এই ষ্টেশনটাকে একবার দেখার জন্য কৌতূহলী চোখ মেলে বাইরের দিকে মুখটা বাড়ালো সুমিত। খুঁজতে খুঁজতে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ষ্টেশনের নামলেখা বোর্ডটার ওপর। দেখল, বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—কৃষ্ণনগর। সিটি দিয়ে তাদের ট্রেন কৃষ্ণনগর ষ্টেশন পেরিয়ে নেমে পড়ল নির্জন গ্রামের অন্ধকারে। আর কোথাও কোনো আলোর চিহ্নমাত্র নেই, চারিদিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। সামান্য একটু আলোর আভাসে সচল কি যেন দেখে আগ্রহভরে সেদিকে চোখ ফেরানো মাত্র দেখল তা' আর নেই। মুহূর্তের মধ্যে সেটাকে পিছনে ফেলে রেখে ছুটে এগিয়ে চলেছে তাদের ট্রেন। জানালা দিয়ে বেরিয়ে পড়া আলোতে শুধু লাইনের পাশের গুল্মরাজি ছাড়া কিছু আর দেখা যাচ্ছে না।

এবার সুমিতের মনে এবং সম্ভবতঃ তার মার মনেও একটা অজানা আশংকা দানা বাঁধছে। তাদের সেই কাম্য উদ্বাস্তুশিবির আগতপ্রায়।

আর খানিকক্ষণ পরেই ট্রেন থেকে নামতে হবে, নতুন করে তাদের জীবন শুরু করতে হবে ওখানে। নতুন জায়গাটা কেমন হবে কে জানে। নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষ, নতুন পরিচিতির আওতায় গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব অথবা আত্মীয়তার মাঝে নতুন করে মিশে যেতে হবে তাদের। ভেবে ভেবে সুমিত তো সারা। ভাবনার কোনো কূলকিনারা পাচ্ছে না সে। মায়ের মানসিক অবস্থাটাও হয়তো তারই মত। ভালমন্দ ভেবে ভেবে মা ও হয়তো দিশাহারা হয়ে পড়ছেন।

তাদের ট্রেনটা মুহূর্তের জন্য বাহাদুরপুরে দাঁড়িয়েই আবার ছুটতে শুরু করল। কিন্তু রেললাইনের পাশে চওড়ামত ওটা কি?

একজন বয়স্ক সহযাত্রী বললেন, অস্পষ্টভাবে ঐ যে দেখা যাচ্ছে--ওটা ন্যাশনাল হাইওয়ে। সুদূর পূর্বভারতের সঙ্গে এই রাস্তার যোগাযোগ।

ইঞ্জিনের চোখ-ধাঁধানো আলোর ফোকাস ছুটে গিয়ে পীচের ঐ চওড়া রাস্তাটাকে মাঝে মাঝে আলোয় যেন স্নান করিয়ে দিচ্ছে। কোত্থেকে হঠাৎ একটা বিশাল মালবাহী লরী দুলতে দুলতে তাদের চোখের সামনে এসে পিছনের ছোট লাল আলোটা দেখিয়ে অজ্ঞাত কোন পথে ছুটে পালাল। ইতিমধ্যে কখন সময় পেরিয়ে গেল। বাহাদুরপুরের পর অল্প দূরত্বটুকু অতিক্রম করে ট্রেনটা এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে তাদের ট্রেনযাত্রার শেষ লক্ষ্যস্থল ধুবুলিয়া স্টেশনে।

ট্রেন থামতেই মা ছোটভাইকে কোলে নিয়ে এবং অমিতের হাত ধরে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। পিছনে পিছনে মাকে অনুসরণ করল সুমিত। সত্যি সত্যিই এবার ধুবুলিয়া স্টেশনের ওপর নেমে দাঁড়ালো তারা সবাই। ওঠা-নামার যাত্রীদের তেমন কোনো ভীড় নেই এখানে। দূরে দূরে কয়েকটা তেলের বাতি টিম্ টিম্ করে জ্বলছে। স্টেশনের সামান্য অঙ্গটুকু ঐ আলোয় যেন থমথমে লাগছে। বাতিগুলোর অস্পষ্ট আলোর আভাসে রহস্যময় জায়গাগুলো ছাড়া বাকী সমস্ত স্টেশনের জায়গাটা মিশকালো অন্ধকারে মোড়া। যে দু'চারজন যাত্রী সুমিতদের সঙ্গে নামল তারা থাকল না সেখানে, অবিলম্বে তাদের গন্তব্য পথে পা বাড়িয়ে দিল। অনাথ অপরিচিত আগন্তুকের মত নির্বাক হয়ে অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে রইল শুধু সুমিতরা। এই অন্ধকারাবৃত নির্জন প্লাটফর্মে সুমিতদের নামিয়ে রেখে ট্রেনটা ধীরে ধীরে আবার নিজের পথ ধরে চলে গেল। চলমান ট্রেনের আলোয় দেখা গেল যে সমস্ত প্লাটফর্মটাই

একেবারে ফাঁকা। এই ভয়াবহ নির্জনতার মাঝে দু'একজন পোর্টার শুধু কেরোসিন বাতির মৃদু আলো দেখিয়ে অফিস ঘরের দিকে ফিরে যাচ্ছে।

নিশ্চয়ই ওদিকে জামাইবাবু মালপত্র নিয়ে নেমেছেন। কিন্তু এখনো ওনার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কেন! ভয়ে ভয়ে মা একবার জামাইবাবুর সন্ধানে অন্ধকারের দিকে চাইতেই দেখতে পেলেন হঠাৎ কে একজন অপরিচিত লোক এসে তাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। লোকটির গায়ে একটা কালো কোট, মাথায় ও কানে দস্তানা জড়ানো। গম্ভীর গলায় লোকটি বললেন, আপনাদের টিকিট?

হতভম্ব হয়ে মা একটু নিম্নস্বরে বললেন, সংগে লোক আছে, আসছে।

কৈ আপনার লোক? অবিশ্বাসী ভাব ফুটে উঠল লোকটির কণ্ঠস্বরে।

'ঐ যে—, আন্দাজে অন্ধকারের ওদিকে মাথা ঘোরালেন মা।

বলতে না বলতেই অকুস্থলে এসে হাজির হলেন সুমিতদের জামাইবাবু। মা এবার একটু দৃঢ়স্বরে বললেন, এইতো আমার লোক। চিন্তাহরণ—উনি টিকিট দেখতে চাইছেন।

বোঝা গেল লোকটি হয় এখানকার স্টেশনমাষ্টার, নয়তো টিকিট চেকার। ওকে জামাইবাবু কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই ছুটে এল একজন পোর্টার। পোর্টারটি এসেই তাদের সামনে দাঁড়িয়ে চেকারবাবুকে বলল, স্যার, উনি অনেক মাল নিয়ে এসেছেন, একবার বুকিংটা দেখে নেবেন।

চেকারবাবু ঐ কথা শুনে যথারীতি চোখদুটো বড় বড় করে বললেন তাই নাকি, কৈ—আপনাদের টিকিটগুলো দিন।

জামাইবাবু ব্যস্ত হয়ে পকেট থেকে 'ওয়ারেণ্ট' বের করে চেকারবাবুর হাতে দিতেই সমস্ত ব্যাপারটা সহজেই মিটে গেল।

এবার সাহসভরে চেকারবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন জামাইবাবু: ক্যাম্পটা কত দূরে বলতে পারেন?

সহানুভূতিসূচক নরম গলায় চেকারবাবু বললেন, সে অনেক দূরে। এই রাতে ওখানে যেতে পারবেন না। এখন কোনোভাবে স্টেশনে বাকী রাতটা কাটান, কাল সকালে যাবেন। সে ছাড়া রাতে যাওয়াও নিরাপদ নয়, এখানকার রাস্তা ভাল না।

কথাগুলো বলেই চেকারবাবু অফিস ঘরের দিকে চলে গেলেন। পোর্টারটাও নিরবে ওঁকে অনুসরণ করলো।

জামাইবাবু একটা কুলিকে ডেকে সুমিতদের মালগুলি এক জায়গায় জড়ো করে নিলেন। ভাদ্র মাসের শেষ রাত, হিম পড়ছে। কুয়াশায় সমস্ত প্লাটফর্মটাই আচ্ছন্ন। শীত শীত অনুভব করছিল সুমিতরা। কোথাও কোনো শেড দেখা যাচেছ না। বোঝা গেল খোলা আকাশের নীচে এখানে বসেই তাদের বাকী রাত কাটাতে হবে।

অগত্যা মা সুমিতকে আর তার মেজভাই অমিতকে কাঠের আলমারিটার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন। দরজাটা সামান্য খোলা রেখে ওরা দু'জনই ওর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। ছোটভাইকে কোলে নিয়ে নিজের কাপড়ের আঁচলে জড়িয়ে আলমারিটায় ঠেস দিয়ে প্লাটফর্মের ওপর বসে রইলেন মা, আর পায়চারী করে বাকী রাতটুকু কাটাতে লাগলেন জামাইবাবু।

এমনি করেই একসময় রাতের ঘোরটা কেটে গেল। ভোরের অস্পষ্ট আলো ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। সর্বদা সজাগ থেকেই সময়টা কাটিয়েছেন মা। পাখীদের কাকলী শোনামাত্র সচকিত হয়ে মা সবাইকে ডেকে তুলে দিলেন। জামাইবাবু অদূরের জংলা জায়গা থেকে একটা দাঁতন সংগ্রহ করে এনে দাঁত মাজতে মাজতে তখনও পায়চারী করে চলেছেন। ঘুম থেকে সুমিত ও অমিতকে উঠতে দেখেই জামাইবাবু তাড়াতাড়ি স্টেশনের কলের জলে মুখটা ধুয়ে এগিয়ে এসে মাকে বললেন, এবার সব খোঁজখবর নেওয়া যাক্। কিভাবে যাবে, কোথায় কার কাছে প্রথম যেতে হবে ইত্যাদি সব কিছুই জানা দরকার। চিন্তা করবেন না মাসীমা,—মনে হয় স্টেশনমাষ্টারের কাছে নিশ্চয়ই সব জানা যাবে।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন মা। মার সম্মতি পেয়েই জামাইবাবু ছুটে গেলেন স্টেশনমাষ্টারের কাছে। ওঁকে সব কিছু বলার পর উনি বল্লেন, আগে আপনাদের যেতে হবে হেড অফিসে।· ওখানকার কর্তাদের রিপোর্ট করলে ওদের গাড়ী এসে মালপত্রসহ আপনাদের এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে। হেড অফিসটা কিন্তু এখান থেকে এক মাইলের পথ।

স্টেশনমাষ্টারের কাছ থেকে ক্যাম্পের ব্যাপারে সব খোঁজখবর নেবার পর ফেরার পথে জামাইবাবু সকলের জন্য গরম গরম সিঙ্গাড়া কিনে নিয়ে এলেন। ঐগুলি দিয়ে পরমানন্দে সবাই প্রাতরাশ করতে লাগল। জামাইবাবু আর দাঁড়ালেন না। মাকে অপেক্ষা করতে বলেই উনি চলে গেলেন হেড অফিসের বাবুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

এদিকে প্লাটফর্মের ওপর মালপত্রের সংগে ঠাসাঠাসি হয়ে মা সুমিতদের নিয়ে বসে রইলেন। ধীরে ধীরে বেলা বাড়তে লাগল। চারিদিক দিবালোকে আলোকিত হয়ে উঠল। খানিকটা পরেই প্রভাতী সূর্যের আলো এসে গ্রাস করল তাদের। সুমিত কিন্তু তখন তার জায়গাটুকুতে ঠায় বসে থাকেনি, ছুটে ছুটে এদিক ওদিক গিয়ে সবকিছু লক্ষ্য করছিল।

এমন প্রাকৃতিক দৃশ্য এর আগে কখনও দেখেনি সুমিত। চারিদিকে বিচিত্র সব গাছগাছালির ভীড়, অদূরের খোলা মাঠ, গাছে গাছে কতো অজানা পাখীদের কলকাকলী—সবটা মিলিয়ে পল্লীর শান্তশ্রী যে কত মধুর হয় তা এর আগে কখনও বোঝেনি সে। প্লাটফর্মের এক প্রান্তে এগিয়ে গিয়ে দেখল—গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূরে ঐ তো দেখা যাচ্ছে ধানের ক্ষেত, কোথাও বা পাটের ক্ষেত।

এর রূপই আলাদা। সামনের ওই প্রকৃতির রূপটাই কখন তার মন থেকে কলকাতার স্মৃতিটা বেমালুম মুছে দিয়েছে। অট্টালিকা তো দূরের কথা, এখানে কোনো সাধারণ পাকাবাড়ী পর্যন্ত নেই। এমনকি নেই ট্রেনে আসতে আসতে দেখা সেই পীচ দিয়ে মোড়া চওড়া রাস্তাটার চিহ্নটুকুও। লোকজনের চলার একটা পথ দেখা যাচ্ছে বটে, তবে তা কাদামাখা মাটিরই কাঁচা পথ। ক্ষেতের আলোর ওপর দিয়েই দু'একজন লোক এসে ঐ মাটির পথ ধরে স্টেশনের দিকে আসছে। নিজের নিজের পদযুগলই হচ্ছে এখানকার একমাত্র যানবাহন।

সামনের ঐ দৃশ্য দেখে দেখে সুমিত তো বিভোর, কিন্তু ইতিমধ্যে যে অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। কৈ, জামাইবাবু তো হেড অফিস থেকে ফিরে আসছেন না। মা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ছেন। এতটা সময় বয়ে গেল, তবু জামাইবাবু ফিরছেন না কেন? মেঠো পথটার দিকে হাঁ করে তারা সকলে তাকিয়ে আছে। তবে কি উনি পথ হারিয়েছেন, কোথায় কোনদিকে হেড অফিস তা চিনতে পারেন নি? নাকি, তাদের দরুণ ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি হয়েছে? নয়তো ওনার ফিরতে এত দেরী হচ্ছে কেন?

মনে যেমন এমনি নানা অজানা আশংকা বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে বেলাও। রোদ্দুরে আর তো খোলা জায়গায় বসে থাকা যায় না। স্টেশনেও আবার যাত্রীদের ভীড় জমে উঠেছে। যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ এসে তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন।

আপনারা কি নতুন এলেন ?

হ্যাঁ।

পাকিস্তানে কোথায় ছিলেন ? কেন এলেন ?

খুব সতর্ক হয়েই মা সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। দেশ-গ্রামের কথা, এখানকার ক্যাম্পে আসার কারণ ইত্যাদি সব।

স্টেশনের ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজল। পোর্টার জোরে জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। ট্রেন আসছে। ঘণ্টা শুনে প্রশ্নকারী যাত্রীরা সরে গেল। এতক্ষণ ওদের প্রশ্নাদিতে জর্জরিত মা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সকলেই তখন লাইনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দূরের দিকে তাকাতে লাগল। দূরের সিগন্যালটা নীচের দিকে ঝুঁকে পড়তেই বহু দূর থেকে অগ্রসরমান চলন্ত ট্রেনের একটা আওয়াজ এসে সমস্ত যাত্রীদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করল। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল ঐ ট্রেনে ওঠার জন্য।

ট্রেনটা এসে প্লাটফর্মের সব জায়গাটা জুড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হুড়োহুড়ি শুরু হ'য়ে গেল যাত্রীদের মধ্যে। সামান্য কয়েকজন নামল, তার চেয়ে বেশী লোক উঠল ট্রেনে।

দারুণ কৌতূহল হচ্ছিল সুমিতের। গোবেচারা গোছের জনৈক বৃদ্ধ যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, এই গাড়ীটা কোথায় যাচ্ছে দাদু ?

চলে যেতে যেতে মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিল যাত্রীটি : কলিকাতা।

কলিকাতা ! জায়গার নাম শুনে তার মনটা মুহূর্তের জন্য কেমন যেন হ'য়ে গেল। একটা উদাসী আচ্ছন্নভাব মধ্যে ভাবতে লাগল : সেই কলকাতা, তার আবাল্য কৈশোরের ক্রীড়াভূমি। ভালবাসার সেই স্নেহ-মায়া-মমতা জড়ানো কলকাতা। কোথায়—কতদূরে ফেলে এল তাকে। আর কি সেখানে ফিরে যাবে কখনো ?

মুহূর্তের মধ্যে সে ভাবটা মিলিয়ে গেল। নিদারুণ ক্ষোভ এসে তার মনকে অধিকার করে বসল। ভাবতে লাগল—ভালই হ'য়েছে, কলকাতা তো তাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। সে তো ওকে ছাড়তে চায়নি, তবে কেন···? না, অতএব এখন কলকাতা তার কাছে শুধু অকৃতজ্ঞই নয়, বেইমানও। বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে যে পারে না, সে আবার বন্ধু কিসের ? ওকে ভুলতেই হবে।

তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। সামনের থেমে থাকা ট্রেনটার প্রথম স্টার্ট নেবার প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠে সে একবার নড়েচড়ে বসল। তার চোখ

পড়ল চলমান চাকাগুলোর ওপর। চাকাগুলো যত ঘুরছে, ট্রেনের বেগও তত বাড়ছে। সে চলন্ত ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে আছে তো আছেই, যতক্ষণ না প্লাটফর্ম ছেড়ে দূরের আমবাগানটাকে পাশে রেখে বাঁক ঘুরে ঐ বাগানেরই ওপাশে সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেল ট্রেনটা।

এদিকে-প্লাটফর্মটা আবার ফাঁকা হ'য়ে গেল। এমনিভাবে আটটার ট্রেনও এল, আর চলে গেল। কিন্তু জামাইবাবুর কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। চনচনে রোদে আর বসে থাকাও যাচ্ছে না। মা এবার ছোটভাই ও অমিতকে নিয়ে প্লাটফর্মের মধ্যেই একটা ছায়াঘেরা বড়সর গাছের নীচে আশ্রয় নিলেন। বিনামূল্যে নির্ভরশীল আশ্রয়দাতা হিসেবে বৃক্ষছায়াই বোধহয় সর্বোত্তম।

শৈশবের চাঞ্চল্য কিন্তু সুমিতকে এক জায়গায় একটুও বসতে দিতে চাইছে না। মুক্তির স্বাদভরা আনন্দে অত উৎকণ্ঠিত সময়েও সে তার মা ও ভাইদের দৃষ্টির সীমানায় রেখে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। আবার ক্লান্ত বোধ করলেই আশ্রয় নিতে ফিরে আসছে সেই গাছের ছায়ার নীচে।

এমনি করে বেলা দশটা বেজে গেল। অথচ এখনো জামাইবাবুর কোনো পাত্তা নেই। শুধু ক্লান্তি নয়, এবার একটু একটু ক্ষুধাও অনুভব করছে। অবশেষে ভয়ে ভয়ে মাকে একবার বলেই ফলল ঃ ওমা, খিদে পেয়েছে।

নিঃশব্দে মা একবার সুমিতের মুখের দিকে তাকালেন।

সুমিত লক্ষ্য করল দারুণ অসহায়ের ছায়া পড়েছে মার মুখে। এই অবস্থায় মার কিছু করার নেই। এখানে কাউকে মা চেনেন না, কোথায় কি পাওয়া যায় তাও মা জানেন না।

তবু মা সুমিতকে বললেন, এইতো, এবার গিয়েই তোদের খাবার ব্যবস্থা করছি।

ছোটভাই ও অমিত ক্ষুধায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, সুমিতও ক্ষুধায় কাতর। তবু তারা অপেক্ষা করছে। এমনি অপেক্ষা করে করে সকলের ধৈর্যের বাঁধ যখন একেবারে ভেঙে পড়ার মুখে তখনই হঠাৎ জামাইবাবু এসে হাজির হলেন। ঘড়ির কাঁটায় তখন বেলা সাড়ে এগারোটা বাজে।

এসেই জামাইবাবু বললেন, চলুন এবার আমাদের যেতে হবে, আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে স্টেশনের বাইরে লরী দাঁড়িয়ে আছে।

জামাইবাবুর সংগে দু'জন মজুর এসেছে। দেখিয়ে দিতেই মজুররা তাদের মালপত্রগুলি ধরাধরি করে লরীতে নিয়ে ওঠালো। তারাও ওদের পিছু পিছু গিয়ে লরীতে উঠে বসল।

লরীতে চড়ে কোথাও যাওয়া স্নমিতের জীবনে এই প্রথম। আর বোধ হয় এই প্রথম একটা গোটা ফ্যামিলির জন্য এত অল্প মালপত্র মজুরদের বইতে হল। লরীর একটা কোণে পড়ে রইল তাদের মালপত্র, তারা ডালার ঘেরার মধ্যে আর এক কোণে বসে রইল।

বাইরের সামান্য চওড়া এই পীচের রাস্তাটা স্টেশনের প্লাটফর্ম থেকে দেখতে পাওয়া যায়নি। বলতে গেলে এই রাস্তাটাই এখানকার একমাত্র রাজপথ এবং এটা চলে গেছে সোজা ক্যাম্পের দিকে। এই রাস্তা ধরে তাদের লরী চলছে। সামনের লেবেল-ক্রসিং পেরিয়ে হাজির হলো একটা মোড়ে। মোড়ের পাশে একটা বিরাট বটগাছ আছে। বটগাছের ঝুরিগুলো ডাল থেকে বড় বড় থামের মত মাটিতে নেমেছে, বহুদূর পর্যন্ত সেগুলি ছড়িয়ে রয়েছে। গাছটির কাছাকাছি হতেই মজুররা চিৎকার করে বলে উঠল, মাথাটা নীচু কর, মাথাটা নীচু কর।

সামনে তাকাতেই তারা দেখল ওদের হুঁশিয়ারীটা ঠিকই বটে। ঐ বটগাছেরই একটা বিশাল শাখা নীচু হয়ে রাস্তাটাকে প্রায় আটকে দিয়েছে। সকলেই মাথা নীচু করে বসে রইল। তাদের লরীটা ধীর গতিতে শাখাটার তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল। এবার দেখা গেল রাস্তার অনতিদূরে বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা একটা বোর্ড, তাতে লেখা রয়েছে 'ধুবুলিয়া ইউনিয়ন বোর্ড'। ঐ বোর্ডটার পাশেই কিছু লোক ভীড় করে জটলা করছে। এখান থেকে রাস্তা বাঁদিকে ঘুরে গেছে। একটু পরেই এই ছোট পীচের রাস্তা ছেড়ে বিরাট চওড়া এক কংক্রীটের রাস্তায় উঠল তাদের লরী। এমন সুন্দর, মসৃণ এবং চওড়া রাস্তা সচরাচর দেখা যায় না। জামাইবাবুকেই স্নমিত জিজ্ঞাসা করল, এ্যাতো বড় রাস্তা কেন?

উনি বুঝিয়ে বললেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে মিলিটারী এয়ার-বেস ছিল।

ওনার কথামত পাশেই দেখা গেল পাহাড়ের মত উঁচু ত্রিকোণাবৃত্ত খানিকটা বাঁধানো জায়গা। যুদ্ধের সময় ওখানেই এয়ারক্রাপ্ট-গুলিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হত।

কংক্রীটের এই চওড়া রাস্তার বুক চিরে তাদের লরীটা দ্রুত গতিতে

এগিয়ে চলেছে। নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ এবং নতুন দেখার উত্তেজনায় তারা ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা একেবারে ভুলে গেছে। চলতে চলতে সামনেই আবার একটা মোড় এল। সবিস্ময়ে তারা দেখতে পেলো একপাশে কিছু দোকান-পাট। মজুরদের কাছ থেকে শুনল যে এটাই নাকি ধুবুলিয়া বাজার।

তাদের লরী এবার ডাইনে বাঁক নিল। বাঁক ঘুরতেই কিছুদূরে দেখা গেল একটা দোতলা বাড়ী। বাড়ীটার পাশে গিয়েই তাদের লরী দাঁড়িয়ে পড়ল। এই দোতলা বাড়ীটাই শিবিরের হেড অফিস। ধুবুলিয়া ক্যাম্পের সমস্ত উদ্বাস্তুদের তদারকি এই মহালয় থেকেই পরিচালিত হয়।

মজুররা লরীর ডালা খুলে তাদের মালগুলি চটপট্ অফিসের বারান্দায় নামিয়ে দিল। তারাও লরী থেকে নেমে গিয়ে বারান্দায় নামানো মালগুলির একপাশে দাঁড়াল।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কোন লোকজন নেই, কেউ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করছে না। কোথায় থাকবে, কি করবে—কিছুই তারা বুঝতে পারছে না। সকলেই হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময়ে হঠাৎ একজন সিপাই এসে তাদের জামাইবাবুকে ডেকে বলল, আপনাকে ভিতরে ডাকছে।

সিপাই-এর নির্দেশমত জামাইবাবু ভিতরে মানে অফিস ঘরের মধ্যে চলে গেলেন এবং একটু পরেই ফিরে এসে বললেন, আজকে এখানেই আমাদের থাকতে হবে, স্টকে ত্রিপল নেই সুতরাং কোনো গ্রুপে পাঠাতে পারছে না। আজ ওরা কোনো খাবার ব্যবস্থাও করতে পারবে না, শুধু চিড়া আর গুড় দেবে।

অগত্যা জামাইবাবু একটা একটা করে মালগুলি অফিসের বারান্দার দেয়াল ঘেঁষে সরিয়ে জড়ো করে নিলেন। অফিস ঘরের এই ফাঁকা বারান্দায় এখন অনির্দিষ্টকাল পড়ে থাকতে হবে ভেবে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল সুমিতরা। এদিকে তার ছোটভাইটা খিদের জ্বালায় চিৎকার শুরু করেছে, মেজভাই অমিতও মায়ের আচল ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। সকলেরই এখন শুধু একটাই রোগ, সে রোগ—ক্ষুধা, ঐ রোগ থেকে আপাততঃ তাদের মুক্ত করবার মত কোন উপায় নেই। হাতেও তাদের আর কোন জমান পয়সা কড়ি অবশিষ্ট নেই। তাই এই অপরিচিত জায়গায় ক্ষুধায় কাতর ছেলেদের চিৎকার শুনে শুনে মা একেবারেই

দিশেহারা।

এই দিশেহারা অবস্থার মধ্যেও একটু আশার আলো জ্বলে উঠল। একটা বেয়ারা গোছের লোক এসে আবার ডাক দিল। ডাক শোনামাত্র জামাইবাবু এগোতেই লোকটি বলল, না, না, আপনি নন, ওঁকে আসতে হবে। আপনার পালা এবার শেষ। এখন থেকে যা কিছু সব ওঁকেই করতে হবে।

লোকটির নির্দেশমত জামাইবাবুকে ছোটভাইদের দেখতে বলে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রেখে শুধু সুমিতকে সঙ্গে নিয়ে মা অফিস ঘরের মধ্যে গিয়ে হাজির হলেন।

ঢুকতেই দেখা গেল, সামনেই একটা বড় টেবিল। টেবিলের ওপাশে একজন বাবু বসে আছেন। বাবুটি মাকে বললেন, আপনার নাম ?

সংকোচভরে মা উত্তর দিলেন, সুনন্দা চ্যাটার্জী।

: কজন লোক ?

: মোট চারজন।

: কে কে ?

: আমি, আর আমার তিন ছেলে।

: এই কি আপনার বড় ছেলে ?

: হ্যাঁ।

এইভাবে তাদের অতীত ইতিহাস থেকে শুরু করে বর্তমান অবস্থা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্তই জিজ্ঞাসা করলেন বাবুটি। তারপর ঝাকুনি দিয়ে অফিস ঘরের মাটিতে কালি ফেলে হাতের কলমটা দিয়ে একটা শ্লিপ লিখে মায়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, যান্, এটা নিয়ে ষ্টোরে গেলেই খাবার পাবেন। আজ এখানেই থাকবেন, কাল সকালে আপনাকে গ্রুপে পাঠাতে পারব।

খাবারের কথা শুনে চঞ্চল হয়ে সুমিত মাকে টানতে লাগল। মুখে বলল, চল মা, তাড়াতাড়ি ষ্টোরে চল।

ষ্টোরটাও তারা চেনে না। সামনের পাহারাওয়ালা সিপাইটাকে জিজ্ঞাসা করতেই পথ দেখিয়ে দিল সে। সেই পথ ধরে মা সুমিতকে নিয়ে হাজির হলেন ষ্টোরের দরজায়।

একটা লোক ষ্টোরের গেটে বসে হিসাবনিকাশ করছিল। মা হাত বাড়িয়ে তাকে শ্লিপটা দিতেই চাঁদির ফ্রেমের চশমাপরা নাকটাকে তুলে

লোকটি একবার তাদের দেখে নিল। একটু পরে নিস্পৃহ কণ্ঠে মাকে বলল, অ, আপনি বুঝি নতুন ?

মা নিম্নকণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ।

ভিতরে কর্মরত লোকদের উদ্দেশ্যে তারপর লোকটি চেঁচিয়ে বলল, একটা থালা, একটা মগ, চার পোয়া চিড়া, এক পোয়া গুড় দিয়ে দে।

শ্লিপটা দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল তারা। প্রতীক্ষা—প্রতীক্ষা, এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি তারা যে ভিখিরীর মত একদিন তাদের থালা হাতে নিয়ে পরের দুয়ারে দাঁড়াতে হবে। ভাগ্যই এখন একমাত্র ভরসা। না দাঁড়িয়েই বা উপায় কি ?

অফিসের লোকজনদের কাজকর্মের ঢিলেমী ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন ওরা দয়া পরবশ হয়ে নিজস্ব ভাণ্ডার থেকে কিছু সাহায্য দিয়ে তাদের উদ্ধার করছে। দেবার ব্যাপারে ওরা ইচ্ছেমত গড়িমসি করলেও খিদের জ্বালায় আর তিষ্ঠোতে না পেরে স্নিমিত একবার বলেই ফেলল, কৈ, দিন।

ওজন করতে করতে একটি লোক বলল, দাঁড়াও, ফ্রিতে খেতে হলে একটু অপেক্ষা করতে হয়।

এমন হৃদয়বিদারক কথা জীবনে কখনো তারা শোনেনি। চুপ করে মাথা নীচু করে আরও অপেক্ষা করতে লাগল।

একজন লোক ভিতর থেকে মেঝেয় ঢালা রাশীকৃত চালের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এসে মার হাতে থালা ও মগটা ধরিয়ে দিল। থালার মধ্যে চিড়া আর তারই ওপর ঝোলা গুড়। একবার ওরা ভাবলও না যে চিড়া ও গুড় একসঙ্গে মিশিয়ে না দিয়ে আলাদা করে দেয়াই উচিত ছিল। চিড়াটা যে খাবার আগে একবার জলে ধুতে হবে সে কথাটা ওরা ভাবাই দরকার মনে করেনি।

উদ্বাস্তু শিবিরের সর্বহারাদের দলে তারা যে এবার ভিড়েছে, মুখ বুজেই এসব মেনে চলতে হবে তাদেরও। অগত্যা নিরুপায় হয়ে মাথা হেঁট করে থালাটা আর মগ হাতে নিয়ে সাময়িক বাসস্থান হেড অফিসের বারান্দায় তারা ফিরে গেল।

অনভ্যস্থ হলেও কালচে পড়া সেই চিড়া ও গুড় বহু কষ্টে গলধঃকরণ করে নতুন জীবন শুরু হল তাদের। ধীরে ধীরে বেলাও তখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

জামাইবাবু ওখানকার অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর শমিণ্টার ফণি নাগের সঙ্গে

সাক্ষাৎ করলেন। মিঃ নাগ আশ্বাস দিয়ে বললেন, ভাববেন না, কালই ওদের কোন একটা গ্রুপে পাঠিয়ে দেব।

ধুধুলিয়া উদ্বাস্তু শিবির কয়েকটা বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা। প্রত্যেকটি গ্রুপে একটা করে অফিস। এই হেড অফিসের মাধ্যমেই ঐসব গ্রুপের সকল উদ্বাস্তুদের দেখাশোনা—অর্থাৎ গ্রুপ অফিসগুলির সবরকম তদারকি করা হয়।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে চারটা। মিঃ নাগ অফিসের কাজ সেরে বাড়ি ফিরছেন। অফিস থেকে বেরিয়েই বারান্দায় সুমিতদের দিকে এগিয়ে এলেন। মাকে নমস্কার করে উনি একটাই প্রশ্ন করলেন, এই তিনটিই আপনার ছেলে ?

প্রতিনমস্কার করে নতমস্তকে মা সবিনীত উত্তর দিলেন, হ্যাঁ।

আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে সরকারি জিপে উঠে পড়লেন মিঃ নাগ। জিপ ষ্টার্ট দিয়েই ছুটল ওঁর কোয়ার্টার কাঁঠালবাগানের দিকে। সুমিতরা সে রাতের মত সেইখানে বারান্দার বাসিন্দা হয়ে পড়ে থাকতে হবে বুঝে মনে মনে প্রস্তুত হল।

জামাইবাবু দু'একজন লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন কোনো ভয়-টয় আছে কিনা ইত্যাদি। সকলেই ভরসা দিলেন। এবার জামাইবাবু মাকে বললেন, মাসীমা আমি তো অফিস ছুটি করে আসতে পারিনি, আপনি যদি বলেন তো আজই রাত সাড়ে সাতটার ট্রেন ধরে কলকাতা ফিরে যাই। তাহলে কাল অফিসটা করতে আমার সুবিধে হবে।

মা একটু চিন্তা করেই বললেন, হ্যাঁ, এখানে কোন থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা নেই, শুধু শুধু তোমাকে আর অনর্থক কষ্ট দিতে চাই না। তুমি এমনিতেই যা করলে সে ঋণ আমি কোনদিন শোধ দিতে পারব না।

জামাইবাবুও আমতা আমতা করে বললেন, কি যে বলছেন !

তাদের কথাবার্তার মধ্যে পাহারাওয়ালা পুলিশটা কাছে এসে দাঁড়াল। সব শুনে সে অভয় দিয়ে বলল, কোন চিন্তা নেই, আমারা লক্ষ্য রাখব। সারারাত লোক এখানে পাহারায় থাকে।

সুমিতদের জামাইবাবু চিন্তাহরণ ভট্টাচার্য্য তারপর মাকে প্রণাম করে এবং মাঝে মাঝে তাদের খবরাখবর নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরতি ট্রেনে কলকাতায় ফেরার জন্য স্টেশনের পথ ধরলেন।

আস্তে আস্তে সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তের রক্তিম মেঘরাশির মধ্যে লুকিয়ে

পড়ল। অস্পষ্ট অন্ধকার নেমে এল সমস্ত শিবিরবাসীর গৃহকোণে। এমনিতেই এ এলাকায় কোন যানবাহন নেই, তার ওপর যা-ও দু'একটা রিক্সা বা সাইকেল দেখা যাচ্ছিল সেও আর নেই। সন্ধ্যার আভাস দিয়ে ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি বেজে উঠল। দু'হাত তুলে মা ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করলেন। এই রাতটা তাদের বারান্দায় বসে কাটাতে হবে। চারিদিকের বাড়ি-ঘর-অফিস এখান থেকে অনেকটা দূরে। পাহারাওয়ালা ছাড়া কোন লোকজনের চিহ্নও নেই। নির্জন রাতে মা শুধু তার ছেলেদের মাঝে একাই বসে বসে প্রহর গুনতে লাগলেন। একটানা ঝিঁঝিঁর ঐক্যতানের মধ্যে সুমিতরা মায়ের ছত্রছায়ায় পাশাপাশি শুয়ে নিশীথনিদ্রায় মগ্ন রইল।

ভোর হতেই দু'একটি লোক রাস্তায় দেখা গেল, নেমে এল বাজারের বিক্রেতার দল। কারো মাথায় ঝুড়ি, কারো মাথায় বস্তা। সকলেরই একমুখী গতি বাজারের দিকে। সকালের সূর্য্য সমস্ত এলাকাকে যখন স্নান করিয়ে পূর্বচক্রবালে বিকীর্ণ রশ্মি নিয়ে দণ্ডায়মান তখন ক্রেতাদেরও আনাগোনা শুরু হ'ল। উদ্বাস্তু শিবিরের একটা জীবনপ্রবাহ যেন পরিলক্ষ্যিত হ'ল। বাজার করার ইচ্ছে মায়ের নেই, কারণ সুযোগও ছিল না।

ঘুম ভাঙতেই নিত্যদিনকার মতো খাবারের প্রত্যাশায় মাকে বিরক্ত করতে লাগল সুমিত ও তার ভাইরা। নিরুপায় মা গতদিনকার অভুক্ত চিড়া গুড়ের অংশ বের করে তাদের খেতে দিলেন। ঐ খাদ্যঘটিত বিগত দিনের ইতিহাস বা অবস্থা তাদের কাছে পরাজিত সৈনিকের মত মনের এক কোণে নির্বাসিত হ'ল। তারা সেই কালচে পড়া চিড়াগুড় দিয়েই উদর পূর্তি করতে লাগল। অতীতের বাবার আদর, আত্মীয়স্বজনদের কোলাহল মুহূর্তের মধ্যে এই চিড়াগুড়ের স্বাদের কাছে ম্লান হয়ে গেল।

বেলাও বাড়তে লাগল। ইতিমধ্যে দুই একজন অফিসবাবু আসতে শুরু করেছেন। ধুতি পাঞ্জাবী পরা ছিপ্‌ছিপে ফর্সা এক ভদ্রলোক একটা লম্বা বড় খাতা নিয়ে তাদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, আপনিই কি সুনন্দা চ্যাটার্জী ?

মায়ের উত্তর একটি কথাই ঃ হ্যাঁ।

আপনাদের সাত নম্বর গ্রুপে যেতে হবে। আমি লরি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ধাঙ্গর সঙ্গে যাবে। ওরাই আপনাদের ত্রিপল টাঙিয়ে দিয়ে

আসবে।

এর আগে তারা কখনও ত্রিপল দেখেনি বা ত্রিপলের প্রয়োজনীয়তা কি জানতো না। অধীর আগ্রহে তাই ত্রিপল ও লরীর জন্য অপেক্ষায় রইল।

ত্রিপল নিয়ে লরী এসে হাজির হল একটু পরে। সংগের লোকরাই মালগুলি হাতে হাতে তুলে নিল। লরীও মালপত্রসহ তাদের সবাইকে নিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটতে লাগল। বাজারটা ডাইনে রেখে বাঁয়ের রাস্তা ধরে সোজা সিমেন্টের বড় রানওয়ে ধরে চলতে লাগল। এরপর দু'একটা বাঁক ঘুরেই লরীটা নির্দিষ্ট স্থলে পৌঁছে দিল তাদের।

এটাই গ্রুপ নম্বর সাত। দুই লাইন করে রাস্তার দু'পাশে সারি দিয়ে দোচালা ঘর। পাঁচ ইঞ্চি ইটের দেওয়াল দেয়া ঘরগুলি সুন্দর সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আপাততঃ কোন ঘর ফাঁকা নেই বলেই তাদের ত্রিপলের মধ্যে থাকতে হবে। লরীটা এসে সারি দেয়া ঘরগুলির শেষ প্রান্তে দাঁড়াল। পাশের ফাঁকা জমিতে ধরাধরি করে ত্রিপলটা টাঙানো হয়ে গেল। তাদের ওই এলাকাই উদ্বাস্তু শিবিরের শেষ সীমানা।

এমন তাঁবু-ঘর তারা কোনদিনই দেখেনি। একটা কাঠের বাতা দিয়ে মাঝখানটা জাগিয়ে রাখা হ'য়েছে। বাইরে থেকে এই বাতার ওপর দিয়ে ত্রিপলটা ক্রমশঃ নিচু হয়ে এসে মাটিতে মিশে গেছে। একটা লোক মাথা সোজা করে এর মধ্যে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারে না। এই তাঁবু-ঘরের মধ্যেই শুরু হল তাদের নতুন সংসার। মালপত্রগুলি কোনোরকমে ঘরের একপাশে গুছিয়ে রাখলেন মা।

পরক্ষণেই তাদের ডাক পড়ল গ্রুপ অফিস থেকে। খবর এল একবার গ্রুপ-অফিসে যাবার জন্য। পথ তখনও তাদের অপরিচিত। মা ত্রিপলের ঘর থেকে বেরোবার মুখ দড়ি দিয়ে বেঁধে সকলকে সংগে নিয়ে চললেন অফিসের দিকে। সোজা রানওয়ে ধরে এসে একটা তিনরাস্তার মোড়ে পৌঁছলেন। পথচারী একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন সামনের মাঠটা পেরোলেই দেখা যাবে বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ স্কুল। ওই স্কুলের পাশেই গ্রুপ-অফিস।

গ্রুপ অফিসে হাজির হতেই স্টোরকিপারবাবুর কাছে যেতে হল। তাদের জন্য নতুন রেশন কার্ড দেওয়া হল, কার্ড নম্বর হল দু'শ সত্তর। কার্ডের ওপরে লেখা হল দু'জন পূর্ণবয়স্ক দু'জন শিশু—মোট চার জন।

বরাদ্দমত চার সের চাল, চার সের গম এবং দুই সের ডাল নিয়ে আবার তারা তাদের সদ্য বানানো ত্রিপলের ঘরে ফিরে এল। ঐ খাদ্যগুলি ছিল তাদের পনেরো দিনের সম্বল এবং সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল নগদ মাথা পিছু চার টাকা ন'আনা। এমন করেই তাদের মেপে চলার দিনের শুভ উদ্বোধন হল।

সেই দিনটা তাদের জিনিষপত্র তেমন গোছানো ছিল না বলে খিচুড়ি-অন্ন দিয়ে দিনপাত করতে হল। ধীরে ধীরে তারপর দিনের আলো পশ্চিম আকাশে মিলিয়ে যেতে লাগলো। মনে তখন তাদের নানা অজানা ভীতি উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে। রাতটা এখানে কেমন হবে কে জানে!

ত্রিপলের সামনেই প্রশস্ত রাস্তা। পিছনে বিশাল একটা পুকুর। পুকুরের অপর পারে একটা ইংরেজ আমলের পুরণো পোড়োবাড়ী। একসময় ঐ বাড়ীটায় ছিল মিলিটারীদের আস্তানা। তার পাশেই প্রকাণ্ড বড় একটা তেঁতুল গাছ। বহু পুরনো এই গাছটা।

সন্ধ্যা হতেই সমস্ত উদ্বাস্তু শিবির অন্ধকার। কোথাও এতটুক আলোর চিহ্নমাত্র নেই। রাস্তায় লোকজনের চলাচলের শব্দও নেই। মাঝে মাঝে দূর-দূরান্তে ছোট ছোট টিমটিম করা সচল আলো ধীরগতিতে মাঠের পথ ধরে গ্রামের দিকে যাচ্ছে। ক্ষণিকের জন্য হঠাৎ কখনও কারও ঘরের হ্যারিকেন বা বাতির আলো দরজার ফাঁক দিয়ে চোখে ভেসে উঠছে। ইতস্ততঃ কিছু কিছু ঐ আলোর আভাসটুকু ছাড়া সমস্ত উদ্বাস্তু শিবিরটাই রাতের গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

স্মিতরা বরাবর কলকাতার আলো-জল-আবহাওয়ার মানুষ। বিশেষতঃ আলো তাদের সব সময়ের সংগী। এখানে তাই নিরন্ধ্র অন্ধকারের আতঙ্কে তাদের মনে ভীতির সঞ্চার হতে লাগল। কোন কথা বলার উপায় নেই, কেউ ভরসা দেবারও নেই। সন্ধ্যা হতেই তারা কোনরকমে বিছানাটা পেতে চারজন জড়সড় হয়ে বসে।

সমস্ত উদ্বাস্তু শিবিরের শাসনভার নিল রাতের জন্তু জানোয়াররা। অন্ধকার মাঠে পুকুরের চারপাশে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। এর কোনো বিরতি নেই, এক সুরে ডেকেই চলেছে। কানের মধ্যে একই শব্দ—ঝিঁ ই-ই-ই। থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে পুকুরপাড়ের তেঁতুলগাছটায় বড় পাখীগুলির ডানা ঝটপটানির শব্দ। মনে হচ্ছে এই বুঝি ভেঙে ওরা

পুকুরের মধ্যেই পড়বে।

এই অবস্থার সংগে সুমিতরা পরিচিত নয়। চুপ করে বসে আছে তারা। কারও মুখে কোন কথা নেই। রাত কত হল বোঝার উপায় নেই। ফিস্‌ফিস করে মা বললেন, তোরা শুয়ে পড় আমি বসে আছি, তোদের ভয় কি?

অগত্যা মাকে অবলম্বন করে তারা শুয়ে পড়ল। মনে তখনও তাদের ভয়, ঘুমের রাজত্বে যেতে ভরসা হচ্ছে না। এবার এল নতুন সমস্যা। ত্রিপলের ঠিক পিছনেই একদল পাতি শেয়াল জড়ো হয়েছে। তারস্বরে শেয়ালগুলির সমবেত ডাক রাতের নির্জনতাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলল। ওরাই তো এ এলাকার রাজা ওদের ছোটাছুটির শব্দ বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। চোখ বুঁজে মায়ের একটা হাত ধরে কোনরকমে পড়ে আছে সকলে, এরপর কখন যে তারা ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না।

ভোর হতেই রাস্তায় লোকজনের আনাগোনা শুরু হ'য়ে গেল। সকলের হাতে ব্যাগ। বাজারে যাচ্ছে। সুমিতদের বাজারে যাবার লোক নেই। তারা দেখল গ্রামের লোকেরা মাথায় করে তরিতরকারি নিয়ে গ্রুপে গ্রুপে ঘুরছে। অনেকেই ওদের কাছে কেনাকাটা করছে।

এই দেখে উৎসাহিত হয়ে তারাও কিছু তরিতরকারি কিনে নিল। তাদের রোজের বাজারের বরাদ্দও ছিল খুব কম, দৈনিক আট আনা মাত্র। এতেই সব কেনাকাটা সারতে হবে। তবে, তখন বাজারদরও ছিল খুব কম। জিনিষপত্র পেতে এত কষ্ট করতে হ'তো না। টাকা পয়সার একটা নিজস্ব মূল্যও ছিল। এমনি করে কয়েকটা দিন কাটলো তাদের।

আজ উদ্বাস্তু শিবিরে সুমিতদের সপ্তম দিন। সেদিনে রাতের ঘটনাটির কথা আজও সুমিতের মনে আছে। ঘটনার সময় রাতের শিবির ছিল প্রত্যহের মত সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, কোন সাড়াশব্দটিও নেই। সকলেই নিজের নিজের ঘর বন্ধ করে পরের দিনের একটু আলো দেখার আশায় যে যার ইষ্টদেবতার আরাধনা করছে। এমনি সময়েই সেই ঘটনাটা ঘটল। দুরু দুরু বক্ষে হঠাৎ তারা শুনতে পেলো শিবিরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একদল যুবক 'বল হরি হরিবোল' বলতে বলতে কোন এক মৃতব্যক্তিকে নিয়ে যেন রাস্তা বরাবর এগিয়ে আসছে। ওদের উচ্চরবের কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে আরও কাছে আসতে লাগল। এবার একেবারে তাদের তাঁবুর কাছেই ওদের শব্দ শোনা গেল।

এখানেই উদ্বাস্তু শিবিরের সীমানাটা শেষ। মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে যুবকরা তাদের তাঁবুরই পাশের রাস্তায় নামিয়ে রেখে সমস্বরে চিৎকার করে হরিবোল দিতে লাগল। সুমিতের তখন আতঙ্কের সীমা নেই। কাঁদতে পারছে না, শুধু শব্দ হবে বলে। নিশ্চল পাথরের মত বিছানায় জড়সড় হয়ে পড়ে রইল তারা।

এবার ঐ যুবকদের ভয়ঙ্কর চিৎকারের শব্দটা ধীরে ধীরে পুকুরের পাড় ধরে ওপারের তেঁতুল গাছটা পর্যন্ত চলে গেল। বুকের কাঁপুনিটা সাময়িক একটু থামল, সুমিতের মনে দেখা দিল ভয় ওতরাবার মত একটুখানি আশার আলো। ওপার থেকে তারপর শব্দটা ভেসে আসতে লাগল। তবুও তো একটু দূরে। সেই সঙ্গে যুবকদের ব্যস্ততার শব্দও কানে এসে বিঁধছে। শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় পড়ে থেকে সব কিছুই শুনছে সে।

কিছু সময় যেতে না যেতেই তাঁবুর ছোট ছোট ফাঁক দিয়ে সুমিত দেখল অদূরের ঐ তেঁতুলগাছের নিচে জ্বলন্ত আগুনের লেলিহান শিখা আর শুনতে পেল ঘন ঘন চিৎকার 'বলহরি হরিবোল'। মনে হচ্ছিল, বোধ হয় তাদের তাঁবুর পাশেই যেন মৃতব্যক্তির চিতা সাজানো হয়েছে।

তিন চার ঘণ্টা ধরে ওদের চিৎকার চেঁচামেচি চলতে লাগল। এক সময় চিতার আলোও ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল। তারপরই হৈ হৈ করে যুবকের দল ঝাঁপ দিয়ে পড়ল পুকুরের জলে। সমস্ত পুকুরটাকে তোলপাড় করে তুলল ওরা। রাতের নিস্তব্ধতায় ওদের ঐ চিৎকার আর দাপাদাপি ভয়াবহ আকার ধারণ করল।

এদিকে শিবিরের কারও মুখে একটি ও কথা নেই। কেউ একবার দরজা খুলে বাইরেও এলো না। শিবিরবাসীদের কাছে এইসব ব্যাপার নতুন নয়। সকলেই যেন এইসবে অভ্যস্থ এবং প্রস্তুত হয়েই অবস্থার মোকাবিলা করে। চিৎকার শুনলে কেউ বের হয় না। সকলেই তো এ জায়গার নতুন, সকলেরই মনে আতঙ্কের সীমা নেই।

মড়াবাহী যুবকরা স্নান করেই আবার 'বল হরি হরিবোল' দিয়ে পুকুরের পাড়ে উঠে দাঁড়াল। দু'এক মিনিট সময়, তারপর চুপচাপ। সুমিতরা এবার একটু নিশ্চিন্ত হতে না হতেই হঠাৎ তাদের তাঁবুটা নড়ে উঠল। বেশ বোঝা যাচ্ছে কে যেন বাইরে থেকে টানা দেয়া তাদের তাঁবুর দড়িগুলি কাটছে। ভাল করে ব্যাপারটা বোঝার আগেই কে বা কারা যেন

তাঁবুটার চারদিকের দড়িগুলি কেটে দিল। চারদিক থেকে তাঁবুটা হঠাৎ এসে চেপে ধরল সুমিতদের। তবুও টু শব্দ করতে পারছে না তারা। তখনও যে দড়ি কাটা যুবকদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায়নি। তাঁবু চাপা পড়েও প্রাণভয়ে তারা তাই একেবারে চুপ। চুপ থাকাতেই বোধ হয় ওরা উত্তেজনার খোরাক না পেয়ে চলে গেল।

ওরা চলে গেছে বুঝতে পারামাত্র সুমিতরা সবাই একযোগে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার করতে শুরু করল। তাদের চিৎকার শুনে গ্রুপের লোকজন ছুটে এল। তারপর সকলের সাহায্যে তাঁবুর নীচ থেকে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল তারা।

এইসব এখানকার অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা। এখানে শাসন বা নিয়মানুবর্তিতা বলে কিছু নেই। দিশেহারা মানুষগুলি অভিভাবকহীন হয়ে মনের খেয়ালে যা খুশী তাই করে চলেছে।

রাত হয়েছে অনেক, তাছাড়া গ্রুপ অফিসটা এত দূরে যে সেই মুহূর্তেই খবর দেয়া সম্ভব হল না। পাড়াপড়শীদের সাহায্যে কোনভাবে আবার তাঁবুটাকে চাঙ্গা করে টানিয়ে রাত কাটাবার জন্য একজন সংগীকে কাছে রেখে সেই রোমাঞ্চকর রাতটা কাটিয়ে দিলেন মা। ভোরের আলো একটু একটু করে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে বিছানায় এসে পড়তেই মা উঠে পড়লেন। তখন সবে পাশের বাড়ীর লোকজন দুয়োর গোড়ায় গোবর ছড়া দিচ্ছে। মা ছুটলেন তাদের দিকে এবং যাকে পেলেন তাকেই বলতে লাগলেন: ও দিদি, এখন আমার উপায়? এমন করে ওদের নিয়ে আমার রাত কাটান সম্ভব নয়।

সকলেই তাদের পরামর্শ দিল সেই মুহূর্তে অফিস সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে খবর দেবার জন্য।

একটু বেলা হতেই মা ছেলেদের সবাইকে নিয়ে সুপারবাবুর কাছে গিয়ে হাজির হলেন এবং নিতান্তই অনাথজনের মত মাননীয় মহাশয়ের কাছে নিবেদন করলেন নিজের অসহায় আর্জি।

আর্জি শুনে নিস্পৃহকণ্ঠে সুপারবাবু বললেন, আপনাদের জন্য রাজপ্রাসাদ তৈরী করব, না কি রাত্রে আমি পাহারা দেব?

সংগে সংগে চেয়ারটা একপাক ঘুরিয়ে অফিসের অন্যান্য সহকারিদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কি বল, আমার কোয়ার্টারটা ওদের ছেড়ে দিলে কেমন হয়?

খানিকক্ষণ চাপা হাসির বিনিময় চলল সহকারীদের মধ্যে।

যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে তারপরও দাঁড়িয়ে আছে তারা। তাদের কাতর আবেদন নিষ্ঠুর সরকারী কর্মচারীদের হৃদয়ে এতটুকু দয়া জাগ্রত করতে পারল না।

বিফল মনোরথ হয়ে নিদারুণ মনোকষ্টে মা নীরবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সুমিতদের নিয়ে তার নির্দিষ্ট তাঁবুতেই ফিরে এলেন। এবার সন্ধান করতে সুরু করলেন কেউ একজন অত্যন্ত নিজের লোককে। শুধু একটু অবলম্বন হিসেবে যাকে তিনি তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিজের লোক বলে দাবী করতে পারেন।

সুমিতদের অন্য একজন জ্যাঠাইমা পূর্ব পাকিস্তান থেকে সরাসরি মেদিনীপুর জেলায় দুতকুণ্ডী উদ্বাস্তুশিবিরে সে ছিলেন, পরবর্তী সময় খবর পাওয়া গেল ঐ জ্যাঠাইমার পরিবারবর্গ ধুবুলিয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছেন। সুমিতদের মা ওদের সন্ধান করতে সুরু করলেন।

ইতিমধ্যে প্রায় একমাস গত হল। সুমিতরা তখনো তাঁবুতেই আছে। হঠাৎ তারা সেই জ্যাঠাইমার খবর পেয়ে গেল। উনিও তাদের একই গ্রুপে আছেন। একদিন খোঁজখবর করে মা সবাইকে নিয়ে ওর বাড়ি গেলেন। গিয়ে দেখেন দো-চালা ঘর। চারিদিকের দেওয়ালে পাঁচ ইঞ্চি ইটের গাঁথনি। এমনভাবেই ঘরটির নির্মাণ কাজটা শেষ করা হয়েছে যে সমস্ত দেওয়ালটারই সিমেণ্ট-বালি খুলে খসে পড়ছে, ইটগুলি যেন দাঁত বের করে হাসছে। মাঝে মাঝে দেয়ালের মধ্যে এপার ওপার ছিদ্র হ'য়ে রয়েছে। দরজা জানালার পাল্লাগুলি প্রায়ই আলগা। নিশিকুটুম্বদের ইচ্ছেমত প্রবেশের জন্য বেশী পরিশ্রমের কোন প্রয়োজনই নেই। স্রেফ একটা লাথি, তাহলে সমস্ত দেয়ালটাই হুড়মুড় করে গায়ে পড়ে আরু রক্ষার দায়িত্ব থেকে রেহাই নিতে পারবে।

জ্যাঠাইমা মায়ের মুখে তাদের সমস্ত কথা শুনে পাড়ার ছেলেদের বলে সবাইকে তুলে আনলেন নিজের কাছে। তাঁবু টাঙ্গিয়ে নিকট আত্মীয়ের কাছে ভরসা করে নতুন ঘর বাঁধল তারা।

সরকারি সাহায্য নিয়ে এবার সুমিত বিদ্যার্জনের জন্য দারস্থ হল স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে। কলকাতার খিদিরপুর এ্যাকাদেমি স্কুল থেকে সে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট পায়নি ওখানকার মাইনে ক্লিয়ার ছিল না বলে। মা তবু অনেকবার ছুটলেন ধুবুলিয়া দেশবন্ধু

হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাননীয় শ্রীঅন্নদাচরণ ভৌমিক মহাশয়ের কাছে কিন্তু না, কিছুতেই তিনি সার্টিফিকেট না পেলে ভর্তি করবেন না বলে জানালেন। বহু অনুনয় বিনয় করার পর স্থির হল সুমিতকে এ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে তবে ভর্তি হতে হবে। পরীক্ষা দিল সুমিত। ফল অনুযায়ী ভর্তি হতে পারল পঞ্চম শ্রেণীতে।

তখন স্কুল হত একটা পরিত্যক্ত মিলিটারীদের ভাঙা বাড়ির মধ্যে। কোন আচ্ছাদন নেই সেই স্কুলের। দরজা-জানালা বলতে কিছুই নেই। একই সংগে প্রাইমারী সেক্সন। অথচ নাম হিসেবে হাইস্কুল। প্রাইমারী সেক্সনের নাম ছিল বাপুজী বিদ্যাপীঠ।

ঝড় বা বৃষ্টি হলেই সুমিতদের ছুটি হয়ে যেতো। খুব মজা করে ছুটি উপভোগ করত ছাত্ররা। অভিভাবকদেরও বলার কিছু ছিল না। জীবনে কোনো যে ক্ষতি হচ্ছে বা হতে পারে, তার কথা একবারও মনে ঠাঁই দিত না সুমিত।

স্কুল থেকেই ছাত্রদের বই দেওয়া হ'ত। এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা এতোই ঢিলেঢালা ছিল যে কে মানুষ হ'ল আর কে হ'ল না তাই নিয়ে কারও কিছু এসে যেতো না।

মা কিন্তু নিয়ম করে প্রতি সকাল সন্ধ্যায় তাদের নিয়ে পড়াতে বসতেন। নিজে কিছু বুঝুন আর না-ই বুঝুন সুমিতের মুখে অন্ততঃ শব্দ হোক—এটাই ছিল মায়ের লক্ষ্য।

শিবিরে ইতিমধ্যে নতুন নতুন ঘর তৈরী হল। সেগুলো থেকে অবশেষে তাদের জন্য একটি ঘর বরাদ্দ হল। নতুন ঘর পেয়ে সাত নম্বর গ্রুপ ছেড়ে এবার তারা চলে গেল তিন নম্বর গ্রুপে। সেখানে দুই সারি করে দো-চালা ঘর হয়েছে। ওরই মধ্যে একটা ঘর পেলো তারা। তাদের সাহায্য নেবার জায়গাটাও পাল্টে গেল। আবার নতুন রেশন কার্ড হ'লো তাদের। নতুন ব্যবস্থায় আবার তাদের নতুন জীবন শুরু হল।

তাদের ঘরের পাশেই পীচের ছোট রাস্তা। রাস্তার কাছে একটা সরকারী টিউবওয়েল। একটু এগিয়েই সরকারের তৈরী পায়খানা। পায়খানা বলতে পাশাপাশি একসঙ্গে দশটা খোপ। এর মধ্যে পাঁচটা পুরুষদের জন্য, পাঁচটা মহিলাদের জন্য।

অথচ এত সুখ উদ্বাস্তুদের সইবে কেন? কিছুদিনের মধ্যেই ঐ

খোপগুলির দরজা একটিও রইল না। কারা যে খুলে নিয়ে গেছে, তা পাহারাদার পুলিশরাও জানে না। পাহারা দিতে ওদের পোষাক-আঁটা জবরদস্ত চেহারাগুলি দেখা যায় বটে, কিন্তু সরকারী সম্পত্তির চুরি-চামারির ব্যাপারে কেউ ওদের থেকে বাধা পায় না। অসহায় চোখ মেলে তাই দেখতে হয় যে উদ্বাস্তু মানুষগুলি নিজ নিজ গামছা বা কাপড়ের পর্দা লাগিয়ে পায়খানাগুলি ব্যবহার করছে।

সুমিতের বালক-মন তখন ঐ সব সামান্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইতো না। সে ছুটে বেড়াতো পাশের মুক্ত বায়ুর মেলায়। মুক্ত আকাশের নিচে সবুজের মেলা। মাঠে মাঠে কখনো ছোলার, কখনো ধানের, কখনো বা অরহড় ডালের ক্ষেতে তার মন ছুটে যেতো। ক্ষেতের গাছপালার মধ্যে যেখানে খুশী নিজেকে লুকিয়ে রাখতো যতক্ষণ মন চায়।

শীতের দিনে শুকনো গাছের ডালপালা সংগ্রহ করে জ্বালিয়ে দিত আগুন। তারপরই ছুটে যেতো ক্ষেতের দিকে। ক্ষেতভর্তি ছোলার গাছগুলিতে তখনও শিশিরবিন্দু চিক চিক করছে। ছোলাসহ গাছগুলি তুলে নিয়ে ছুটে এসেই ফেলে দিত আগুনের মধ্যে। মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে যেত সবুজ সুন্দর গাছগুলি। ধীরে ধীরে আগুনের শিখা ম্লান হয়ে যেতেই তারা সকলে মিলে একটা একটা করে ছোলার দানা বের করে ছাড়িয়ে নিয়ে খেতো। এই সব আনন্দ ছিল তাদের সারা বৎসর ধরে। সকাল-সন্ধ্যায় সুমিতের বন্ধুর অভাব হ'ত না। শিবিরবাসী তার সকল বন্ধুরাই তো ছন্নছাড়া।

আখ-কাটার মরশুমে সকলে মিলে এক একদিন হাজির হ'ত আখের ক্ষেতে। আখের গাছের শুকনো পাতাগুলি মাড়িয়ে মাড়িয়ে সদলে চলে যেতো একদম মাঝ-মাঠে। ঘাপটি মেরে সবাই বসে থাকতো এমনভাবে যেন কেউ বাইরে থেকে তাদের চিহ্নমাত্রটি দেখতে না পায়। কিছুক্ষণ পরই একটা একটা আখ ভেংগে নিয়ে শুরু করে দিতো তাদের মস্ত ভোজ। এতেই তো তাদের আনন্দ।

আর্থিক অনটনের মধ্যে চললেও তার কৈশোরের দিনগুলি এমনি আনন্দের উন্মাদনায় ভরপুর ছিল।

তার ছোট ভাই দু'জনও একে একে স্কুলে ভর্তি হ'ল তারপর। সেও একপা একপা করে ক্লাসের গণ্ডি পেরিয়ে এগোতে লাগল। এখন তার কাজের মধ্যে—সকাল হলে একবার পড়তে বসা, মা বললে বাজার যাওয়া,

কোনমতে বাজার থেকে ফিরে স্কুলে যাবার ফাঁকে একবার বন্ধুদের সঙ্গে খেলার সাথী হয়ে খানিকটা সময় ছোটাছুটি করে নেওয়া। কখনও খেলতো গুলি, কখনও বা ডাং-গুলি। অর্থ ব্যয় করে উল্লেখযোগ্য খেলাধুলা করার ক্ষমতা তাদের ছিল না, তাই গাছের পরিত্যক্ত ডালপালাই হ'ত তাদের খেলার হাতিয়ার।

কখনো-সখনো হ'লেও একবার বাজারে যেতে হবে শুনলেই কত-যে খুশী হ'ত সে। মাথাপিছু পনেরো দিনের সরকারি বরাদ্দ ছিল চার টাকা নয় আনা। তা থেকে বাজারের বরাদ্দ হতো খুব বেশী হলে আট আনা। এতেই আনতে হবে তরকারি, মাছ ইত্যাদি সব। আবার হিসেব থেকে অন্ততঃ দু'পয়সা সরিয়ে রেখে নিজের খেলবার গুলিও কিনতে হবে। এই জন্যে কত হিসাব, কত যে চেষ্টা করতে হত তা অল্প কথায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলা যায়, দু'পয়সা মুনাফা লোটার জন্য দেড় মাইল দূরের বাজারে যেতেও তার আপত্তি ছিল না। বেশীর ভাগ দিন অবশ্য মা-ই বাজারে যেতেন। কারণ সুমিত সব জিনিষ বুঝে কিনতে পারতো না এবং পনেরো দিন চলার হিসাবটাও ঠিকভাবে করতে পারতো না।

যত দারিদ্রতাই থাক, এখানে সেজন্যে কেউ লজ্জিত নয় বা কারো মাথা-ব্যথাও নেই। স্কুলের ছাত্ররা সকলেই জেলখানার আসামীদের মত ডোরাকাটা জামা পরত, সঙ্গে একটা নেভি-ব্লু রংয়ের প্যান্ট। পায়ে কারও চটির প্রয়োজনই হ'ত না। এই সমাজে খালি-পা হলে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। বরং কেউ এর ব্যতিক্রম করলে সকলেই কটুক্তি করত।

এই পরিবেশে থাকতে থাকতে তাদের খাওয়া-দাওয়া, বেশভূষা, আচার-আচরণ এমন আশ্চর্যভাবে পাল্টে গেল যে কলকাতার সুখস্বাচ্ছন্দ অল্পদিনেই ভুলে গেল সুমিতরা। কলকাতার গাড়ী, ঘোড়া, কোলাহল—সমস্তটাই স্মৃতির অনুভব থেকে হারিয়ে গেল। পরিবর্তে এখানকার নিস্তব্ধতা এবং অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাই তাদের একান্ত প্রিয়সঙ্গী হ'য়ে উঠল।

উদ্বাস্তু-বাঙ্গালীরা যতই দুর্বল বা দারিদ্র্যভারাক্রান্ত হোক না কেন, বারো মাসে তেরো পার্বনের উৎসবগুলি কিন্তু তাদের বন্ধ হয় না। ধুবুলিয়ার উদ্বাস্তু শিবিরেও দুর্গাপূজার দিনগুলিতে ঢাকের আওয়াজ বেজে উঠত।

দুর্গাপূজার দিনগুলিতে সুমিতরাও নতুন সাজে সাজবে বলে মেতে

উঠত। এই শিবিরে আসার পর প্রথম দুই বৎসর তাদের সেই কলকাতার আশ্রয়দাতা জ্যাঠামহাশয় শ্রীশচীন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় পূজাতে নতুন জামা ও প্যাণ্ট পাঠিয়েছেন। তারা মহা আনন্দে জ্যাঠামশায়ের পাঠানো দান নিয়ে উৎসব মুখরিত দিনগুলি কাটিয়েছে। পরে হয়তো আর্থিক অনটনে তিনিও আর এই সাহায্যটুকু করতে পারলেন না। এখন আর পূজায় নতুন জামা-প্যাণ্ট আসে না। তবু মায়ের মন মানত না। সরকারি বেঢপ জামাগুলিকেই স্থানীয় দর্জি দিয়ে সাইজমত করে দিতেন। এই সরকারি নতুন জামা-প্যাণ্ট সাইজমত পেয়েই খুশী থাকতো তারা, অভিমান হলেও মনকে সামলানোর প্রশ্নই আসত না, বরং দু'ফোঁটা চোখের জলে বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করে একগাল ভাত মুখে দিয়ে চলে যেতো মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করতে। সঙ্গীসাথীদের আলাপ-আলোচনায় বেশ পরিস্কার বুঝতো যে সকলেরই এক অবস্থা। যে দু' বৎসর তারা বাইরে থেকে পেয়েছে, সেটাই তাদের ভাগ্যের পাওনা।

ঐ সব নির্মম পরিবেষ্টনীর মধ্যেও এখানকার উদ্বাস্তুরা তাদের জাতীয় ঐতিহ্যবাহী পূজা-পার্বনে কষ্ট করেও নিজের অর্থের অনুদান দিয়ে সাহায্য করত এবং আনন্দের দিনগুলিতে সংঘবদ্ধ হ'য়ে আগামী দিনের সাফল্যের কামনায় নানা দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাতো।

ইতিমধ্যে স্নমিতরা আরও বড় হ'য়ে উঠল। তাদের খরচ-খরচা বাড়তে লাগল। তবুও সরকারি বরাদ্দ কিন্তু সেই চার টাকা নয় আনা। বাজারদরও হু হু করে বাড়ছে। এখানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত ভাতাও দেয়না বা বছর বছর ইনক্রিমেণ্টও হয় না। ফলে, মানুষগুলির জীবনযুদ্ধ আরও কঠিন হয়ে উঠল।

লেখাপড়া চালানোর জন্য স্নমিতদের স্কুলের খরচ বাড়তে লাগল। যদিও তাদের বই কিনতে হয় না, কিন্তু খাতা, পেন্সিল, পেন, কালি ইত্যাদি আনুসাঙ্গিক জিনিষগুলি কেনার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হ'ত। এরজন্য কোন সরকারি অর্থবরাদ্দ ছিল না।

তারা তিন ভাই এখন স্কুলে যায় পড়াশোনা করতে। প্রচুর কাগজ, কালি, খাতা ও পেন্সিলের দরকার। সুতরাং আরও অনটন তাদের গ্রাস করল। দুর্ভাগ্যের নির্মম নির্দেশ—হয় না-খেয়ে পড়াশোনা চালাও, নতুবা পড়াশোনা বাদ দিয়ে শুধু মাঠে-ময়দানে ঘুরে বেড়াও।

সত্যিই সেই সময় অনেক ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে

গেল। ওদের তারপর কাজই হ'ল শুধু খাওয়া আর মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানো। কোন বাধাও ছিল না। এর পরিণতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হ'ল মারাত্মক।

সহজ কথায় ওরা যেন কোন কাজ না করে বা ওদের যেন কোনো কাজ না থাকে এই অবস্থার চাপে ওরা অতি সহজেই যেন অসামাজিক কাজে মন দিয়ে দেয়। চক্রান্তকারীদের ঐ গোপন উদ্দেশ্যটা অবশেষে সফল হ'ল। এইরূপ দুর্ভাগ্যজনক আবর্তের মধ্যে পড়ে একটা বিরাট সংখ্যক যুবকের দল অচিরেই ধাবিত হল নানারকম অপ্রীতিকর ঘটনার পিছনে। অনায়াসেই ওদের সুযোগও এসে গেল। নিজেদের গোপন স্বার্থেই ওদের পিছনে জুটে গেল এ দেশের অসাধু চতুর ব্যবসায়ীগোষ্ঠী। ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু শিবির থেকে পূব দিকে মাত্র সাত মাইল দূরে পূর্ব-পাকিস্তানের বর্ডার। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ফলাও চোরাই চালানের ব্যবসা শুরু হয়ে গেল। আগন্তুক ব্যবসায়ীর দল আড়ালে থেকে অনেক বেকার যুবকদের কাজে লাগাল। স্থানীয় যুবকরা নিদারুণ দারিদ্র্যের চাপে উপায়ান্তর না দেখে খুব সহজেই এই সুযোগ গ্রহণযোগ্য মনে করে ঐসব বেআইনী কারবারে লিপ্ত হয়ে পড়ল।

পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসতে থাকল সুপারি, এলাচ, দারচিনি। বিনিময়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যেতে লাগল গরু, মহিষ ইত্যাদি। ফলে এক শ্রেণীর যুবকদের হাতে অভাবিত কালো টাকার আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। ধুবুলিয়ার এই অঞ্চলে তখন কোন সিনেমা হল ছিল না। তাই ঐ পথে অর্থাদি ব্যয়ের সহজ পথ না থাকায় প্রতিটি গ্রুপের এই সব যুবকদের উপার্জিত অর্থেই গড়ে উঠল আঞ্চলিক বহু ক্লাব আর ক্লাব। এলাকাগত ভাবে কোন রকম খেলাধূলোর সুযোগ না থাকায় অধিকাংশ যুবকরাই এই সব ক্লাবের ছত্রছায়ায় যৌবনের উন্মাদনাকে উপশম করতে সংঘবদ্ধ হতে লাগল।

নানা দলে সংঘবদ্ধ করাটাও ছিল সেই ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কৌশল। ওদের মধ্যে যারা চোরা কারবারে নিযুক্ত তাদেরকে স্থানীয় যুবকদের মধ্যে অর্থশালী করে তোলার মানসিকতাও বৃদ্ধি পেল। অদৃশ্য প্রতিযোগিতা সুরু হ'য়ে গেল—কে কত বেশী ব্লাক করতে পারে এবং কে কত বেশী যুবককে এই চোরা-চালানের কাজে লিপ্ত করতে পারে। ফলে, আরও বিপুল সংখ্যায় অনাথ ছেলের দল অভাবিত অর্থাগমের গোপন পথের

হাতছানিতে ধরা দিতে লাগল। ওদের কে দেবে আশা? কে দেবে ভরসা? সরকারি কর্মচারীরা, যাদের ওপর এই অঞ্চলের ভার ন্যস্ত ছিল, তারাও ওই অপকর্মের অংশীদার। তারাও তাই নির্বাক দর্শক। রাতের অন্ধকারে তারা শুধু গোপন ভাগবাটোয়ারায় ব্যস্ত থাকত।

যদিও সুমিতের জন্ম ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাবার আগে, তথাপি স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক প্রাক-মুহূর্তে তার বয়সটা এতো কম ছিল যে, স্বাধীনতাকামী মানুষগুলির মরণপণ যুদ্ধ বা প্রচেষ্টার কিছুই সে বুঝতে পারে নি। বোঝার যোগ্যতাও তার ছিল না, কিন্তু উদ্বাস্তু শিবিরের এক গ্রুপের ছেলেদের সংগে অন্য গ্রুপের ছেলেদের যে প্রত্যক্ষ লড়াই নিজের চোখে দেখেছে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এই সব কিছুর পিছনেই ছিল অসৎ ব্যবসায়ীদের সংগে স্থানীয় সুযোগসন্ধানীদের মিলিত চক্রান্ত। এক কথায় বলা যায়, এলাকা দখলের লড়াই, অর্থাৎ একজন ব্যবসায়ীর সংগে আর একজন ব্যবসায়ীর চোরাই কারবার দখলের লড়াই

একদিন সকাল দশটায় হঠাৎ দেখা গেল বাজারের দিক থেকে চার পাঁচ শ' যুবক লাঠি, বল্লম, ছোরা, সাবল ইত্যাদি নিয়ে চিৎকার করতে করতে সুমিতদের গ্রুপের দিকে ধেয়ে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে উদ্বাস্তু শিবিরের নিরীহ মানুষরা নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ করে ইষ্টদেবতার নাম জপ করতে শুরু করল। সুমিত তখন প্রাকযৌবনের দ্বারে উপনীত। সুতরাং সে দু'দলের লড়াইটা লক্ষ্য করার জন্য উৎসুকভরে বাড়ির কাছেই ছোট এক গাছের আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগল। লড়াইটাও যেন গেরিলা যুদ্ধের মত মুহূর্তেই জমে উঠল।

এ পাড়ার ক্লাব ঘরটাকে ঘিরে চিৎকার শুরু হয়ে গেল। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আগন্তুক যুবকদের চিৎকারে উদ্বাস্তু শিবিরে নেমে এল থমথমে নিস্তব্ধতা। রাস্তার লোকজন ছুটতে ছুটতে যে যার নিজের নিজের বাড়িতে আশ্রয় নিল।

আগন্তুক যোদ্ধারা চিৎকার শুরু করল: কোথায় অমল? কোথায় বিমল? কোথায় নিবারণ? বেরিয়ে আয় শালা—তোদের মুণ্ডু চাই।

অমল বিমলরা তখন দিনের আলোকে ফাঁকি দিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। ওদের পাত্তা কেউই করতে পারল না।

নিমিষের মধ্যে শুরু হল দখলের লড়াই। ধপ্ ধপ্ করে সাবলের

আঘাত পড়তে লাগল ক্লাবঘরের দেওয়ালের ওপর। মিনিট কয়েক সময় পেরোতে না পেরোতেই স্থানীয় গ্রুপের যুবকদের ক্লাবের বকলমে গড়ে ওঠা চোরা-কারবারের অফিস-ঘরটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বিজয় গর্বে উল্লসিত প্রতিপক্ষের যোদ্ধারা বিজয়পতাকাস্বরূপ ক্লাবের টিনগুলি কাঁধে করে নিয়ে চলে গেল।

বাংলাদেশের বিভাগজনিত হিন্দু-মুসলমানের দাংগার কথা শুনেই শিহরণ হয়, কিন্তু ঐরূপে দাংগা ছিল এই শিবিরের নিত্য সংগী। এ পাড়ার গ্রুপের লাঞ্ছিত, অপমানিত হিরোর দলও পরাজয়ের ঐ অপমান মাথা পেতে নিতে নারাজ ; কিছু একটা না করলে তো সুযোগসন্ধানী মানুষগুলোর ফলাও ব্যবসা বন্ধ হ'য়ে যাবে। সেই সংগে নষ্ট হবে দুই দেশের বর্ডার-অঞ্চলের ব্যবসায়ে ওদের অধিকার। নিঃশব্দে দিনটুকু পার করে রাত্রেই 'বাপুজী বিদ্যাপীঠে'র ঘরে বসল মিটিং। সিদ্ধান্ত হল, নীরবে ওদের ছেড়ে দেওয়াটা এ এলাকার অপমান। ওরা এই ক্লাবের খেলাধুলার অগ্রগতিকে সহ্য করতে পারছে না বলেই মারামারি করতে এসেছিল—এইসব বলে নিজেদের গ্রুপের নিরীহ লোকগুলির সমর্থন পেতেও চেষ্টা করল। অথচ উস্কানীর আড়ালে প্রস্তুতি নেওয়া হল পাল্টা আক্রমণের।

পরদিন সন্ধ্যায় শিবিরের সব ঘরে টিম টিম করে আলো জ্বলছে। পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা যার যার ঘরে বই নিয়ে পড়তে বসেছে। রাস্তাঘাট তখন নির্জন, চারিদিক শান্ত। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল ভয়ঙ্কর চিৎকার। ঐ চিৎকার শুনে সকলেই হতচকিত হয়ে পড়ল।

আবছা অন্ধকারে পাকা রাস্তায় শুধু একদল হাপপ্যাণ্ট পরা যুবকদের ইতঃস্তত ছোটাছুটি ছাড়া কিছুই বোঝা গেল না। একটু পরে শুনতে পাওয়া গেল, ও-পাড়ার কেউ এসে এইমাত্র শংকরের হাত কেটে নিয়ে গেল, দিবাকরের পেটটাও নাকি চিরে দোফালা করে দিয়েছে।

রাত যত গভীর হতে লাগল শিবিরে তত বেশী আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে লাগল। একবারের জন্যও জোরে কেউ নিশ্বাস ছাড়তে পারছে না। জেগে আছে বুঝতে পারলে হয়তো ওরা দরজা ভেংগে বর্গীর মত ঘরে ঢুকে পড়তে পারে। অথচ চোখ বুঁজে শান্তিতে নিদ্রামগ্ন হবার সাহসও কারো নেই। থেকে থেকে জানলার ফাঁক দিয়ে মশালের আলো এসে ঘরের মধ্যে পড়ছে। যুবকদের পদশব্দ এবং মুখের

ফিসফিসানি মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। সব মিলে যেন একটা যুদ্ধের রণক্ষেত্র।

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের ঐ গুণ্ডাশ্রেণীর যুবকদের কোনো হদিস পাওয়া গেল না। শিবিরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আবার শুরু হয়ে গেল। এখন কে বলবে যে এই শিবিরে গতরাত্রে দুই পক্ষের দখলদারদের মধ্যে হিংস্র লড়াই হ'য়েছে?

তবু শিবিরবাসীদের মুখে কোন কথা নেই। সকলেই মুখ বুজে নিজ নিজ কাজে বেরিয়ে পড়ল। শিবিরে বাস করেও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বলতে শুধু এইটুকুই ভরসা রইল—যদি বাঁচতে চাও তবে তুমি নিজে এর থেকে কতটুকু দূরে থাকতে পার তার চেষ্টা কর।

যদি কোন পাপ বা প্রলোভনের টানে কারও নাম ঐ দলে একবার তালিকাভুক্ত হোত, তবে তার মাথাটা এত সস্তা দরে বিকিয়ে যেত যে, সে নিজেও বিন্দুমাত্র বুঝতে পারতো না অপদেবতার অদৃশ্য হাত কোন কুক্ষণে তাকে ধরে গ্রাস করতে আসছে। তাই প্রায় প্রতিদিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে চোখ ডলতে ডলতে ঘর থেকে বেরিয়েই সুমিতরা শুনতে পেতো ঃ ঐ রাস্তায় একটা লাস পড়ে রয়েছে, ওর মুখটা দেখে কেউ ওকে চিনতেই পারছে না। রাস্তায় চাপ চাপ রক্ত। ভয়ে কেউ ওর আশেপাশে যাচ্ছে না।

শিবিরবাসীদের জীবনে এইসব ঘটনা প্রতিদিনকার রুটিনমাফিক হ'য়ে দাঁড়াল। একে মা মনসা তাতে আবার ধুনোর গন্ধ। নতুন সুযোগ করে দিলেন সরকার বাহাদুর। উদ্বাস্তুদের জন্য সাহায্য হিসেবে এল মিল্ক-পাউডার। মাথা পিছু এক পাউন্ড। সুমিতরা প্রতি পনেরো দিন অন্তর চার পাউন্ড করে ঐ মিল্ক-পাউডার পেত। নিশ্চয়ই এই দুধ গুলে প্রতিদিন কারও পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয়, উপরন্তু সকলেরই তো অভাব রয়েছে। প্রলোভনের আহ্বান যেন মৃদু মৃদু কণ্ঠে অভাবীদের কর্ণকুহরে আঘাত করতে লাগল। নবোদ্যমে টাকার লোভে মেতে উঠল উচ্ছৃংখল যুবকের দল। ওদের অর্থলালসায় মদত দিতে সুরু হয়ে গেল কতিপয় ভুঁড়িওয়ালা পুঁজিপতিদের ব্যবসা।

সকাল, বিকাল শুধু একটাই শব্দ—দুধ বিক্রি আছে, দুধ। প্রথম প্রথম এক-আধটা ছেলে ঝোলা কাঁধে করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু কালক্রমে ঐ সরকারি গুঁড়া দুধের একটা ফলাও ব্যবসা গজিয়ে উঠল।

দুধটা অফিস থেকে পেয়ে উদ্বাস্তুরা কৌটোর প্যাকেটটা পর্যন্ত খুলত না। সোজা ঝুনঝুনওয়ালার বস্তায় ঢেলে দিয়ে কিছু অর্থ নিয়েই খুশী মুখে বাড়ি ফিরত। কিছু কিছু লোক এই সুযোগে চোখে পড়ার মতো ধনবান হয়ে উঠল। কিন্তু একটা বড় সংখ্যক পথভ্রষ্ট যুবকের দল লোভের ফাঁদে পা দিয়ে নেমে গেল দুর্নীতির পথে। চুলোয় গেল তাদের পড়াশোনা শিখে সৎ-জীবনে উত্তরণের আগ্রহ। হঠাৎ বড়লোক হবার দুর্নিবার আকাঙ্খায় বহু মায়ের কোল শূন্য হয়ে গেল।

এমন প্রতিকূল অবস্থায় দাঁড়িয়ে অনেক ছেলেরা খারাপ হয়েছে এটাও যেমন সত্য, তেমনি বহু ছেলে সমস্ত চক্রান্ত থেকে নিজেকে দূরে রেখে সরকারি সামান্য সাহায্য নিয়ে নিজেকে তৈরিও করে নিয়েছে,—এরও উদাহরণ প্রচুর রয়েছে।

এমনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থেকেও সুমিত ধীরে ধীরে এক একটি ধাপ পেরিয়ে সপ্তম শ্রেণীর দরজায় পৌঁছে গেল। এবার স্কুলের উচ্চ শ্রেণীগুলির গণ্ডি পেরোতে হবে, চাই স্কুলের ছাড়পত্র। শুরু হল পড়ার নতুন পর্ব। বয়োধর্মের তাগিদে এখন আর বিছানায় বা চাটাইতে বসে পড়ায় মন লাগে না। টেবিল-চেয়ার দরকার, কিন্তু কোথায় পাবে চেয়ার ও টেবিল বানাবার বা কেনার পয়সা। তবু সুমিত তার মাকে চাপ দিতে লাগল।

বাবার একটা ক্যাম্প খাট ছিল। খাটের কাপড়টা ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে ঘরের একপাশে এতকাল পড়েছিল। ঘরোয়া পরামর্শক্রমে স্থির হল, এই খাটের কাঠ দিয়ে ছোট টেবিল ও চেয়ার তৈরি করা হবে। খাটের সেই সামান্য কাঠে ছোট ছোট চেয়ার-টেবিল তৈরি হ'ল বটে, কিন্তু ছোট্ট টেবিলে বইএর রাশি রেখে কোন একটা বই খুলে পড়ার জায়গা থাকত না। তবুও সুমিতের মনে ঐ অকিঞ্চিতকর পরিবর্তনে কিঞ্চিত আনন্দের সঞ্চার হ'ল।

ইতিমধ্যে সংকট আরও ব্যাপক আকার ধারণ করল। সরকার থেকে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ গেল বন্ধ হ'য়ে। সপ্তম শ্রেণীর একগাদা বইএর দামও একগাদা টাকা। কে দেবে অত টাকা? কিভাবে বই জোগাড় করবে ভেবেই পাচ্ছিল না সুমিত।

ছুটলেন মা পুরোনো বইগুলো নিয়ে সকাল সাতটার কলকাতাগামী ট্রেন ধরতে। তাঁর লক্ষ্যপথ কলেজ স্ট্রীট, যদি পুরোনো বইগুলো পাল্টে

অন্ততঃ কয়েকখানা প্রয়োজনীয় নতুন বই আনা যায়। সারাদিন অভুক্ত রইলেন, বিকেল পাঁচটার ট্রেনে ফিরেও এলেন। হাতে তাঁর মাত্র চার-পাঁচখানা বই। পাহাড় প্রমাণ বই তখনও বাকি। এবার কি তাহলে তাদের পড়াশোনার এখানেই ইতি হবে?

সুমিতদের ভবিষ্যত ভাবনার সুরাহা করতে মা আরও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। জীবনে যে পথ তাকে কোনদিন চিনতে হয়নি চেনার প্রয়োজনও ছিল না, সেই দুর্গম পথই হল তার সাথী।

প্রতি শেষ রাত্রে উঠে মা সকলের জন্য ডালভাত রান্না করতে শুরু করলেন। রান্না সেরে সুমিতকে অন্য দু'ভাইএর দায়িত্ব দিয়ে বলতেন, ওদের দেখবি আর বিকেল পাঁচটার ট্রেনের সময় ষ্টেশনে যাবি। দেখিস ভাইরা যেন মারামারি না করে, কোথাও চলে না যায়।

ডালভাত নিজেরাই নিয়ে খেতো। কোনো থালা মাজার দরকার নেই। এঁটো থালাগুলি শুধু জমা করে রাখতো। কখন স্নান করবে বা কখন খাওয়াদাওয়া সারবে তার কিছু ঠিক থাকতো না। সারাদিন ধরে মাঠে মাঠে ভাইদের নিয়ে ছুটোছুটি করত। খেলায় মত্ত হয়ে কোন কোন দিন হয়তো বা মনেই রাখতে পারত না তার মাকে নিয়ে আসতে হবে ষ্টেশনে গিয়ে।

খেলতে খেলতে তার চোখে পরত দূরে মাঠের প্রান্তে একটা বিশাল ট্রেন মন্থর গতিতে মুড়াগাছা থেকে সরল রেখার মত ধুবুলিয়া ষ্টেশনের দিকে এগোচ্ছে। তাই দেখে হয়তো মনে পরত মায়ের ফিরে আসার কথা। এর আধ ঘণ্টা পরেই আসবে পাঁচটার ট্রেন। সমস্ত শরীর তখন ধুলোয় মাখামাখি। ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হবার বালাই নেই। মেজভাই অমিতের ওপর ছোট ভাই অজিতের দায়িত্বটা এক কথায় বুঝিয়ে দিয়ে মাঠ চিরে ছুট দিতো ষ্টেশনের দিকে। খেলার মাঠটুকু পার হয়েই বিশাল পাট ক্ষেতের মাঝ দিয়ে একদমে এসে পৌঁছুত কাঁটালবাগানের মোড়ে। এরপর কিছুটা সিমেণ্টের রাস্তা পেরিয়ে সুইপার পট্টির পাশ দিয়ে আবার মাঠ। সেই মাঠটা পেরিয়ে এসে হাজির হতো ষ্টেশনে।

দু-একবার রেল লাইনে উঠে ডাউন দেওয়া হয়েছে কিনা দেখবার চেষ্টা করত। 'ডাউন'-টা না পড়লে ট্রেনের আসতে বিলম্ব হবে ভেবে চিন্তার অন্ত থাকত না। এই সময়ে সুমিতের মনে হত তারা কত একা—কত অসহায়। তাদের মা সারাদিন বাড়ি নেই, সারাদিন তিনি অভুক্ত,

কতই না কষ্ট হচ্ছে তার। তাদের তো এই এক দুঃখী মা ছাড়া আর কেউই আপনজন বলে কাছে নেই। সামনের পড়ে থাকা রেল লাইনটার ওপর কান পেতে রাখতো। যদি কোন শব্দ দূর থেকে ভেসে আসে।

সুমিতের মনে এখনো জেগে আছে সেই দিনটির কথা। স্টেশন ঘরের গায়ে ঝুলে থাকা ঘণ্টাটা বেজে উঠল। কালো জামা পরা লোকটা স্টেশনমাস্টারের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ডাউনটা টেনে ফেলতেই তার মনে আশার সঞ্চার হল। উৎকণ্ঠার সংগে চেয়ে রইল লাইনের দিকে। হঠাৎ দূরে দিগন্তের আকাশপথে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে অনুমান করল, এবার আসছে। কিছুক্ষণ পর ইঞ্জিনের মুখটা ছোট বলের মত হয়ে দেখা দিল। তার তখন খুশীর অন্ত নেই। নিজেই মনে মনে ছক করে নিল গাড়ীটা কোথায় এসে দাঁড়াবে এবং মা কোথায় নামতে পারবেন। ট্রেন এসে স্টেশনে থামা মাত্র অবোধ শিশুর মত সেই অগণিত জনতার ভীড়ের মধ্যেই চিৎকার শুরু করে দিল-মা, মা, ওমা বলে।

ঐ সময়ের পটভূমিকায় জনতার মধ্যে থেকে মা, মা, বলে চিৎকার করাটা আজকে ভাবতে বসে সুমিতের মনে সংকোচের সৃষ্টি করলেও তখন তার একটুও লজ্জা করেনি বা সভ্যজগতের কাছে অমন ডাকাডাকিটা অশোভন বলেও মনে হয়নি। বেশ মনে পড়ছে—কখনো কখনো মাকে দেখতে না পেলে স্টেশনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যেতো। হঠাৎ হয়তো দেখতে পেতো মা ট্রেন থেকে নেমে সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মায়ের সর্বাঙ্গে কয়লার কালো কালো ছাপ লেগে রয়েছে। মায়ের সমস্ত কাপড়ের সাদা রং কয়লার কালেস রংয়ে চাপা পড়ে গেছে। মায়ের মুখে ক্লান্তির ছাপ। দেহে অনিদ্রা, অনাহারের যন্ত্রণা। তবুও দু'বস্তা কয়লার গুড়ি ট্রেন থেকে নামিয়ে ততক্ষণে মা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছেন সুমিতের জন্য।

দেখা হতেই মার প্রথম কথা হত তারা সকলে ভালভাবে দিন কাটিয়েছে কিনা। যথাযথ উত্তর দিয়েও সুমিত অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতো মার দিকে। এক বস্তা কয়লার গুঁড়ো তুলে দিতেন সুমিতের মাথায়, নিজেও আর একটা বস্তা কোমরে তুলে নিয়ে বাড়ির পথে চলতে শুরু করতেন মা।

স্টেশন থেকে বাড়ির পথটা নেহাত কম ছিল না। প্রায় দেড় মাইল। একবারে সমস্ত পথ এক বস্তা গুঁড়ো মাথায় নিয়ে যাওয়ার মতো ক্ষমতা

সুমিতের ছিল না। মা ও তার পথ চলায় অনেক দূরত্বেরও সৃষ্টি হত। মাঝে মাঝে মাথা থেকে বস্তাটা ধপ করে ফেলে মাঠেই বসে পড়তো। মাও একটু বিশ্রাম করে নিতেন। এইভাবে বহু কষ্টে বাড়ি পৌঁছুত। অনেক দিন এমনও হয়েছে মাথা থেকে বস্তা ফেলতেই ফেটে গুড়িগুলো ছিটকে ছড়িয়ে পড়েছে। যেদিন এমনি হয়েছে সেদিন সুমিতের আরও দুর্ভোগ বেড়েছে। বাড়ি গিয়ে নতুন বস্তা নিয়ে ফিরে এসে ছিটানো গুড়িগুলো সেই বস্তায় ভরে তবে আবার বাড়ি ফিরতে পেরেছে।

কতদিন এমন হ'য়েছে যে, সেও স্টেশনে এসেছে ট্রেনও যথাসময়ে পৌঁছেচে। কিন্তু সেই ট্রেনে মা হয়তো এলেন না। ও জানতো লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করলে মার কোনো সঠিক হদিস্ মিলবে না। তবু মন মানতো না। তার উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসার উত্তরে বহু মুখে বহু কথা শুনতো। কেউ বলতেন, আজ নৈহাটিতে চেকিং ছিল, কাকিনাড়া থেকে কোন গুঁড়িয়ালাকেই গাড়িতে উঠতে দেয়নি। কেউবা বলতেন, জি-আর-পি আজ অনেক গুঁড়িয়ালা মহিলাকে ধরে নিয়েছে।

ব্যস ঐসব কথা শুনিয়েই যে যার পথে কেটে পড়তেন। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে স্টেশনের সমস্ত চত্তরটাই ফাঁকা হয়ে যেত। ধীরে ধীরে তারপর রাতের অন্ধকার সমস্ত এলাকাটাকে গ্রাস করত। রাতের প্রহরীরা সদলে ঘোষণা করত তাদের উপস্থিতি কিবা শীত, কিবা গ্রীষ্মে একটা পাতলা জামা পরে কোনদিন হয়তো বা খালিগায়ে স্টেশনের এক কোনে ঠায় একলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুমিত অপেক্ষা করতো পরের ট্রেনটার জন্য।

নির্দিষ্ট ট্রেনে মা না ফেরায় একবার দারুণ একটা ব্যাপার ঘটেছিল। মাকে না দেখে সেদিনও সুমিত আপন মনে ভাবছে, তবে কি মার কোনো বিপদ আপদ ঘটল? অন্য যেসব মহিলারা গুঁড়ি নিয়ে আসেন তাদের জিজ্ঞাসা করল, আমার মাকে দেখেছেন? মা এলেন না কেন বলতে পারেন?

ভীড়ের মধ্য থেকে কে যেন একজন বললেন, একজন গুঁড়িওয়ালী ট্রেনে চাপা পড়ে মারা গেছে।

এই সংবাদ শোনার পর সুমিতের তখন কি মানসিক অবস্থা! কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। কিন্তু কে শোনে কার কান্না! পরের ট্রেনটা আসবে সেই রাত আটটায়। ওদিকে বাড়িতে ছোট দু'ভাই ছাড়া আর কেউ ধারে কাছে নেই। ভাবল বাড়ি গিয়ে ওদের একবার দেখে আসে। কিন্তু

ওরা মার কথা যদি জিজ্ঞাসা করে কি বলবে ওদের? না, তাই আর বাড়িমুখো হ'ল না। গভীর অন্ধকারে ঢাকা স্টেশনের টিমটিমে বাতিটার কাছাকাছি সেই ছোট অশ্বত্থ গাছের নীচে বসে বসে সময় গুনতে লাগল।

ঘড়ির কাঁটাও যেন চলতে চাইছে না। আরও তিন ঘণ্টা এইভাবে তাকে একা একা বসে থাকতে হবে। সে যেন বহু যুগ! এক একবার পায়চারি করতে করতে এগিয়ে গিয়ে স্টেশনমাষ্টারের ঘরের বড় ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে, আবার বিরক্ত হয়ে ফিরে এসে একই জায়গায় বসে পড়ছে।

পরের ট্রেন আসার ঘণ্টাটা কখন বাজবে, কখন মাকে দেখতে পাবে! ভগবানকে স্মরণ করে মনে মনে বলছে, হে ভগবান, আমার মাকে তাড়াতাড়ি পোঁছে দাও।

চিন্তা-ভাবনার ফাঁকে হঠাৎ একসময় ঘণ্টা বেজে উঠল, ডাউন-ও পড়তে দেখল। দূরের ক্রমবর্দ্ধমান তীব্র আলোর বিন্দু ঘোষণা করল, ট্রেন আসছে। আলোটা ধীরে ধীরে বিন্দু থেকে বড়, বড় থেকে বিশাল আকার নিয়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে এল। পরক্ষণেই সমস্ত স্টেশনটা আলোয় ঝলমল করে উঠল। রাতের নীরবতাকে বিতাড়িত করে মুহূর্তের মধ্যে জনকোলাহলে স্টেশনটা পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল। স্টেশনের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত শুধু চিৎকার: 'ও বিমল, ও বিকাশ, ও ভবেশ' ইত্যাদি। সকলেই তাদের নিজের লোককে কাছে পাবার জন্য চিৎকার করে চলেছে। ট্রেনটা থাকতে থাকতেই যদি নিজের লোককে খুঁজে বের করতে না পারে তবে স্টেশনের ম্লান আলোতে পরে আর কিছুই দেখা যাবে না।

এতটা সময় অপেক্ষা করার জ্বালা সুমিতও তখন ভুলে গেছে। প্রতিপক্ষদের সমস্বর চিৎকার – ও মাসীমা, ও দিদিমা, ও পিসীমা ইত্যাদির ঊর্দ্ধে সেও তখন ছুটতে ছুটতে ব্যাকুল স্বরে ডেকে ডেকে বলছে—ওমা, মাগো, কোথায় তুমি?

মার ফিরে আসার এই শেষ ট্রেন! মাকে তো তার খুঁজে বের করতেই হবে। ট্রেনটা তখনও প্লাটফর্মের পাশে সরল রেখার মত দাঁড়িয়ে সমস্ত অন্ধকারকে দূরে ঠেলে সরিয়ে রেখেছে।

মাকে পেলো না, প্লাটফর্মের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বৃথাই ছোটাছুটি করল। কোথাও সে কালো কালো বস্তা বা কালো বস্তাবৃত তার মায়ের ক্লান্তমুখের চিহ্নটুকু ও দেখতে পেলো না।

পিছন ফিরতেই লক্ষ্য করল ট্রেনের গার্ড সাহেবের সবুজ লাইটটা সকলের মাথার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। গার্ডের নির্দেশিত বাঁশিটিও বেজে উঠল। আজ্ঞাবহ ইঞ্জিনটি ধোঁয়া ছেড়ে একটা সিটি দিয়ে তাকে ছেড়ে এক পা দু-পা করে এগোতে লাগল। না, মাকে তখনও দেখতে পেলো না। তার চোখে তখন জল টস্ টস্ করছে, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে গেছে, হতাশার আবেগে পা-দুখানি বিবশ হয়ে যাচ্ছে বুঝি। তবু ক্ষীণ আশা—অপেক্ষা করছে যদি কিনা প্লাটফর্মের উল্টো দিকে মাকে হঠাৎ পেয়ে যায়!

ট্রেনটা স্টেশনের চত্তর পেরিয়ে যেতেই সুমিত হন্যে হয়ে প্লাটফর্ম থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল রেল লাইনের উপর। রেল লাইনের সাজানো কাঠগুলির ওপর পা ফেলে ফেলে মনের সমস্ত জোরটুকু সম্বল করে আর একবার ছুটতে শুরু করল। অন্ধকারে পরিষ্কার লক্ষ্য করা যাচ্ছিল না, তাই মাঝে মাঝে চিৎকার করতে হচ্ছিল।

এইভাবে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখতে পেলো একটা পাথরের ওপর বসে মাথাটা পাশের বস্তার উপর রেখে শরীরটা এলিয়ে দিয়েছেন মা। সমস্ত দিন তার স্নান-খাওয়া হয়নি। আগের ট্রেনটায় উঠতে না পেরে মায়ের এই দুর্ভোগ।

তবুও সুমিতের উপস্থিতি মুহূর্তের মধ্যে মাকে সতেজ করে তুলল। তাকে দেখামাত্র মাথাটা সোজা করে তুলেই বললেন, নে বাবা, কোনটা তুই নিবি?

বলতে বলতে এরই ফাঁকে ভাইদের কথা, কখন থেকে সে স্টেশনে আছে, পাঁচটার ট্রেনটায় মাকে না পেয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিল কিনা ইত্যাদি প্রশ্নগুলো করতে লাগলেন।

কিছুতেই নিজেকে আর সমেলাতে পারল না সুমিত। একটা বস্তায় হাত দিয়ে মায়ের কোমরে তুলে দিতে দিতে অস্থির আবেগে বলল, তোমাকে আর গুঁড়ি আনতে যেতে হবে না। আমরা ডালভাত খাবো, দরকার হয় শুধু ভাত খাবো, আমাদের ঘরের সঙ্গে লাগোয়া জমিটুকুতে দু'চারটে গাছ লাগিয়ে বাজারের খরচটা বাঁচাবো, তবুও তুমি আর যাবে না। ফের যদি যাও তো আমি আর স্টেশনে আসবো না।

সুমিতের কণ্ঠস্বরটা রুদ্ধ হয়ে গেল, আর কিছু বলতে পারলো না।

এরপর অন্ধকারের পথে মায়ের পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। মাঠের

মধ্যে পায়ে চলা সরু একফালি পথ। পথের দু'পাশে পাটের সুবিস্তৃত গভীর ক্ষেত। মানুষের থেকেও পাটের গাছগুলি লম্বা। পথটাও একটানা সোজা নয়। কেবলি বাঁক ঘুরে ঘুরে অনির্দিষ্ট অজ্ঞাত রহস্যের মত এগিয়েছে। ফলে অন্ধকার এবং ঘন গাছগুলির জন্য সামনের পথযাত্রীদের দেখা যাচ্ছিল না। সমস্ত পথটাই ছিল এমনি দুর্গম। ঐ পথে আবার আঞ্চলিক বাহিনীর উপদ্রবে পথচলা যাত্রীদের মনে উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না।

ঐ পথে চলতে চলতে একদিন এক রোমাঞ্চকর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিল সুমিত। সেদিন যেতে যেতে পথে এক সময় হঠাৎ শুনতে পেলো একজন মহিলার করুণ আর্তনাদ। অস্পষ্ট আলোয় দূর থেকে দেখল কে বা কারা যেন তাদের অগ্রবর্তী একজন পথচলতি মহিলাকে জোর করে টানতে টানতে পাশের গভীর পাটক্ষেতের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। রোমাঞ্চকর দৃশ্যটি দেখে একটু থমকালো বটে কিন্তু থামতে পারল না, প্রতিরোধে কেউ এগিয়েও গেল না। সুমিত তো তখন এক নাবালক মাত্র। ভয়ার্ত চমকে তার অসহায় চোখে শুধু দেখল অবলাদের এই বাসস্থানে সব না-বলার দল নিজেদের সামলাতেই কেমন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যেতে যেতেই শুনল খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেই মহিলাটির করুণ কণ্ঠস্বর যেন ম্লান হ'য়ে গেল। তারপর কখন সে মুক্ত হল, কিভাবে হল বা আদৌ মুক্ত হয়েছিল কিনা তার খোঁজ কেউ জানে না।

মহিলাটিকে কেন পাটক্ষেতের মধ্যে টেনে নেওয়া হয়েছিল, কেন মহিলাটির আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল আবার কেনই বা ওর কণ্ঠস্বর পরক্ষণেই ঘুমন্ত মানুষের মত নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল সে সবের কোনো কারণ সেদিন বুঝতে পারেনি সুমিত। কিছু বয়স বাড়লেই বুঝেছে এমনই সব অনেক বিগত আর্তনাদের সংগে মিশে সে রাত্রির সেই মহিলাটির ঐ আর্তনাদও এই মুক্ত পৃথিবীতে শুধুমাত্র হাহাকার হয়ে হারিয়ে গেছে।

আবার কোনোদিন দেখেছে ঐরূপ কোনো মতলব বা অসুবিধা না করে এই দুর্বৃত্তের দল সামান্য কিছু পয়সার জন্য কোনো কোনো পথযাত্রীকে জোর করে ধরে তার পয়সাকড়ি ছিনিয়ে নিচ্ছে। এই সব অবস্থার মধ্যে দিয়ে তাদের প্রায় প্রতিদিনই খুব সন্তর্পণে এগোতে হ'ত বাড়ির দিকে।

বাড়ি পৌঁছেই দেখত আর এক নাটকীয় দৃশ্য। তারা উপস্থিত

হওয়া মাত্র ছোটভাই কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরেছে, সেই সঙ্গে মেজভাইও। ওদের মধ্যে একজন সখেদে বলছে, আমি সারাদিন খাইনি। অন্যজন বলছে, আমার পেট ভরেনি। এই দৃশ্যের মধ্যে সুমিত তখন আর নীরব দর্শক নয়, সেও একজন চরিত্র।

তাদের সকলকে সামলে নিয়ে বস্তা দুটো গুছিয়ে রেখে মা তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে নিতেন। তারা সবাই অধীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করতো রাত্রে মায়ের সঙ্গে একত্রে খাবে বলে। ওদিকে কোনরকমে চালেডালে মিশিয়ে সঙ্গে কিছু শাকপাতা দিয়ে একেবারে বারোমিশেলি খিচুড়ি চাপিয়ে দিতেন মা। খুব অল্প সময়েই তার রান্না শেষ হয়ে যেত। রান্না শেষ হতে না হতেই তারাও থালা নিয়ে তৈরী। চারিদিক থেকে ঘিরে থাকতো মাকে! ঘন ঘন হাতা ডুবিয়ে মা দেখতেন হাড়ির ফুটন্ত চালডাল সিদ্ধ হয়েছে কিনা। সিদ্ধ হওয়ামাত্র গরম হাড়িটা উনুন থেকে নামিয়েই এক হাতা করে তুলে দিতেন তাদের থালায়। হাত-পাখা বা ফুঁ দিয়ে হাওয়া করে কোন প্রকারে জুড়িয়েই তারা শুরু করত তাদের মস্ত ভোজ। তাদের ঐ হ্যাংলাপনায় মনে হত শুধুমাত্র তারাই যেন সারাদিন না খেয়ে আছে। মা এতে মোটেই বিরক্ত হতেন না। তাদের মধ্যেই বসে একটা থালায় হাড়ি থেকে শেষটুকু নিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে নিজের খাওয়া সেরে নিতেন।

এরপর সুমিতের জীবনে নেমে এসেছিল অন্য একটি চমকপ্রদ দিক। সে দিকটির কথাও আজ সুমিতের মাঝে মাঝে মনে পড়ে। গতানুগতিক ভাবে শুরু হল আবার তাদের পরের দিনের কাজ। ভোর হলেই সুমিতের স্কুল, সুমিতের অন্য ভাইদের স্কুল এবং মায়ের গৃহকর্ম। এই সময়ে সব চেয়ে জোর দেওয়া হ'ত সুমিতের পড়াশোনার ওপর। সে তখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছে। অর্থাৎ এই সময় থেকেই তো তাকে স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে হবে।

এই বছর তাদের গ্রুপের একটি ছেলে স্কুলফাইনাল পরীক্ষায় ন্যাশনাল স্কলারশিপ পেল। ছেলেটির নাম দীননাথ ভট্টাচার্য। সবাই ওকে 'দীনাদা' বলে ডাকত। গ্রুপের সকল লোক একবাক্যে দীনাদার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল। উদ্বাস্তু শিবিরের স্কুলশিক্ষক থেকে শুরু করে কর্তৃপক্ষ সকলেই ওকে অভিনন্দন জানালেন।

দীনাদার বাড়িটা সুমিতদের বাড়ি থেকে একটা বাড়ির পর। সুমিতও

সকলের সঙ্গে দীনাদাকে দেখতে গেল। সেইদিন দীনাদার মুখ অন্য দিনের চেয়ে উজ্জ্বল লাগছিল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি সকলের আশীর্বাদ কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন। গুরুজনদের পদধূলি নিচ্ছিলেন, কখনওবা সতীর্থদের আলিঙ্গন দিচ্ছিলেন। আর সমাগত ছোটদেরও স্নেহভরে আদর করছিলেন দীনাদা। বড়োদের কেউ কেউ দীনাদাকে ভবিষ্যতের জন্য সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিচ্ছিলেন। সবটা মিলিয়ে মনে রাখার মতো বিশেষ আনন্দময় পরিবেশ। সুমিত গভীর আগ্রহে এই পরিবেশের সব কিছু লক্ষ্য করছিল। এই দিনের এবং এই পরিবেশের দীনাদা সুমিতের কাছে একটা প্রেরণা হয়ে উঠল।

ঐ প্রেরণায় তারপর থেকে সুমিতও গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়াশোনায় মন দিল। খেলার মাঠ থেকে তার মন ফিরে এলো ঘরে। পড়ার মাঝে একটু অবসর পেলেই সাংসারিক কাজ করে মাকে যৎসামান্য সাহায্য করত সে। পড়াশোনা করতে করতে যতই গভীরে প্রবেশ করল ততই নানারকম সমস্যা দেখা দিতে লাগল। কখনো অঙ্ক মিলছে না, কখনো গ্রামার বুঝতে পারছে না, কখনো বা ট্রানস্লেসনটা হচ্ছে না। স্কুলে গিয়ে সুমিত শিক্ষকদের বিরক্ত করতে শুরু করল। যতটা সম্ভব ওঁদের দিয়ে পড়াশোনার ব্যাপারগুলো বুঝে নেবার চেষ্টা করত। কিন্তু শিক্ষকরাও একজন ছাত্রের সমস্যাকে প্রতিদিন সমানভাবে গুরুত্ব দেতে চাইতেন না। অথচ তাদের গৃহশিক্ষক রাখার মত ক্ষমতাও নেই। তবুও সুমিত কোনো শিক্ষকের কোচিং পাবার জন্য মাঝে মাঝে মাকে চাপ দিতে লাগল। এ ব্যাপারে মায়ের যে কোন উপায়ই নেই তা বুঝেও বুঝতে চাইল না।

এমনি অসহায় অবস্থার মধ্যেই হঠাৎ একদিন সে গিয়ে হাজির হ'ল দীনাদার কাছে। সে সময় দীনাদা খুব ব্যস্ত ছিলেন তার পড়াশোনা, কলেজ, স্থানীয় ক্লাব এবং ব্যায়াম সমিতি ইত্যাদি নিয়ে। যদিও ঐ সব কিছুর দায়িত্বই তাকে নিতে হয়েছিল। দীনাদাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল তার পক্ষে সুমিতকে একটু সাহায্য করা সম্ভব কিনা। তার পরম সৌভাগ্য যে দীনাদা মুখ ফেরালেন না। বরং এক কথায় রাজী হলেন তাকে পড়াশোনায় সাহায্য করতে।

পরদিন থেকে কোনো অসুবিধা হলেই বইখাতা বগলে নিয়ে হাজির হ'ত দীনাদার দপ্তরে। স্বহস্তে চাটাই বিছিয়ে তাকে নিয়ে বসতেন উনি। একান্ত আগ্রহের সঙ্গে তাকে বুঝিয়ে দিতেন তার পড়াটা। সুমিতও প্রায়

প্রতিদিন যখন তখন গিয়ে উপস্থিত হ'ত দীনদার কাছে। শুধু, উনি নন, ও বাড়ির সকলেই তাকে আন্তরিকতার সংগে সহযোগিতা করতেন।

কোনো দিন হয়তো ও-বাড়ি গিয়ে শুনল যে দীনাদা নেই, কোথাও বেরিয়েছেন। সেকথা শুনে ফিরে আসার কথা বলতেই বাড়ির লোকরা চাটাইটা পেতে দিয়ে বলতেন, না না চলে যেওনা, ব'স, ও এক্ষুনি এসে পড়বে।

সত্যিই, কিছু সময় অপেক্ষা করতেই দীনাদার সংগে দেখা হয়ে যেতো সুমিতের। কখনও বা অনেকক্ষণ বসেই থাকতো দীনাদার ফেরার অপেক্ষায় তা সে যতই দেরী হোক না কেন। দীনাদা সুমিতের এই ধৈর্য্য দেখে অভিভূত হয়ে ফেরামাত্র তাকে পড়াতে বসে যেতেন। এইভাবে কিছুদিনের মধ্যেই দীনাদার বাড়িতে সুমিতের যাতায়াত আরো অবাধ হয়ে উঠল। কোন কোন দিন দেখতো দীনাদার বোন ভারতীও এসে তার পাশে বসে মনোযোগ সহকারে দাদার করানো অঙ্কের দিকে নজর করছে। হয়তো বা ট্রানস্লেসনের দিকেও। শেষ অবধি এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে সুমিত গেলে ভারতীই চাটাইটা পেতে দিয়ে একটা কোনো খাতা পেন্সিল নিয়ে পাশেই বসে পড়ত। সেও তখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। ওরও একই পড়াগুলি শেখা দরকার। ফলে দীনাদার সহযোগিতা পাওয়াটা সুমিতের কাছে আরও সহজলভ্য হয়ে উঠল।

দিন যত যাচ্ছে তত ওদের পরীক্ষাও এগিয়ে আসছে। ক্রমে ওরা দুজনে রীতিমত দুজনার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠল। সেই কখন দুপুরে গিয়ে পড়তে বসেছে সুমিত, অথচ সন্ধ্যায় ভারতীকে ঘরে আলো জ্বালানো হচ্ছে দেখলেও বই ছেড়ে উঠত না। তবু ফিরতে দেরী হওয়ার জন্য সুমিতের মায়ের উদ্বেগের দিকে লক্ষ্য রাখতো ভারতী।

এইভাবে একসাথে পড়াশোনা করায় ধীরে ধীরে ভারতীর সংগে সুমিতের সম্পর্কটাও নিকটতর হ'য়ে উঠতে লাগল। এক একদিন দাদার অবর্তমানে ভারতী সোজা এসে উপস্থিত হ'ত সুমিতদের বাড়ি, হঠাৎ সুমিতের টেবিলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলত, গতকালের অঙ্কের খাতাটা একবার দিবি, নয়তো তোর গ্রামার বইটা, অথবা তোর নোট বই ?

ওর এই সব জিজ্ঞাসাবাদ ছিল অবশ্য খুবই সামান্য। কিন্তু এই সূত্রে ও সুমিতের আরও কাছের মানুষ হয়ে গেল। সুমিতকে ও প্রায়ই নিজের নানা অভাব অনটনের কথা বলত। যেমন—বাড়ির কত কাজ ওকে

করতে হয় তাই যথেষ্ট পড়ার সময় পায় না। অথচ ছেলেদের কত পড়ার সুবিধে। তাদের তো অন্য কোন কাজের ঝামেলা নেই, তাদের শুধু একটাই চিন্তা—স্কুল আর পড়া। ইত্যাদি সব অভিযোগ নিয়ে ওর ক্ষোভের অন্ত ছিল না।

এমনি বহু প্রসংগের ঘনিষ্ঠ এবং দরদী আলোচনার সুযোগে ভারতীর সংগে সুমিতের কৈশোরের বন্ধুত্ব ক্রমশঃ আরো মধুর হ'য়ে উঠল।

সুমিত গভীর মনোযোগ সহকারে ওর কথা শুনতো। বিজ্ঞ শ্রোতার মত সব শুনে ওর পক্ষেই সায় দিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিত। ওর দাদার সবিশেষ সহানুভূতির কথা মনে করে নিজেই ওদের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতো। ফলে, ওর বক্তব্যের বিরোধিতা করা সুমিতের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, তার মনেও একটু মমতার টান লেগেছিল।

এত ঘনিষ্ঠতা সত্বেও সুমিতের মনে কোনো বয়োধর্মের উন্মত্ততা প্রশ্রয় পায়নি। তবুও ওকে যেন একটু ভাল লাগা, ওর প্রতি সহানুভূতি জেগে ওঠা, এই সব সাধারণ দুর্বলতা মাঝে মাঝেই সুমিতকে আবিষ্ট করে ফেলত। ক্রমশ এমন হল যে সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা বা রাত যখনই সময় পেত ভারতী তার কাছে এসে হাজির হ'ত। সারাদিনে দু'তিন বারও আসত। কেউই কিন্তু পড়াশোনার বাইরে বা নেহাতই সাংসারিক নিজস্ব কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বলত না। মনের আবেগ ছিল যতটা, ততটা প্রকাশভংগি কারও মধ্যেই দানা বাঁধেনি। তবু দিনে দিনে মনের মধ্যে কি যেন এক আলোড়ন সৃষ্টি করতে লাগল। উভয়েই হয়তো দারুণভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েছিলো উভয়ের প্রতি।

অনেক দিন এমন হ'য়েছে যে সুমিত শুয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ, তবু তার ঘুম আসছে না। হঠাৎ সুমিতের মনে হ'য়েছে ভারতী যেন ওর সেই ফোঁটা ফোঁটা ছোট ফুলের ছাপ দেয়া সবুজ জামাটা পরে তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে: সদ্যস্নাত এক যুবতীর মতো মাথার একরাশ চুলগুলি পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে যেন রোদ লাগাতে লাগাতে তার কাছে চলে এসেছে। পরিষ্কার অনুভব করছিল সুমিত, ভারতী যেন নিতান্ত বালিকা হ'য়েও কিশোরীর লাজুক সংযম ভেংগে সেই মুহূর্তে যৌবনের উপভোগ্য মিলন আকাঙ্খায় একান্তই উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

কখনো কখনো ভারতীর মধ্যে কতনা খেয়ালী মনের পরিচয় পেয়েছে সুমিত। মোট কথা ওর সংগ তার বড় ভালো লাগত। কিন্তু কোন

সময়েই ওরা বহুক্ষণ নির্জন ঘনিষ্ঠতার সুযোগ তেমন পায়নি বলেই যা রক্ষা। নয়তো নির্জনতার অবাধ প্রশ্রয় পেলে অমন মানসিকতার অবস্থায় হয়তো অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারতো।

একদিন সুমিতের মা বারোয়ারী কলের পাশে একটা বালতি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন বেলা প্রায় বারোটা হবে। সুমিত তার সমবয়সীদের সংগে পাশের মাঠে ছুটোছুটি করছিল। সেদিন কোন একটা ছুটির দিন, স্কুল নেই, অতএব ভাবনা কিসের! ওদিকে মা চিৎকার করছেন, স্নান করার জন্য ডাকাডাকি করছেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে! 'এই আসছি' বলে সুমিত আর একবার দম নিয়ে হা-ডু-ডুর কোটে ঢুকে পড়ল। মা চুপিসাড়ে এক-পা এক-পা করে খেলার মাঠ পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। সুযোগ পাওয়া মাত্র খপ্ করে ধরে ফেললেন সুমিতকে এবং টানতে টানতে তাকে নিয়ে গেলেন কলের কাছে। হাত ছাড়াবার জন্য সুমিতও ছটফট্ করছিল। বেগতিক বুঝে মা আবার হঠাৎ তার প্যাণ্টের সাইডটা ধরে ফেললেন। সুমিত এবার জব্দ। ধস্তাধ্বস্তিতে প্যাণ্টের বোতামগুলি খুলে যেতে পারে ভেবে আর ছুটতে পারলো না। চারিদিকে লোক। লজ্জায় তাহলে মাথা কাটা যাবে। তাই ভেবে মুখে মুখে শুধু গুঁইগাই করতে করতে কলের কাছে এসে পড়ল। তবুও মা ছাড়লেন না পাছে আবার যদি পালিয়ে যায়।

নিরুপায় হয়ে মা সুমিতকে ধরে শুধু দাঁড়িয়েই রইলেন। তার বালতিটায় এক বিন্দু জল নেই। কারণ এটা টিউবওয়েল, কাউকে পাম্প করে বালতিতে জল ভরতে হবে। কিন্তু পাছে ছাড়লেই আবার ছুট্ দেয়, তাই মা সুমিতকে ছেড়ে পাম্প করে তার বালতিতে জল তুলতে পারছিলেন না। এমন সময় ওখানে সদা হাস্যময়ী ভারতীর প্রবেশ হল! ওর হাতেও বালতি। কলে ও তখন জল নিতে এসেছিল। ওদের বাড়ি থেকে কলে আসতে আসতে মাঝের ক্ষেতের বেড়াটা পেরিয়ে এসেই সুমিতকে মায়ের হাতে বন্দী অবস্থায় দেখেই হেসে ফেলল।

ওর হাসিতে সুমিত গেল রেগে। বকতে শুরু করল ওকে: 'এই, তোর হাসার কি হ'য়েছে? আজ ছুটির দিন—খেলবো না তো কি বাসন মাজবো? যা যা, তুই তোর কাজ কর, হাসতে হবে না।'

সুমিতের কথায় ভারতী কর্ণপাতই করল না। অসংকোচে মায়ের জলশূন্য বালতিটায় তাড়াতাড়ি জল ভরে মায়ের কাছে এগিয়ে দিতে দিতে

বলল, এই নিন্ মাসিমা।

এতে সুমিত রাগে গজ্‌রাতে লাগল। মায়ের হাতে বন্দী অবস্থায় আর কিছু করতে না পেরে নিজের জিবটা বার করে ভারতীকে ভেংচি কেটে বলে উঠল—এই নিন্ মাসিমা।

মা যতোই বালতির দিকে এগোবার চেষ্টা করছিলেন সুমিতও ততটা দূরে সরে যেতে চেষ্টা করছিল। মা কিছুতেই সুমিতকে বালতির কাছাকাছি আনতেই পারছিলেন না। ভারতী মায়ের ওই অপারগ অবস্থা দেখে নিজেই তার জলভরা বালতিটা তুলে সমস্ত জল সুমিতের মাথায় ঢেলে দিল।

জল লেগে সারা গায়ের মাটি ঝোলাগুড়ের মত সুমিতের মাথা থেকে সর্বাঙ্গ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। এবার সে নিরুপায়। চোখের মধ্যে কাদাজল ঢোকায় জ্বালা করছিল তার। দু'চোখ বুঁজে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অগত্যা কাটা পাঁঠার মত ছটফট্ করছিল সে এবং ভারতীর প্রতি বিষোদ্‌গার করছিল।

ইতিমধ্যে ভারতী আরো দু-বালতি জল এনে হাজির করল মায়ের কাছে এবং নিজেই মগ দিয়ে সেই জল তুলে তুলে সুমিতের মাথায় ঢালতে লাগল। ভারতীর সেই সহযোগিতার সুযোগে মা আপাদমস্তক ডলে ডলে সুমিতের গায়ের কাদা তুলতে লাগলেন। আর কোনোরকম প্রতিরোধের উপায় না পেয়ে সুমিত স্বহস্তে বালতির জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে ভারতীর সমস্ত শরীরটা ভিজিয়ে দিতে লাগল।

মা বকতে শুরু করলেন : অসভ্য ছেলের কাণ্ডটা দেখলি? তোকে ভিজিয়ে দিল!

চোখ খুলেই সুমিত দেখতে পেল ভারতীর সমস্ত জামাটা ভিজে শরীরের সংগে লেপ্টে গেছে। আবারও জিব ভেংগিয়ে বলল সে : 'হুঁ, তোর তো খুব আনন্দ হয়েছে? যা, আমার নাম করে এক গাল ভাত বেশী খাবি, বুঝলি?

ভারতীকে তবুও নিরস্ত্র করা গেল না। এত হেনস্থা—এত কটূক্তি একটুও গায়ে না মেখে ও বলতে লাগল : 'তোরা তো এই-ই চাস্—ছোটোলোকদের মত মাঠে মাঠে ঘুরবি, কাদামাটি মাখবি, আর আমরা শুধু পরিষ্কার করব। তোর লজ্জা হয় না? এই ছেলেগুলি পড়াশোনা করে না, স্কুলে যায় না, দিনরাত শুধু মাঠে মাঠে ঘোরে আর আড্ডা

মারে। ওদের সঙ্গে মিশবি, চিৎকার চেঁচামেচি করবি, লোকে কি এতে ভাল বলে ? মোটেই নয়।'

বিড় বিড় করে একাই ভারতী ঐসব অনর্গল বলে যেতে লাগল আর মগের পর মগ জল সুমিতের গায়ে-মাথায় ঢালতে লাগল।

মা ভারতীর কথাগুলির প্রসঙ্গ টেনে সুমিতকে বকতে লাগলেন। বললেন, দ্যাখ না, সেই কলকাতার পাঁচপরিজন ছেড়ে চলে এলাম নির্বাসনে। ওদের মুখ চেয়ে কোথায় সান্ত্বনা পাব, তা' না—ওরা শুধু জ্বালাবে, মানুষ হবে না ঃ লোকে আমার মুখে চুনকালি দেবে। ওদের আর কি, বলবে তো আমাকে।

স্নান শেষ হতেই মা গামছাটা সুমিতের হাতে দিয়ে বালতি নিয়ে কলে জল ভরতে চলে গেলেন। ভারতীও সর্বাঙ্গ ভেজা অবস্থায় নিজের বালতিতে বাড়ির জল নেবার জন্য কলের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। একবার শুধু সুমিতকে বলল, আজ আয় না, দাদাকে বলে যদি তোকে মার না খাইয়েছি তো আমার নাম ভারতীই না।

মাথায় জল পড়ায় সুমিতের উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। ন্যায়-অন্যায় বোধটা ইতিমধ্যে ফিরে আসছিল। তাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গায়ের জল মুছতে মুছতে ভারতীর দিকে তাকিয়ে রইল। মনের মধ্যে তার নানান্ প্রশ্ন উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। তবে কি হবে ? দীনাদা শুনলে নিশ্চয়ই মারবেন। হয়তো তার কাছ থেকে পড়া বুঝে নেবার ব্যাপারটাও বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে।

ভারতীকে ডেকে অনুরোধের ভঙ্গিতে বলল সুমিত, এই ভারতী শোন, শোন্ না।

কাছে এলো না ভারতী। আবার ডাকল। এবার বালতিটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে কাছে এগিয়ে এল।

কাছে আসতেই ওকে মিনতি করে বলল, এই, তোর দাদাকে বলিস্ না মাইরি, আর কোনদিন করব না।

তার মিনতি সত্ত্বেও উৎসাহভরে ভারতী বলল, বলবে না আবার, নিশ্চয়ই বলব।

সুমিত ওর হাতটা চট্ করে ধরে ফেলে বলল, না মাইরি বলিস্ না, দীনাদা মারবে। যদি বলিস্ আমি তাহলে আর পড়তে যাবো না।

'হাত ছাড়্'—বলে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ভারতী বলল, ঠিক আছে,

আজ বলবো না, তবে যদি আর কোনদিন কাদামাটিতে খেলতে দেখি তবে দাদাকে বলবো তোকে যেন আর না পড়ায়।

ওর কথা শেষ হওয়া মাত্র সুমিত বলল, নারে, আর কাদামাটি মাখবো না, রোদে খেলবো না, ছুটির দিনগুলোতেও পড়াশোনা করব।

—আর আমার কথা শুনেও চলতে হবে, বুঝলি? গম্ভীর গলায় ভারতী কথাটা শোনালো সুমিতকে।

সুমিত অসতর্ক মুহূর্তেই বলল, হুঁ।

ইতিমধ্যে মায়ের বালতি জলে ভর্তি করা হয়ে গিয়েছিল। বালতি হাতে নিয়ে মা সুমিতকে ডাকলেন। সুমিতও বাধ্য শিশুটির মত তার মাকে অনুসরণ করে বাড়ি পৌঁছুল। প্যান্ট পাল্টে খেতে বসল। খাওয়া শেষ হতেই চলে গেল পড়ার টেবিলে। অন্য দিন দুপুরে একটু গড়িয়ে নিত। আজ আর তা করল না। মনটায় ধিক্কার এল। ভাল হওয়াটা নিজের ব্যাপার। এটা নিজেকেই ঠিক করে নিতে হবে। এই নতুন ভাবনাটা সুমিতকে পেয়ে বসল। মা তখন তার পাশেই মেঝেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন।

বই খুলে তখন সুমিত এ-পাতা ও-পাতা নাড়ছিল। তবুও মনটা তার স্থির হচ্ছিল না। ভারতীর ভর্ৎসনা, মায়ের দুঃখ, অনুশোচনা ও অভিযোগ সব মিলে তাকে সতেজ করে তুলল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, এবার থেকে ভাল হয়ে তাকে পড়াশোনা করতেই হবে।

সেদিনই বিকেল হতেই হাত-পা ধুয়ে বইপত্র বগলে নিয়ে সে হাজির হল দীনুদার কাছে। দীনুদার অনুপস্থিতিতে ভারতীরই এগিয়ে দেওয়া চাটাইতে বসে লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল

কিছুই যেন হয়নি, এমনি মুখের ভাব করে ভারতী নিজের খাতা বই নিয়ে এসে সুমিতের পাশে ধপ্ করে বসেই বলল, কেমন মজা হল, মা বকলো তো। কি, লজ্জা হয়েছে বুঝি?

সুমিত মুখ নীচু করে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, তুই যেন বকিস্ না, আমার খুব খারাপ লাগে। তুই পড়, আমিও পড়ি।

কিন্তু সেদিন ভারতী সুমিতকে অবাক করে দিয়েছিল। ওর দাদার কাছে তার নামে কোনো নালিশ তো করলই না, বরং এমন ব্যবহার করল যে সে আরো মুগ্ধ হয়ে গেল।

বাল্য-প্রণয়ের কোনো ধারণাই তখন গড়ে ওঠেনি সুমিতের মনে, তবে

কি যেন এক অজ্ঞাত টানে হঠাৎ আবার একদিন ভারতীর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল তাকে। সেও আর একটি চমকপ্রদ ঘটনা!

সুমিতদের বাড়ি থেকে পিচের রাস্তাটা ধরে মাইলটাক গেলে দেশবন্ধু হাই স্কুল। ঐ স্কুলেই তখন সে পড়ে। পিচের রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকে ঘুরে তবে তাদের স্কুলের চত্বরে প্রবেশ করা যায়, ডাইনেই পড়ে শীতলা মায়ের মন্দির। মন্দির সবাই বলতো বটে, তবে ওটা ছিল আসলে এক চালা ঘর।

চালাঘরের দরজায় পৌঁছেই শীতলা মায়ের দিকে মুখ করে চোখ বুঁজে করজোড়ে প্রার্থনা জানালো, মা, এবারটা একবার মুখ তুলে দেখিস মা। তুই সব পারিস্, তুই-ই তো সর্বমঙ্গলা।

প্রার্থনা শেষে জোড়া হাত দুটো বারকয়েক নিজের কপালের ওপর সজোরে ঠেকালো। এইভাবে প্রণাম জানিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বাঁদিকের পথ ধরে একটু এগোতেই দেখে তার সামনে ভারতী কোত্থেকে হঠাৎ এসে পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঐখানে ওকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে একটু থতমত খেল। আপনা থেকেই তার মুখটা কেমন যেন মাটির দিকে নিচু হ'য়ে গেল। বইখাতাগুলো বেশ জোরেই বুকে চেপে ধরে রাখতে হচ্ছিল তাকে। মনে হচ্ছিল তার হাতের বাঁধন বুঝি শিথিল হয়ে যাচ্ছে, হয়তো বইগুলি তখনই মাটির ওপর পড়ে যাবে।

ভারতীর কন্ঠস্বর আরও তাকে দুর্বল করে দিল: কিরে, এতোক্ষণে স্কুলে এলি? বলেই ও তার সামনে আর এক পা এগিয়ে এলো।

এইমাত্র ওর স্কুল ছুটি হয়েছে। ফেরার পথে তার সংগে এখানে দেখা হয়ে গেছে।

মুখটা তুলে সুমিত কিছু বলার আগেই ও আবার বলল, এই তো ভীষণ পড়াশোনা করছিস। তোর আর কি, এবার একেবারে মার্ কেল্লা। এই, মা শীতলার কাছে কি বললিরে?

তখন চারিদিক থেকে স্কুলের ছেলেমেয়েরা ওদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে দেখে সুমিত আরো বেশী লজ্জা পেতে লাগল। এর আগে প্রকাশ্য রাস্তার ওপর একটা প্রায় যুবতী মেয়ে তার এত কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়নি, এত ঘনিষ্ঠ হয়ে কোনদিন কথা বলেনি। তার মুখটা বোধ হয় লাল হয়ে গেল, গলার স্বর সরছিল না। শুধু 'এই—এই—' বলে ওকে এড়াতে চেষ্টা করল।

ভারতী কিন্তু নাছোড়বান্দা। সুমিতের পথরোধ করে রেখে বল্‌ল, এই, তোদের স্কুল বসার তো দেরি আছে, সবে তো আমাদের ছুটি হল। বল্‌না, কি বল্‌লি মাকে ?

নিরুপায় হ'য়ে সুমিত বল্‌ল, মাকে বললাম, মা আমায় এবার পাশ করিয়ে দিও। এবার থেকে ভাল করে পড়াশোনা করব।

তুই কি রোজই এমন করে মাকে বলিস ?

হ্যাঁ।

আর কিছু বলিস্‌ না ?

আবার কি বলব ? আমার তো সামনে পরীক্ষা।

ভারতী সুমিতের কথাগুলো শুনে একবার তার মাথাটাকে নাড়া দিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। হাসির বেগে এক ঝাঁক চুলের বিনুনীটা ওর পিঠ থেকে ছল্‌কে উঠে ওরই বুকের ওপর আছড়ে পড়ল।

বিনুনীর সঙ্গে ওর মাথা নাড়ানোর ভঙ্গী দেখে সুমিতের মনের গভীরে কি যেন এক অজানা শিহরণের দোলা লাগল। তবু ওর এই হঠাৎ উচ্ছ্বাসে অপ্রতিভ হয়ে সুমিত বলল, এই, রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাসবি না, যা বাড়ি যা।

ভারতী কোনো কিছু গ্রাহ্য না করে খুব সহজ সরলভাবেই বলল, তোর মায়ের কাছে আমার জন্যও কিছু বলিস্‌। মা যদি তোর কথা শোনে তো আমারও মংগল। আর শোন, আজ রাত্রে পড়তে যাবি, আমরা দু'জনে এক সংগে দাদার কাছে পড়ব, বুঝলি ? আর শোন্‌—

এই পর্য্যন্ত বলেই ভারতী আর কোন কথা না বলে এবার শুধু সুমিতের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে হাসলো। তারপর ও চলে গেল ওদের বাড়ি, সুমিতও তাদের স্কুলের চত্বরের দিকে পা বাড়ালো। বাড়ালো বটে, কিন্তু পা তার চলছিল না। ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছিল কেউ ওদের দেখেছে কিনা। ভারতীর সাথে সে ঐভাবে কথাবার্তা বলছে দেখে থাকলে সবাই কি ভাববে ? ওর হাসিটা সত্যিই যদি কেউ লক্ষ্য করে থাকে তো কি লজ্জার কথা।

এমনি নানান্‌ কথা ভাবতে ভাবতে সুমিত ক্লাসের বেঞ্চে বইক'টা রেখে বসে পড়ল। ক্লাস শুরু হতে তখনো পনেরো মিনিট দেরী ছিল। আজ আর তার দেরী সহ্য হচ্ছিল না। কখন স্কুল ছুটি হবে, দ্রুত বাড়ি ফিরে আবার ভারতীর সংগে একসাথে পড়তে বসবে ভাবছিল।

যথাসময়েই ক্লাস শুরু হয়ে গেল। মাষ্টারমশাই—বিভূতিবাবু এসে হাজির হ'য়ে রোল কল করতে লাগলেন। সুমিত তখন মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছিল ভারতীর সেই মন-কেমন-করা হাসি আর আব্দারের ভংগী, আগ্রহ-ভরা কথাগুলো জীবন্ত হ'য়ে এখনও তার কানে ভাসছিলো ঃ আমার জন্য তোর মায়ে কাছে কিছু বলিস্‌···রাত্রে আমরা একসংগে পড়ব···ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে তার রোলটা পেরিয়ে যেতেই বিভূতিবাবু স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর গলায় বললেন, ইউ বয়—ইউ—ইউ।

সুমিত হঠাৎ লক্ষ্য করল ওঁর হাতটা তার দিকে বাড়িয়েই উনি কথা বলছেন। তবু আনমনা ভাবেই সে বলল, আমায় বলছেন স্যার?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমার রোল নাম্বার কত?

আজ্ঞে স্যার পাঁচ, কেন স্যার?

তুমি বেঞ্চের ওপর দাঁড়াও। ক্লাসে কোনপ্রকার অন্যমনস্কতা আমি টলারেট করতে পারি না, নতুবা বই নিয়ে বাড়ি চলে যাও।

বাড়িতে মনটা পড়ে থাকলেও এই বয়সে ক্লাসকে অবজ্ঞা করে চলে যাবার সাহস সুমিতের ছিল না। মাষ্টারমহাশয়ের নির্দেশমত সুড় সুড় করে বেঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়াল। মনে মনে ভারতীর ওপর ভীষণ রাগও হ'লো তার। কিন্তু আবার ভাবল—ওরই বা কি দোষ। ও তো ক্লাসে এসে বিরক্ত করেনি। সেই বা ওকে চিন্তা করতে গেল কেন? এটা তো তারই দোষ। নিজেকে দণ্ডিত মনে করে শাস্তি ভোগ করতে লাগল।

পরক্ষণেই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'ল তার। নাম-ডাকা শেষ হ'তেই সহৃদয় মাষ্টারমশাই তাকে বসার হুকুম দিলেন। সেও বসে পড়ল।

আজ আর কোন ক্লাসই যেন শেষ হ'তে চাইছিল না। মনের মধ্যে ছটফটিয়ে মরছিল সে। সময়ের এই নিদারুণ দীর্ঘতার মাঝেই একটা একটা করে চারটে পিরিয়ড শেষ হ'য়ে টিফিনের ঘণ্টা বেজে উঠল। টিফিনের এই অল্প সময়টুকুও খেলাধুলা করে কাটানো মানে বাজে খরচ বলে মনে হচ্ছিল তার। কেবলি মনে হতে লাগলো এই সময়টায় একবার বাড়ি গেলে হয়তো এক লহমার জন্যও ভারতীর সঙ্গে দেখা হ'তে পারে। কিন্তু বাড়ি তো অনেক দূর, আর টানা রোদ্দুরে পিচের রাস্তা এতো গরম হ'য়ে উঠেছে যে খালি পায়ে হাঁটাই দুঃসাধ্য। তাছাড়া বাড়ি গিয়ে এই অসময়ে যাওয়ার জন্য কি কৈফিয়ৎ দেবে মাকে? আর, ভারতী যদি এখন দিবানিদ্রায় মগ্ন থাকে?

তবুও মন মানল না, সব কিছু দ্বিধা-সংকোচ তুচ্ছ করে সে ছুটে চলল বাড়ির দিকে। যেতে যেতে ভাবছিল অসময়ে স্কুল থেকে হঠাৎ ফেরার কি অজুহাত দেওয়া যায়! কিছু একটা বলতেই হবে। মনে মনে আঁচ করে রাখছিল মাকে কি বলবে। বাড়ির কাছাকাছি পেঁছেই জোরগলায় ডাক দিল: মা—মা—

হেঁকে বলার আসল উদ্দেশ্য ছিল তার আগমনের খবরটা যেন ভারতীর কানে পৌঁছয়।

অসময়ে তাকে বাড়ি ফিরতে দেখে মা হকচকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কিরে, এই দুপুরে বাড়ি এলি! ছুটি হ'য়ে গেল নাকি?

যতটা সম্ভব গম্ভীর হ'য়ে সুমিত বলল, ভয়ানক পেট কামড়াচ্ছে।

পেট কামড়াচ্ছে তো এত দূরে ছুটে আসা কেন? তোদের স্কুলেই তো পায়খানা আছে।

জানি, কিন্তু ওখানে জল নেই। তার চেয়ে বড় কথা—দারুণ নোংরা।

কথা বলতে বলতে গায়ের জামাটা একটানে খুলেই বালতি হাতে নিয়ে সুমিত চলে গেল কলে। পাম্প করতে করতে অনেকবার লক্ষ্য করতে লাগল ভারতীদের বাড়ির দিকে। না—ও-বাড়ির কোনো সাড়াশব্দ নেই। তবে কি তার আসা বৃথাই হ'লো! ভারতী কি এখনও ঘুমুচ্ছে? কিন্তু এখানে আর তো অপেক্ষা করা যায় না। সময় কাটাবার জন্য বালতি ভর্তি করে জল নিয়ে ঢুকে গেল পায়খানায়। দু-এক মিনিট পরেই ছুটতে ছুটতে আবার ফিরল কলের কাছে। এবার তার প্রত্যাশা বুঝি সার্থক হ'লো। ঐ তো ভারতী! এত হাঁকডাক—এত সাড়া-শব্দের বুঝি সার্থক হ'লো। দূর থেকেই দেখতে পেলো ইতিমধ্যেই কলের কাছে ভারতী চলে এসেছে। ওর নিজের বালতিটা কলের মুখের খাঁজে ঝুলিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে পাম্প করে জল ভরছে। ওকে দেখে সুমিত মনে মনে উল্লসিত হ'লেও কলের কাছ-বরাবর এগিয়ে গেল গম্ভীর মুখে। হাত-পা ধোবার ভান করে পাশে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। সুমিতকে যেন দেখতে পায়নি এমন ভাবে ভারতী নিজের কাজ করতেই লাগল।

অভিভাবকের ঢং-এ সুমিত তখন বলল, তুই দুপুরবেলা ঘুমোসনি? ঘুমোসনি তো পড়তে বসতে পারতিস। এই রোদ্দুরে কলে এলি কেন?

তার জিজ্ঞাসার কোন উত্তর না দিয়েই পাল্টা প্রশ্ন করল ভারতী, তুইবা কেন স্কুল থেকে পালিয়ে এলি? এখন কি স্কুলের ছুটি হ'য়েছে?

নারে, এখন তো টিফিনের সময়। আমি সেই ফাঁকে—

ভারতী অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিতেই সুমিত থেমে গেল।

ভর দুপুর। চারিদিক নির্জন। গাছপালার কোনো পাতাটিও নড়ছে না। কলের কাছে হাঁসগুলি রোদের প্রখর তাপে এক একবার প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করে নালার জলে মুখ দিয়ে চকচক করে জল খাচ্ছে। দূর মাঠে গাছের ছায়ায় বসে থাকা কুকুরগুলি জিহ্বা বের করে হাঁফাচ্ছে। ক্লান্ত কাকগুলি এক একবার নাচতে নাচতে ছুটে এসে কলের পাশের আবদ্ধ জলে সতর্কতার সঙ্গে ঠোঁট ডোবাচ্ছে। পথ-ঘাট জনমানবশূন্য। এই রকম সুযোগই তো সুমিত মনে মনে আশা করেছিল। এমন নির্জনতায় এখন কেবলমাত্র ভারতী আর সুমিত।

ধীরে ধীরে পাম্প করছিল ভারতী, পাছে তাড়াতাড়ি তার বালতিটা জলে ভর্তি হ'য়ে যায়। কলের খাঁজ থেকে অর্ধেক ভর্তি বালতিটা নামিয়ে রেখে বলল, নে, হাত-পা ধুয়ে নে।

কলের চারধার বাঁধানো। সে বাঁধানো গণ্ডীর মধ্যে ঢুকে সুমিত তার হাত-পা ধুতে শুরু করল।

আগের প্রশ্নের জের টেনে ভারতী আবার বললে, কিরে, কেন দুপুরে এলি বললি না তো? টিফিনে তুই তো কোনদিন আসিস না।

সুমিত ভেবে দেখল অসময়ে তার বাড়ি আসার অজুহাত দিতে মায়ের কাছে যা বলেছে তা ভারতীকে বলা যাবে না। স্কুলের সকল পরিবেশ ভারতীর ভালো করেই জানা আছে। বলি বলি করেও সত্যি কথাটা ভারতীকে বলতে পারছিল না। দুপুরের নির্জনতা তার মনে যেমন গভীর রেখাপাত করেছিল তেমন সাহসও জুগিয়ে দিল। অবশেষে সংকোচ কাটিয়ে উঠে বলেই দিল: তোকে দেখতে।

বলেই মাথা নিচু করে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে ভালো করে ধুতে লাগল।

ভারতী পাম্প করা বন্ধ রেখে বলে উঠল: কেন রে, আমি খুব সুন্দরী নাকি যে আমাকে দেখতে এভাবে ছুটে আসতে হবে? অত জ্যাঠামো ভাল নয়।

ওর ঐ ধরণের উক্তি শুনে সুমিত দমে গেল। তার ভয় হল তবে বোধ হয় তার কল্পনার অপমৃত্যু হয়ে গেল।

একটু পরেই ও আবার বলল, সব সময়েই তো আমাকে দেখছিস। এই রোদে না এলে কি হ'তো না—নিজেরই তো কষ্ট হল ?

ভারতীর মুখে ঐ কথা শুনে মুগ্ধ হ'ল সুমিত। মুহূর্তের মধ্যে উৎসাহিত হয়ে ওকে বলল, তুই বা অহেতুক এই দুপুরে কলে এলি কেন ? বাড়ির সকলে দেখতে পেলে বকবে, শিগগির বাড়ি যা।

ভারতীর কণ্ঠে এবার কিন্তু শোনা গেল অভিভাবকের স্বর : তোকে বলতে হবে না সেকথা। আমারটা আমি ভাল বুঝি। নিজের চরকায় তেল দে, বুঝলি ?

এমন কথা আশা করেনি সুমিত। ওর কথা বলার ঢং মোটেই ভাল লাগল না তার। বিরক্ত হল ; ক্ষুব্ধ হ'য়েও দৃঢ়স্বরে বলল, তুই আমার সঙ্গে কথা বলবি না, তোর ঐ শাসন সব সময় ভাল লাগে না। এসেছি তো বেশ করেছি, আমার নিজস্ব ব্যাপারে তোর কিছু বলার নেই।

হঠাৎ নরম সুরে ভারতী বলল, তুই কি বুঝবি, তোর জন্যে আমার কি চিন্তা ? আমার মনটা তোর জন্য কেমন যেন করে, তাই তোর সাড়া পেয়ে এই দুপুরেই জল নেবার ছুঁতো করে ছুটে চলে এসেছি।

এক নিমেষেই সুমিতের সব অভিমান দূর করে দিল ভারতীর শেষের কথাগুলি। মুহূর্তেই কি এক আবেশে ভরিয়ে দিল সুমিতকে। গম্ভীর স্বরে বলল সে, এই শোন্, রাগ করিস না লক্ষ্মীটি ! আমি মাথাটা ঠিক রাখতে পারিনি এতক্ষণ, কেমন যেন ভুল বকছিলাম।

ভারতী একটু হেসে মমতা মাখানো গলায় নিম্নস্বরে বলল, জানিস্, তোকে আমার ভীষণ ভালো লাগে।

কথাটা বলেই ভারতী আর দাঁড়ালো না। বালতিটা হাতে নিয়ে এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

ভারতীর ভীষণ ভালো লাগার আহ্বান ছড়িয়ে গেল সুমিতের সারা দেহে। এক অনাস্বাদিত পুলকে তার মনটা ভরে গেল। দ্রুত এগিয়ে চলমান ভারতীর কাছাকাছি হয়ে ওর কানে কানে বলল সুমিত, - আমারও।

যেতে যেতে ভারতী একটু থমকে দাঁড়িয়ে সুমিতের দিকে চেয়ে আবার হাসল। সেই আকর্ষণীয় হাসিটুকু যেন সুমিতের মনের ফ্রেমে বাঁধা হয়ে

গেল। ভারতীর ক্রমশঃ অপসৃয়মান দেহটার দিকে চেয়ে সুমিত উপভোগ করতে লাগল ওর সসঙ্কোচে ধীরে চলার লাজুক ভঙ্গী।

ভাল লাগার উচ্ছ্বাসে সিঞ্চিত আবেগের ঢেউ এসে লাগল বুঝি সুমিতের কিশোর মনে। এতদিন নিত্যনৈমিত্তিক অভাব, অনটন আর দারিদ্র্যের চূড়ান্ত নিষ্পেষণ সহ্য করতে করতে যে উদাসীনতার প্রলেপ পড়ছিল তার মনে তা যেন এক নিমেষেই ভেসে গেল। সুমিত মুগ্ধ হল, উৎফুল্ল হল, অনুভবে বুঝল তার শরীরে কি এক উন্মনা আনন্দের রিনরিনে স্রোত যেন বইতে শুরু করেছে।

ছোট ছোট পাখীরা সুমিতদের কুল গাছটার নিচে এদিকে ওদিকে লাফিয়ে মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে খাবার খাচ্ছিল। প্রথমে সুমিতের নিঃশব্দ ভীরু আগমন ওরা টের পায়নি। পরে তার চঞ্চল পদশব্দে ওরা একটু ব্যস্ত হয়েই জায়গা পরিবর্তন করে নিল। ভারতীর মুখে ভালবাসার কথা শুনে তার ভীরুতা কেটে গিয়েছিল। ভালবাসা বোধ হয় কিশোর মনকে এমনি উচ্ছল আবেগে চঞ্চল করে তোলে।

বাড়ি ফিরেও কিছুতেই স্থির থাকতে পারছিল না সুমিত। যেদিকে দৃষ্টি দিচ্ছে একটা ছবিই শুধু ফুটে উঠছে তার চোখের সামনে—সে ছবি তার মনের ফ্রেমে বাঁধা সেই হাস্যমুখী ভারতীর। জীবন্ত সে ছবিটা তাকে টানছে—কেবলি টানছে।

বেরিয়ে পড়ল সুমিত। তার ভয় হচ্ছে—টিফিনের সময়টা ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেল বুঝি। তা যাক্। যতটুকু সময় পাওয়া যায় এর মধ্যে ভারতীকে আরো একবার দেখে নিতে হবে। ভারতীর নানা সময়ের শাসন, বারন, রাগ ও অভিমানের টুকরো টুকরো স্মৃতি সুমিতের মনে বার বার ভেসে উঠছিল। কিন্তু সে সবের আড়ালে যে রয়েছে ওরই আন্তরিক ভালবাসা, আগে তো বোঝেনি তা। সেই প্রচ্ছন্ন ভালবাসার টানেই বোধহয় সে চুপি চুপি আবার গিয়ে উপস্থিত হল ওদের বাড়ি।

দূর থেকেই দেখতে পেলো, ভারতী উঠোনের এক ধারে বসে এক মনে ওদের ঘরের বাসনগুলো মাজছে। যদিও বাসনমাজার সময় এখন নয়, তবুও মাজছে। ভারতীর আসল লক্ষ্য ছিল কখন সুমিত স্কুলে ফেরার জন্যে ঘর থেকে পথে বের হবে। পথে বেরোলেই বাসন মাজার সুযোগে তার সঙ্গে আর একবার হয়তো দেখা হয়ে যাবে।

দেখা হল। ইশারায় তাকে কাছে ডাকল ভারতী। দুরু দুরু বক্ষে

নিঃশব্দে ওর পিছনে গিয়ে উপস্থিত হতেই ও নিজের কোমরে জড়ানো আঁচল থেকে দুটো ডাঁসা পেয়ারা বের করে সুমিতের হাতে দিয়ে নিম্নস্বরে বলল, নে, এগুলো খেয়ে নিবি।

বড় সাইজের ঐ পেয়ারা দুটি এরই মধ্যে ভারতী কষ্ট করে সংগ্রহ করে রেখেছে গোপনে সুমিতকে দেবার জন্যে এবং সেজন্যই অসময়ে বাসন মাজতে বসেছে।

পেয়ারা দুটো হাতে পেয়ে সুমিত খুশী হ'ল। কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে গেলেও একটা কর্তব্যবোধ তাকে সেই মুহূর্তের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুললো। ওগুলি থেকে একটি পেয়ারা নিয়ে সে ভারতীকে দিতে গেল। তার তখন দারুণ ইচ্ছে হচ্ছিল যে ভারতী পেয়ারাটি নিয়ে তাকে ধন্য করুক।

ভারতী কিন্তু কিছুতেই পেয়ারাটি নেবে না। মাথা নাড়িয়ে 'না—না—' করতে লাগল।

সুমিত তবু পেয়ারাটি উচ্ছ্বাসভরে ওকে নিতে মিনতি করতেই ও বলল, এগুলি তো আমাদের নিজেদের গাছের পেয়ারা, ইচ্ছেমত খেতে আমার কোন সময়েই অসুবিধা নেই।

নাছোড়বান্দা সুমিত ভারতীর হাতে পেয়ারাটা গুঁজে দেবে বলে একটু এগোতেই ও দ্রুত সরে বসে বলল, এই চুপ, বাবা সবেমাত্র শুয়েছেন। গণ্ডগোলের শব্দ কানে গেলে হয়তো এখুনি জেগে উঠবেন।

একটু থমকে গেল সুমিত। পেয়ারা দেবার ছলে ভারতীর অঙ্গস্পর্শের লোভটুকুও ছেড়ে এখনি তাকে এখান থেকে হয়তো পত্রপাঠ বিদায় নিতে হবে। তার মনটা তাকে শাসিয়ে যেন বলতে চাইছিল ঃ এমন পরাজিত সৈনিক হয়ে এই রণক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলে শুধু কাপুরুষতাই প্রমাণিত হয় না, উপরন্তু প্রিয় ভালবাসাটুকু 'এভার লস্ট' হতে পারে। মন যাই বলুক সে কিন্তু সাহস পেলো না।

ধরা পড়ে যাবার ভয়ে সুমিত আর এগোতে পারল না। ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়েও দুম্ করে একটা পেয়ারা ওর কোলের ওপর ফেলে দিয়েই ছুটল বাড়ির দিকে। ভারতীর টানে এতই তন্ময় হ'য়ে গিয়েছিল যে তার ক্লাসের বইগুলো সঙ্গে আনার কথা তখন মনেই পড়েনি।

বাড়িতে ফিরেও আর দেরি করা মোটেই সম্ভব নয়। স্কুলের টিফিন টাইম প্রায় শেষ হতে চলেছে। বইগুলো নিয়েই ছুটতে শুরু করল স্কুলের দিকে।

ভর-দুপুরের চড়া রোদের মধ্যে চলতে এখন আর তার কোন কষ্টই হচ্ছে না। খালি পা, পায়ের নীচে রাস্তার পিচ গলে নরম হয়ে গেছে। কখনো কখনো পায়ের তলায় গরম পিচ আটকেও যাচ্ছে। রাস্তা থেকে নামলো মেঠো পথে। তপ্ত কড়াই থেকে যেন গনগনে আগুনে পড়ার মত অবস্থা হ'লো। বিস্তৃত চষা মাঠের মাঝে কোন গাছপালা নেই। গরমের কাল। তাই দু একটা চাষ দিয়ে চাষীরা খোলা মাঠ ফেলে রেখেছে। বড় বড় মাটির ঢেলাগুলি এদিকে ওদিকে গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝেই আবার গরম হাওয়া এসে সর্বাঙ্গে লাগছিল। ছুটন্ত উত্তপ্ত ধুলোবালির কণাগুলি উড়ে উড়ে এসে যেন স্নান করিয়ে দিচ্ছিল।

সুমিতরা জল-মাটির মানুষ, এসব তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। তাছাড়া আজকের কথাই আলাদা। ভারতীর কাছ থেকে সদ্য পাওয়া ভালবাসার প্রশ্রয়ে তার মনটা তখনও নেশাগ্রস্থ হ'য়ে আছে। ঐসব প্রাকৃতিক উৎপাতের সাধ্য কি যে তার সহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে প্রভাব বিস্তার করে ?

ঐ যে তাদের স্কুল দেখা যাচ্ছে। দৃষ্টির সীমানায় এলেও তখনো স্কুলে পৌঁছুতে পারেনি সুমিত। দূর থেকেই শুনতে পেল টিফিন-টাইম শেষ হয়ে যাবার ঘণ্টা। পড়ি কি মরি করে আবার ছুটতে শুরু করল। তাদের মাননীয় শিক্ষক শ্রীসুরেন মিত্র মহাশয়ের বাড়ির কাছে আসতেই লক্ষ্য করল উনি সবেমাত্র ওনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে মন্থর গতিতে লাইব্রেরী রুমের দিকে যাচ্ছেন। সুমিতের মনে হল এখনও নিশ্চয়ই তাদের ক্লাসে কোনো মাস্টারমশাই যাননি। দরজা-জানালা ভাংগা ইট-বালি খসে যাওয়া দাঁত বার করা ক্লাসঘরগুলি তখনও খাঁ খাঁ করছে। তার অনুমান ঠিক, তখনো কোনো ক্লাসেই শিক্ষকদের পাত্তা নেই। ক্লাস-বন্ধুরা জানালা-গুলোর ওপর উঠে লাফালাফি করছে। কয়েকজন তখনো স্কুলের চত্বরেই হা-ডু-ডু খেলছে। এই সময়ে কেউ কারো খবর রাখে না বা শাসন-বারণ করে না, যে যার আপন খেয়ালে থাকে।

স্কুলের বারান্দায় পৌঁছেই সুমিত ধপ্ করে বসে পড়ল একটা ইটের ওপর। তার সমস্ত কপাল জুড়ে ঘাম ঝরছিল। মাথার ঘাম টপ্ টপ্ করে ঘাড় বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। নিজের হাফ-হাতা জামাটার নীচের অংশটা দিয়েই সর্বাঙ্গ মুছে নিল। এতে যে জামাটা ময়লা হতে পারে

বা কালো হয়ে অশোভন হতে পারে তা নিয়ে সুমিতদের কেউ মাথা ঘামায় না।

আজ আর বাকি ক্লাসগুলি করতে তার ভাল লাগছিল না। টিফিন পিরিয়ডের পর আরো তিনটে ক্লাস করতে হবে। মন তার পড়ে আছে ভারতীকে কাছে দেখার আশায়। কিন্তু উপায় নেই, স্কুলে ছুটি না হলে বাড়ি যাবে কি করে?

সপ্তম পিরিয়ডে বেয়ারা হঠাৎ এসে ক্লাসে ঢুকল বাঁধানো একটা খাতা হাতে নিয়ে। মাষ্টারমশাই খাতাটার ওপর চোখ বোলালেন। তারপর পকেটের কলমটা সযত্নে বার করে ঐ খাতার পৃষ্ঠায় একদিকে খোঁচা মারার ভঙ্গীতে কি যেন লিখলেন।

এদিকে ছাত্রদের উৎকণ্ঠার সীমা নেই। মাস্টারমশাইয়ের মুখের দিকে সবাই চেয়ে আছে। আবার কি নতুন নির্দেশ এল অফিস থেকে?

বেয়ারা ক্লাস-ঘর থেকে সদ্য সইকরা খাতাটা নিয়ে বেরিয়ে যেতেই মাষ্টারমশাই মাথা ঘুরিয়ে ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, শোন সবাই, কাল বিকেলে স্কুলের বাৎসরিক স্পোর্টসের হিট্ হবে। যারা স্পোর্টসে নাম দিয়েছ, তারা অবশ্যই বিকেলের হিটে জয়েন করবে।

সুমিত ঐ নোটিশ শুনে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তার কপাল ভাল যে আজকেই হিটের দিন ঠিক হয়নি। তাহলে আজকে থাকা তার পক্ষে মোটেই সম্ভব হতো না।

এদিন স্কুল ছুটি হতেই ছুটতে ছুটতে সে বাড়ি পোঁছল। তাদের ঘরের কাছের কুল গাছটার নিচে কয়েকটা পুরোন ইট পেতে হাত-মুখ ধোবার জায়গা করা হয়েছিল। এখানে কল থেকে বয়ে আনা জলে একটা বালতি সর্বদা ভর্তি করে রাখা হতো।

সঙ্গের বইগুলো পড়ার টেবিলের ওপর ধপ্ করে ফেলে রেখে এক টানে গায়ের জামাটাকে দেহ থেকে খুলে বইগুলোর ওপর ছুড়ে দিয়ে সদর্পে ঐ ভরা বালতিটার কাছে গিয়ে হাজির হল সুমিত। ওখান থেকেই চেঁচিয়ে বলতে লাগল, মা, খেতে দাও।

মা প্রতিবাদ করে বললেন, আগে একটু জিরিয়ে নে বাবা, এতো গরমে এসেই গায়ে জল দিতে নেই।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। কোনো নিষেধই এখন আর তাকে ধরে রাখতে পারছে না। কুলতলা থেকেই সে দেখতে পেলো কোদাল দিয়ে

হা-ডু-ডুর কোর্টটাকে মোলায়েম করে কদাপিয়ে দাগ কাটছে কমল। ঐ দেখে বালতিতে মগ আছে কিনা তা দেখে নেবার তর সইল না সুমিতের। দুই হাত সজোরে জলের বালতির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে সে আঁজলা ভরে জল নিয়ে কোনমতে খানিকটা নিজের মুখে বুলিয়ে ও পায়ে ছিটিয়ে দিয়েই ঘরে গিয়ে ঢুকল। মুখ-হাত-পা মুছতে মুছতেই এক হাতে থালা নিয়ে চলে গেল ভাতের হাড়ির কাছে।

ভাত বেড়ে দিয়ে মা তখন অপেক্ষা করছিলেন।

দু-তিন থাবায় ভাতগুলি মুখে পুরে গোগ্রাসে গিলেই এক ছুটে একেবারে হা-ডু-ডুর মাঠে গিয়ে উপস্থিত হল। তিন দিকেই ঘন ভ্যারেন্ডা গাছের সারির মাঝে এক ফালি ছোট এই মাঠ। এই মাঠের মধ্যে কোদাল দিয়ে জমি পরিষ্কার করে তৈরী হ'য়েছে হা-ডু-ডুর কোর্ট।

কোর্টে গিয়ে উপস্থিত হ'য়েই দেখল সুমিত তার সঙ্গীসাথীরাও ইতিমধ্যে এসে গেছে। হাজারো আকুলতা থাকলেও ভারতীদের বাড়ি যাওয়া এখন একেবারে অসম্ভব। যখন তখন গেলেই হয় না, একটা সময় অসময় আছে তো। বাড়ির লোকেরা কি ভাববে? অতএব এখন এই বিকাল বেলাটুকু খেলায় মত্ত থাকাই ভালো।

শুরু হয়ে গেল খেলা। সন্ধ্যার ফিকে আঁধার যতক্ষণ না সমস্ত মাঠটাকে গ্রাস করে ফেলল ততক্ষণ সুমিত তার সঙ্গীদের সাথে খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকল। খেলার হারজিৎ সম্বন্ধে তার কোনো আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না—শুধুই সময় কাটানো। হুস্ করে সময়টুকু কেটে গেল।

বাড়ি ফিরেই বই, খাতা, পেন্সিল পরিপাটি করে সঙ্গে গুছিয়ে নিয়ে রওনা দিল দীনাদাদের বাড়ি। সন্ধ্যে হতেই দীনাদাকে বাড়িতে না পাওয়া গেলেও ভারতী তো আছে।

জীবনের একটা বিশেষ সন্ধিক্ষণেই ভারতীর সঙ্গে সুমিতের দেখা হয়েছিল। আশীর্বাদের মতই ভারতীর সাহচর্য যেন সুমিতের ভবিষ্যৎ জীবনপ্রবাহের গতিময় বিরাট চলমান যানটার হুইলটাকে সজোরে সুন্দর মসৃণ পথের নিশানায় নিয়ে গেল। কিশোর বয়সের শুধু উড়ো উড়ো মনের চাঞ্চল্যে সুমিত হয়তো ভেসে যেত। স্থির হয়ে বসে পড়াশোনায় বেশ কিছু সময় দেবার মনটা সুমিতের হারিয়ে যাচ্ছিল ক্ষেতের আলে, মাঠে আর বনবাদাড়ের হাতছানিতে। হারিয়েই যেতো যদিনা ঐ সময়ে ভারতীর সঙ্গে তার নিবীড় সখ্যতা গড়ে উঠত।

এই এলাকার নিত্য তান্ডবতার আকর্ষণ আর পরিবেশগত পারিপার্শ্বিকতার আওতায় তার মনে জেগে ওঠা হীনমন্যতার আক্রমণ থেকে ভারতী তাকে নিয়ত রক্ষা করেছে। যেদিন থেকে ও হয়েছে পড়ার সাথী, সেদিন থেকেই ও হয়েছে তার সুখদুঃখের পরম বন্ধু। ধীরে ধীরে যতই ওর ঘনিষ্ঠ হয়েছে ততই দূরে সরে আসতে পেরেছে নিত্যনৈমিত্তিক অশোভন কার্যকলাপের প্রভাব থেকে। এ সবের আকর্ষণ থেকে প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় ভারতীর সঙ্গে পড়তে বসাটাই তার কাছে হয়ে উঠেছে বড়। কৈশোরকালই তো জীবনের মহামূল্য সময়। বাজে কাজে সেই সময়ের অপব্যবহার করা বা কোনোপ্রকার অপচয়কে ঘৃণা করতে শিখিয়েছে যেমন, তেমনি ভারতী ভালো হওয়ার গৌরব বোধটাকেও জাগ্রত করে দিয়েছে সুমিতের মধ্যে। ওর প্রচ্ছন্ন নিয়ন্ত্রণ তাকে সময়মত পড়া, সময়মত খেলা, সময়মত স্কুলে যাওয়া—সব ব্যাপারেই যেন ঘড়ির কাটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার অভ্যেস করিয়ে দিয়েছে। হীনমন্যতাও দানা বাঁধতে পারেনি সুমিতের মনে। অথচ তাদের পরিবেশটা ছিল হীনমন্যতায় আক্রান্ত হবার অনুকূলে।

উদ্বাস্তু শিবিরের সকলেই যে দুঃস্থ ছিল, এমন কথা বলা যায় না। নিজের চোখেই তারা দেখেছে কত সুযোগসন্ধানীরা এখানে এসে পাত্তা গেড়েছে, নাম লিখিয়েছে সরকারী খাতায়। অনায়াস জীবনযাত্রার লোভে কতনা বিবাহিতা মহিলারা এসে উদ্বাস্তুদের দলে ভীড়েছেন হাতের লোহা আর সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলে। এই সব ব্যাপারকে কেন্দ্র করে ঘটেছে কতইনা অন্যায় অত্যাচারের ঘটনা।

আজও সুমিতের মনে পড়ে তাদের প্রতিবেশী নিশীথদের কথা। বহুদিন পর্যন্ত নিশীথ ছিল সুমিতের প্রায় নিত্যসঙ্গী। সুমিত লক্ষ্য করত, কি মজা করেই না নিশীথরা শিবিরে আছে। ওদের নিত্যনতুন জামা, প্যাণ্ট, কাপড়, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি কোনটারই অভাব ছিল না। এই সময়ে পরিচয় হলেও তখনো দীনাদাদের সংগে সুমিতের ঘনিষ্ঠতা তেমন জমে ওঠেনি। দীনাদার পরিবর্তে নিশীথদের বাড়িতেই তার যাতায়াত ছিল প্রাত্যহিক এবং অবাধ। ওদের ঘরগুলি ছিল কেমন টিপটপ্ সাজানো। নিশীথদের তুলনায় নিজেদের কতনা অসহায় মনে করতো সে। অসহায়ের চোখেই দেখত সদ্য জমিদারী হারিয়ে এলেও তার রেশটুকু নিশীথরা ভালভাবেই বজায় রাখতে পেরেছে। ওদের মুখে কোন

দারিদ্র্যের চিহ্নও ছিল না। ওদের চলন বলন এবং খাওয়া-পরার ঘটা দেখে সুমিতের হিংসাই হ'ত।

কতদিন সে মায়ের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করেছে নিশীথদের প্রসঙ্গ তুলে। বড়লোকিআনায় মুগ্ধ হ'য়ে নিশীথদের প্রসঙ্গে সমীহ করে কথা বলায় মাকে শুধু কাঁদতেই দেখত। শেষে মা বলতেন ঃ ওদের সঙ্গে আমাদের তুলনা করিস না। ওদের বিষয়আশয় আছে, সেখান থেকে হয়তো সাহায্য আসে। প্রচুর টাকার মালিক ওরা।

এর বেশী কিছু বলার ভাষা জোগাতো না মায়ের মুখে। অন্যান্য বন্ধুরাও প্রায়ই ওদের নিয়ে আলোচনা করত। শিবিরবাসী হয়েও এত স্বচ্ছলতা কি করে হয় বুদ্ধি বিবেক দিয়ে তার কোনো রহস্য উদ্ধার করতে পারছিল না সুমিত। সকলেরই কৌতুহল বাড়ছিল। সেই কৌতুহল অবশেষে অজানা রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য সবাইকে অত্যন্ত আগ্রহী করে তুলল। এই আগ্রহই ক্রমশঃ স্থানীয় উদ্বাস্তুদের প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিয়েছিল। আজ তাই সুমিত সবাইকে বলতে পারে যে, সত্য অনন্তকালের জন্য চাপা থাকে না, একদিন দিবালোকের মত উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে।

তখন উদ্বাস্তু শিবিরে দিনরাত খুন জখম চলছে। রাত্রে লোকের নিরাপত্তা বলে কোন বস্তুই ছিল না। শিবিরের সরকারী পুলিশদের শাসনব্যবস্থা তখন প্রায় ভেংগে পড়েছিল। তারা কোনক্রমেই ওই সব খুনজখমের অন্তরালবর্তী অপরাধমূলক কাজকে ঠেকাতে পারছিল না। বাধ্য হয়ে থানা থেকে পরোয়ানা জারি হলো, স্থানীয় সকল যুবকদের পালা করে রাত্রে পাহারা দিতে হবে।

সেই দলে সুমিতদের বয়সী ছেলেদেরও নেওয়া হ'ল। সুমিতকেও ঐ দলে নাম দিতে হ'ল। সুমিতরা সকলে পাহারা দিতে শুরু করল।

বহুদিন পাহারা চলল। কিছুতেই তারা প্রকৃত অপরাধীদের ধরতে পারছিল না। তবু সরকার বাহাদুরের হুকুম অমান্য করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। কারণ উদ্বাস্তুদের রুটি-রুজিটা তো সরকারেরই হাতে।

পাহারা দেওয়ার সেই সব রাতের বহু ঘটনা আজও সুমিতের স্মৃতি-পটে স্পষ্ট করেই বিদ্যমান। আজ তাই সে বুঝতে পারে, কারো কারো দারুণ অধঃপতনের প্রকৃত কারণটা কি। অর্থনৈতিক সংকটই ওদের নিম্নগামী হবার পথটাকে আরও সহজ করে দিয়েছিল। বিভ্রান্ত মানুষরা

দুর্ভাগ্যের বলি হয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই ধীরে ধীরে অপরাধমূলক কার্যকলাপের পথে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

কোনো কোনো রাতে সমস্ত পাড়াটা টহল দিয়ে এসে সিমেন্টের বিরাট রাণওয়ের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে হয়তো বসেছে, এমন সময় হঠাৎ তারা দেখতে পেলো নিশীথদের ঘরের লাগোয়া বকফুলের গাছের মাথায় যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ছুটে গেল সবাই। কিন্তু কৈ, কোন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না তো! সবুজ গাছটি অবিকল ফুল, পাতা ও কুঁড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা অবাক হ'য়ে খানিকক্ষণ গাছটার আপাদমস্তক লক্ষ্য করত। কোন পরিবর্তনই চোখে পড়ত না! তবে কি— ! ভয়ে সকলের গা-টা ছমছম করে উঠত। রুদ্ধশ্বাসে খানিকটা সময় ওখানে অপেক্ষা করে দলবল নিয়ে তারা আবার অন্য রাস্তায় চলে যেত।

অনেক দিন মনে হ'য়েছে নিশীথদের বাড়ির পাশের জংগল থেকে যেন ছোট শিশুর কান্না ভেসে আসছে। এতো রাতে ওখানে শিশু আসবে কোত্থেকে! ভয়ে তাদের গায়ে কাঁটা দিত। উপায়ান্তর না পেয়ে হাতের বল্লম দিয়ে সাহসভরে তারা দু'একবার জঙ্গলটায় আঘাতও করত। টর্চ জ্বালিয়ে চারিদিকে লক্ষ্য করেও কোন রহস্যই উদ্ধার করতে পারতো না তারা।

প্রায় প্রতি রাতেই ঐ বাড়ির আশেপাশে এমন সব ঘটনা ঘটছে দেখে সবাই ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

ব্যাপারটা কি জানবার জন্য মাকে একদিন সব কথা খুলেই বলল সুমিত। তার মনে হয়েছিল মায়ের হয়তো এসব ব্যাপারের ভেতরকার কারণ সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আছে। গম্ভীর মুখে মা সব কিছু শুনলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। কোনো মন্তব্য না করায় সুমিতদের ধারণা হল যে বিষয়টা বোধহয় মা এড়িয়ে গেলেন।

তখনও পাহারা দেওয়া চলছে, নিয়মিত তারা পাহারা দিতেই লাগল। এমনি রহস্যঘেরা অবস্থার মধ্যে পাহারা দেবার সময়ে হঠাৎ এক রাতে খবর এল ধুতি-পাঞ্জাবী পরা কে একজন নিশীথদের বাড়িতে এইমাত্র ঢুকেছে! কৌতুহলী হ'য়ে তারা সবাই ভাবল, দেখতেই হবে কে ঐ লোকটা।

খবরটা শোনামাত্র নিশীথদের বাড়ি ধাওয়া করল সবাই। ওদের ঘরের দেওয়ালের কাছে সন্তর্পনে এগিয়ে গিয়ে সকলেই আড়ি পেতে রইল।

সন্ধানী চোখ মেলে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় দেখল, নিশীথের শোবার ঘরের মধ্যে কেরোসিন তেলের ডিম লাইটটা টিম্‌ টিম্‌ করে জ্বলছে। সেই স্বল্প আলোয় স্পষ্ট কিছু দেখা না গেলেও ঘরের মধ্যে চলমান পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

এদিকে দলের কারো মুখে কথা নেই। এমনকি শ্বাসপ্রশ্বাস পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছিল না কেউ। আজকের পাহারার দলের সবাই কম বয়সী, এই মুহূর্তে তাদের কি করা উচিত তার সিদ্ধান্ত নিতে একবার বড়োদের পরামর্শ নেওয়া দরকার। ঐ পদশব্দের জন্য তাদের মনে যে সন্দেহ জেগেছে তার অবসান ঘটাতে চোখের ইঙ্গিতে ওখান থেকে সরে এসে সবাই সেই মুহূর্তেই ছুটে গেল তাদের ডিফেন্স পার্টির গ্রুপ লিডারের নির্দেশ নিতে। বাড়ি তার কাছেই।

নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলেন গ্রুপ লিডার। ঘুম থেকে ডেকে তোলা হল লিডারকে। তাদের কাছে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনে গ্রুপ লিডার নির্মলদা ছুটে এলেন নিশীথদের বাড়ি। বাড়িটার চারদিকে দ্রুত পাহারার সুবন্দোবস্ত করা হল।

নির্মলদা নিজে এগিয়ে গিয়ে নিশীথদের দরজায় আস্তে আঘাত করলেন।

কোন সাড়া নেই। মুহূর্তেই ঘরের ছোট ডিম লাইটটা নিভে গেল। বাড়ির সকলেই যেন গভীর ঘুমে অচেতন।

আরো জোরে দরজায় আঘাত করা হল তখন।

ঘরের ভেতর থেকে নিশীথেরই মা যেন ঘুমের ঘোরে বলল, কে ?

গম্ভীর গলায় নির্মলদা বললেন, আমি নির্মল, দরজা খুলুন। আপনার ঘরে চোর এসেছে।

চোর ! নিশীথের মা যেন আকাশ থেকে পড়ল ঃ আমার ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ, চোর আসবে কি করে ? তোমরা ভুল করেছ।

তবুও লিডারের দায়িত্ব নিয়েই নির্মলদা বললেন, দরজা খুলুন বলছি।

অগত্যা নিশীথের মা দরজা খুলে দিল।

ঘরে ঢুকে সব দিকে টর্চের আলো ফেলে দলের সবাই লক্ষ্য করতে লাগল। কোথাও কোন জনমানবের চিহ্নটুকুও পাওয়া গেল না।

নিশীথের মায়ের গলায় আরও জোর বেড়ে গেল। শাসানোর ভঙ্গীতে বলল নিশীথের মা, এতো রাতে ভদ্রঘরের মহিলাদের ডেকে তুলে উপদ্রব

করা ? শান্তিরক্ষার নামে মাঝরাতে একি তোমাদের অভদ্র ব্যবহার। কালই আমি থানায় যাবো।

এমনি নানান ধরণের বাক্যবাণ ছুঁড়ে দলের সকলকে ব্যতিব্যস্ত করতে শুরু করল নিশীথের মা।

এই অসুবিধাজনক অবস্থার সামনে দাঁড়িয়ে তখনও দলের কেউ নিরাশ হয়নি। ঘরের প্রতিটি কোণ থেকে শুরু করে বিছানাপত্র পর্যান্ত সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে চলেছে তারা। অবশেষে ঘরের কোণে পড়ে থাকা একটা বিরাট কাঠের বাক্সের দিকে হঠাৎ নজর পড়ল তাদের। বাক্সটার মধ্যে কয়লা থাকে। সন্দেহ নিরসন করতে ঐ বাক্সটার ডালা টেনে তুলতেই তাদের সকলের চোখ ছানাবড়া। ধুতি-পাঞ্জাবী পরা সেই ভদ্রলোকটিকে দেখা গেল সর্বাঙ্গে কয়লার কালো গুড়ো মেখে মাথা গুঁজে তখনও ঐ বাক্সটার মধ্যে পড়ে রয়েছেন।

আর যাবে কোথায়। সুমিতের হাতের শক্ত লাঠিটা সজোরে আছড়ে পড়ল ভদ্রলোকটির নধর শরীরে।

উঃ শব্দ করে ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে উঠতেই সকলে চমকে লক্ষ্য করল তাদের পালক সরকার বাহাদুরেরই একজন পদস্থ কর্মী রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে চুপিসাড়ে চলে এসেছেন নিশীথদের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির সাহায্য করতে। কি আশ্চর্য! সর্ষের মধ্যেই ভুত ?

ধরা পড়ে যাবার পর ভদ্রলোকের সে কি কাকুতি মিনতি, সে কি অনুরোধ উপরোধ।

ভবিষ্যতে হয়তো এই সরকারী লোকের হাতেই তাদের পড়তে হতে পারে ভেবে লোকটিকে আর বেশী হেনস্থা করতে ভরসা পেলো না তারা। শেষ পর্য্যন্ত ছেড়েই দিতে হল চোরের নামে ধরা পড়া ঐ বিশেষ ভদ্রলোকটিকে।

কয়লার বাক্স থেকে যে কালির কলঙ্কচিহ্ন তার মুখে সে রাতে লেগেছিল তার দাগ ধুয়ে মুছে ফেলতে পারেননি যতদিন পর্য্যন্ত তিনি ওখানে ছিলেন। বাধ্য হয়ে শেষটায় বদলি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন কলকাতায়। তবে একা নয়, এত দিনের দেওয়া অর্থের পরিবর্তে পাওয়া সুখ সমেত নিশীথের মাকেও করেছিলেন সাথী।

নিশীথের মা আবার নতুন করে বধূ হয়ে কলকাতার জনসমুদ্রে হারিয়ে গিয়েছিল। আর সুমিতের কাছে এইভাবেই পরিষ্কার হয়ে

গিয়েছিল অত রাতে জঙ্গলে শোনা শিশুর কান্না এবং বকফুলের গাছের মাথায় হঠাৎ দেখা আগুনের রহস্যটা।

এমন সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা ওখানে প্রায়শঃই ঘটেছে। জন্মের পর পিতৃপরিচয়টা নিয়ে যেতে পারেনি ওখানকার আরো কত যে শিশু তার কোন হিসাব নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই হোক বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামই হোক, পরিণামের দিক থেকে সব কিছুকে ম্লান করে দিতে পেরেছিল ধুবুলিয়া ক্যাম্পে আগন্তুকের দল। সুমিত ঐ বয়সেই পরিচিত অপরিচিত মানুষগুলির চরিত্রের গোপন রহস্য দেখতে দেখতে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছে বার বার। তারপর এই সব নায়ক-নায়িকারূপীদের অবাককরা গল্পকাহিনী প্রকাশে অনিচ্ছুক মায়ের প্রতি আর কখনও অভিমান বা রাগ করতে পারেনি সে।

আরও একটি অনুরূপ বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল সুমিতকে। চোর ধরতে গিয়ে যেমন জামাইরূপী ভদ্রলোকটি ধরা পড়েছিল তাদের হাতে, তেমনি সত্যি সত্যি একবার নির্ভেজাল এক জামাই ধরা পড়ে নাজেহাল হ'য়েছিলেন তাদের হাতে।

গভীর রাত। দেড়টার ট্রেন যথাসময়ে এসে ধুবুলিয়া স্টেশন ছুঁয়ে মাঠের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলে গেল মুড়াগাছার দিকে। পাহারা দেওয়া সাময়িক থামিয়ে রেখে ট্রেনের তীব্র সচল আলোটার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল দলের সবাই। ক্রমশঃ ট্রেন চলার শব্দটাও অস্পষ্ট হতে হতে একেবারে দূরান্তে মিলিয়ে গেল। পাহারা দিতে তারা তখন সদলবলে লাঠি হাতে পাড়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত টহল দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল শুধু একটাই—অপরাধীকে ধরতে হবে।

দলের মধ্যে কে যেন হঠাৎ এক সময় ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, দেখ্‌তো, দেখ্‌তো, কে যেন এগিয়ে আসছে না ? খবরদার কেউ টর্চ জ্বালবি না।

আঁধারের মধ্যেও যতদূর দৃষ্টি চলে সকলের সজাগ দৃষ্টি ততদূরে গিয়ে পড়তেই তারা দেখতে পেলো সন্তর্পণে জনৈক আগন্তুক এই দিকে এগিয়ে আসছে।

'কাপড়-চোপড়ের পারিপাট্য দেখে কোনো বাড়ির জামাই বলে মনে হচ্ছে। তবু সাবধান, যেন আমাদের ফাঁকি দিতে না পারে।' কথাগুলি

বলল তাদেরই কে একজন। চোখের ইংগিতে কাছাকাছি এদিকে ওদিকে দ্রুত গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে পড়ল সকলে।

একাই লোকটি সতর্ক চোখে এদিকওদিক চাইতে চাইতে তাদের পাড়ার দিকে এগিয়ে আসছিল। ছিপছিপে গড়নের লোকটির কাঁধে একটা ঝোলানো সাইড ব্যাগ, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবী। পোষাকপরিচ্ছদে এবং চলনে অবিকল যেন নতুন জামাই-এর ভাব। প্রথমে তাই মনে হ'য়েছিল। তারপর একটু কাছাকাছি হ'তেই তাদের মনে হ'ল লোকটির বয়স বোধ হয় মাঝারিই হবে।

অল্প সময়ের মধ্যেই লোকটি এসে পাড়ার মধ্যে প্রবেশ করল। হাতের পাল্লার মধ্যে আসতেই তারা হঠাৎ একযোগে ওর সামনে এগিয়ে গিয়েই সমস্বরে চিৎকার করে বলে উঠল, হল্ট।

একবার থমকে দাঁড়াল লোকটি। তাদের সকলের হাতে ইয়া বড় বড় লাঠি আর বল্লম দেখে দিশেহারা হয়ে গেছে বলে মনে হল প্রথমটায়। কিন্তু তা মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই পড়ি কি মরি করে লোকটি মারল ছুট। তারাও ততক্ষণে মরিয়া হয়ে গেছে এবং তাদের ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। তাদের সন্দেহ হ'ল জামাই যদি হয় তবে 'হল্ট' শুনে না থেমে ছুটল কেন? তবে কি লোকটি চোর? সন্দেহটা জাঁকিয়ে বসল সকলের মাথায়। হাতের মুঠোয় নির্ভেজাল একটি চোর পেয়েছে ভেবে প্রাণপণে এক জোটে ধাওয়া করল সবাই লোকটির পিছু পিছু। ছুটতে ছুটতে তাদের চোখগুলি দারুণ তীক্ষ্ন হয়ে উঠছিল। ইতিমধ্যে সকলেরই ঘুমের ঘোর গিয়েছিল ছুটে।

আকাশটা ছিল সামান্য মেঘাচ্ছন্ন। শুক্ল পক্ষের রাত হ'লেও চাঁদের আলোটা তত পরিষ্কার ছিল না। তবুও সমস্ত মাঠ, পথ ও আশেপাশের বনগুলি সকলেই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল।

লোকটি ছুটছে, তারাও ওর পিছু পিছু ছুটে এগোচ্ছে। পাড়ার রাস্তার বাঁকটা ঘুরেই লোকটি এসে পড়ল খেলার মাঠে। দিনে-দুপুরে ঐ মাঠে খেলতে খেলতে সমস্ত মাঠের মানচিত্রটা তাদের কাছে ছিল একেবারে পরিষ্কার।

এখানে আসতেই তারা শুরু করল সাঁড়াসী আক্রমণ। তিন দিক থেকে ছ'জন পাহারাদার নেমে পড়ল মাঠে। উচ্চকণ্ঠে তারা তখন চিৎকার করছে—চোর, চোর।

লোকটিও তখন সামনের বনজঙ্গল ভেদ করে প্রাণপণে ছুটছে আর ছুটছে।

এইভাবে এগোতে এগোতে একটু সময় পরেই সামনে পড়ল ত্রিকোণা একটা পাহাড়ের মতো উঁচু মাটির ঢিপি। বুদ্ধি করে ছুটন্ত লোকটি তখন একটা ঝাঁকুনী দিয়ে তাদের চোখের আড়াল করে বেঁকে ঢুকে পড়ল সাত নম্বর গ্রুপের দিকে।

পাহারাদার দলটিও তৎপর। তড়িৎ গতিতে ছুটে তারা উঠে পড়ল ঢিপিটির চূড়ায় আবছা জ্যোৎস্নায় লোকটির অস্তিত্ব নতুন করে মাঠের দূর প্রান্তে আবার ভেসে উঠল। তারাও নতুন করে পূর্ণোদ্যমে ছুটে চলল ওর দিকে।

ইতিমধ্যে পাড়ার লোকজন তাদের চিৎকার শুনে বেরিয়ে পড়েছে লাঠি-সোটা নিয়ে। তারাও চিৎকার করতে করতে পাহারাদার দলটির অনুসরণ করছে। এতে দলটির সাহস গেছে আরও বেড়ে।

এত লোকের জমায়েৎ এবং সম্মিলিত কোলাহলে লোকটি বুঝি হারিয়ে ফেলল বিবেকবুদ্ধি। চোখটাও বোধ হয় ওর ক্লান্তিতে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। তাই ছুটতে ছুটতে হঠাৎ গিয়ে পড়ল একটা খানার মধ্যে। খানার মধ্যে পড়ে গিয়ে ফিরে ওঠার ক্ষমতাও ফেলল হারিয়ে।

তাই দেখে ছুটন্ত পাহারার দল আনন্দে চিৎকার করে উঠল—ধরেছি, ধরেছি।

অবশেষে ধরা পড়ল লোকটি। সুমিত ছুটে গিয়ে পাঞ্জাবিটা ধরে লোকটিকে টেনে তুলল। ভালো করে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই দলের দু'এক জন এই মারি কি সেই মারি করে ওর দেহে বসিয়ে দিল কয়েক ঘা।

কি যেন বলতে চাইছিল লোকটি। কিন্তু কে শোনে ওর কথা। তাদের আনন্দ-উল্লাসে চাপা পড়ে গেল ওর সব কথা। শুধু মাঝে মাঝে গুম্ গুম্ করে সম্মিলিত মারের আওয়াজ হতে লাগল। বেচারা তখন উঃ আঃ ছাড়া কিছুই বলতে পারছে না।

ঐ অবস্থায় লোকটিকে তারা টানতে টানতে নিয়ে আসতে লাগল নিজেদের পাড়ার দিকে। সমস্ত রাস্তা তখন লোকে লোকারণ্য। সকলেরই হাতে লাঠি। আর মেয়েদের হাতে একটা করে হেরিকেন। সকলেই অপেক্ষা করছে ধরা পড়ে যাওয়া চোরটিকে দেখবার জন্য।

পাড়ায় পেঁছিতে যারাই একবার চোরের মুখ দেখতে এল, তারাই সঙ্গে সঙ্গে একটা করে লাঠির গুঁতো বা হাতের ঘুষি দিতে ভুলল না। সকলের এই রকম অভ্যর্থনার দাপটে বিরাট রাণওয়ের ওপর হঠাৎ চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল চোরটি। সমস্ত মুখ ওর ক্ষতবিক্ষত, কোথাও বা উঁচু হয়ে ফুলে উঠেছে কোথাও বা রক্তের চিহ্ন। গলা দিয়ে শুধু গোঁঙানীর শব্দ বের হচ্ছে।

বীর পাহারাদারদের প্রশংসার আর সীমা রইল না। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারাও নানারকম উচ্ছ্বসিত ভাষা শুনিয়ে চিৎকার করছে। এমন সময় কে যেন হঠাৎ বলে উঠল, এইরে, ব্যাটা বোধ হয় মরেই গেল।

এঁ্যা! তাইতো—কোন সাড়া নেই। লোকটির মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে পড়েছে।

ঐ দেখে পাহারাদাররা ভয় পেয়ে গেল। টের পেলে এবার হয়তো পুলিশ উল্টে তাদেরই বেঁধে নিয়ে যাবে। ছুটে গিয়ে নিয়ে আসা হল জল। ওর চোখেমুখে জলের হাত দিয়ে বুলোতে লাগল সুমিত। অন্য একজন গায়ের জামাটা নাড়িয়ে মাথায় বাতাস করতে লাগল। কাজ হল অচিরেই। ওর জ্ঞান ফিরে এল। রাত তখন প্রায় শেষ। এবার একবার থানায় খবর দেয়া দরকার। এই নিয়ে জল্পনাকল্পনা শুরু হতেই নানান প্রশ্ন দেখা দিল: কোথায় চুরি করছিল? কার বাড়ি? তারা লক্ষ্য করল কি ভাবে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতশত ভেবে কিছু করা হয়নি দেখে তাদের গ্রুপ লিডার ক্ষেপে গেলেন। নিজেই ছুটলেন সব ব্যবস্থা করতে।

দিলীপদের বেড়ার ঘর। ছিঁড়ে ফেলা হ'ল বেড়ার বাইরের তারের বাঁধুনীগুলি। টেনে ঘরের একটা বাক্সকে কাত করে ফেলে রাখা হল বাইরে। ওদের বাড়ির লোকদের মোটামুটি পড়িয়ে শিখিয়ে রাখা হল।

সকাল হতেই দূর দূর থেকে লোক আসছে চোরকে দেখবার জন্য। ব্রজবাবু পঁচিশ নম্বর গ্রুপ থেকে চোর দেখতে এসে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। তার কথা শুনে বোঝা গেল উনি ঐ লোকটির শ্বশুর। সকলের মুখে তখন একই কথা: চোরের শ্বশুর!

বাঁধা পড়লেন তিনিও। দু'জনকেই ধরে রাখা হ'ল। বেলা যখন প্রায় আটটা তখন থানা থেকে একটা জীপ এল। জীপ থেকে সদর্পে নেমে দারোগাসাহেব নিজের চোখে সমস্ত জায়গাটা তদন্ত করে দেখলেন।

পাহারাদারদের বক্তব্য শুনে তাও রেকর্ড করে নিলেন দারোগাসাহেব। তিনিও সন্দেহাতীত ভাবে বুঝতে পারলেন তারা একজন ঠিক চোরকেই ধরতে পেরেছে। গ্রুপ লিডারও গর্ব বোধ করলেন তার দলের এই চোর-ধরা ডিউটির তৎপরতায়। আবেগে একবার বলেই ফেললেন, এতদিন প্রতিটি গ্রুপের ছেলেদের বলে এসেছি, ধৈর্য্য ধর। সজাগ দৃষ্টি রাখবে, একদিন না একদিন ওদের হাতের মুঠোয় পাবেই।

বিভিন্ন কথার মধ্যেই চোরবেশী জামাইকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হল। দারোগাসাহেব চোরকে ও তার শ্বশুরকে একসঙ্গে জীপে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। চোর চলে গেলেও সুমিত ও পাহারাদার দলের কারোরই রেহাই নেই। প্রতিবেশী সকলের মুখে একই কথা শুনতে হচ্ছে তাদের : না বাবা, যে যাই বলুক তবু ওদের জন্য নিশ্চিন্তিতে রাতে অন্তত ঘুমোন যায়। কেউবা বলল, যদিও গাছের ছোট ছোট ফলমূলগুলি ওদের জ্বালায় গাছে থাকে না, তবুতো বড় ভাবনার জিনিষগুলি রক্ষা পায়। বহু লোকের বহু মনের ও মতের মধ্যে ঐভাবে প্রশংসিত হতে লাগল তারা।

চোর ধরার ব্যাপারটা যতই প্রশংসিত হোকনা কেন তারা কিন্তু তাদের মনের কাছে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল। যদিও খুব অল্প ক'জন লোকই ভেতরকার বিষয়টা জানে, তথাপি অপরাধী মনে বিবেকের খোঁচাটা ভীষণ ভাবে বিঁধছিল তাদের।

বিশেষভাবে সুমিত আরও বেশী আঘাত পেল সে রাতে ভারতীর ভৎর্সনা শুনে। চোরটিকে ধরার পর ভারতীও এসেছিল তাদেব কীর্তি দেখতে। সুমিতের মনে আছে বিশাল লোক জমায়েতের মধ্যে যখন সকলেই চোর দেখতে ব্যস্ত আর রাস্তার ওপর ছড়ানো ছিটানো ছোট ছোট জটলা তখন সুমিত ভারতীকে ওর দিকে এক চোখে চেয়ে সেই ভীড় থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল।

ইশারা করে ভারতী সুমিতকে কাছে ডাকল। একটু পাশে সরে এসে দাঁড়ালো সুমিত। তখন তার সমস্ত শরীর ঘুমে টলমল করছে, চোখ দু'টো জ্বালা করছে। হাতে পায়ে কাদা লেগেছে এই অবস্থায় ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বহুজনের মধ্যে ও শুধু একটা কথা বলল, কিরে, কি সব শুনছি ?

সুমিত বলল, কি শুনেছিস বলতো ?

না, কিছুনা। তবে এতটা ভাল নয়, দাদাকেও ছাড়ছি না। কথাগুলি

বলেই মুখ ঘুরিয়ে এগোতে লাগল ভারতী। মুহূর্ত পরে আর একবার সুমিতের দিকে চেয়ে বলল, যা, বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে নে। যা কিছু বলার সন্ধ্যার সময় বলব।

ধীরে ধীরে তখন রাস্তার ভীড় হালকা হতে লাগল। যে যার বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। তারাও গ্রুপ লিডারের কাছে লাঠি ও টর্চ জমা দিয়ে বাড়ি গেল।

বাড়িতে ফিরেই চটপট হাত-পা ধুয়ে নিল, তারপর সকালের বরাদ্দ তিনখানা রুটি খেয়ে শুয়ে পড়ল সুমিত। তার শরীর খুব ক্লান্ত, তবুও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে চাইল না। সে শুধু ভাবছে—তবে কি ভারতী তাদের সাজানো কাণ্ডকারখানার খবর পেয়েছে? না কি, আন্দাজেই ঢিল মেরে তাদের পাকড়াও করতে চাইছে? সে যাই হোক, বিকেলে নিশ্চয়ই ভারতীর সংগে দেখা হবে। যদি তা না হয়, সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি বইগুলি হাতে করে ওদের বাড়ি গিয়েই না হয় বিষয়টা জেনে নেবে। এত সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। সেই ঘুম থেকে জেগে উঠতে প্রায় বেলা তিনটা বেজে গেল।

ঘুম থেকে উঠেই একটা বালতি হাতে নিয়ে চলে গেল টিউবওয়েলের কাছে। মনে মনে তখন সে ভাবছে, যদি ভারতীর সঙ্গে একবার দেখা হয়ে যায়, তবে জিজ্ঞাসা করবে কি হয়েছে? ও কি ভাল নয় বলল? ঐ সব ভাবছে আর ধীরে ধীরে কলের হ্যাণ্ডেল ধরে পাম্প করছে। মাঝে মাঝে চোখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখেও নিচ্ছে। কোথাও ভারতীর চিহ্নটুকুও পেল না। তার পেটও তখন ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলছে। আর দেরি করা সম্ভব নয়। মাথায় জল ঢালতে শুরু করল। দুপুর বেলা রাস্তায়, মাঠে লোকজনের দেখা নেই। এমন সময় ভারতীই বা কি করে আসবে। মনকে শান্ত করে স্নান সেরে বাড়ি চলে এল।

সেদিন ভাত খেতে বেলা প্রায় চারটা বেজে গেল সুমিতের। আজ আর বাড়ির বাইরে যেতে তার মন চাইল না। শরীরটাও অন্য দিনের চেয়ে খারাপ লাগছিল। সাধারণতঃ সকাল পাঁচটার মধ্যে পাহারা শেষ করে ঘুমোতে যায়; আর আজ ঘুমোতে এসেছে বেলা নটার সময়। শরীরটা বড় মেজ মেজ করছে। তা বাইরে না বেরিয়ে ছোট টেবিলের সামনে চেয়ারটা নিয়ে বসে পড়ল। এরপর কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারছিল না। ভাবল, বই নিয়ে নাড়াচাড়া করে। ইংরাজী বইটা দু'একবার খুলে কয়েকবার পাতাগুলো দেখতে লাগল বটে, কিন্তু কিছুতেই মন

বসল না। খাতাটা নিয়ে টেস্ট পেপার খুলে একটা অঙ্ক কষতে শুরু করেও বুঝল যে তাতেও সে মন দিতে পারছে না। আজ এতো বেশী করে তার মনের মধ্যে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে যে কোন বিষয়েই খুশী হতে পারছে না সে। অগত্যা স্থির করল ভারতীকে আজ একটা চিঠি লিখে দেবে। সন্ধ্যার সময় পড়তে গিয়ে ওকে চিঠিটা পড়ে দেখতে বলবে। ও নিশ্চয়ই একটা উত্তরও দেবে। এই সব নানান কথা ভেবে অবশেষে চিঠিটা লিখতে শুরু করল।

"...ভারতী, তোমার খেয়ালি কথাগুলি আমার ভাল লাগে না। অনেক দিন আমি আমার মন থেকে সে কথা বলার প্রস্তুতি নিয়ে তোমার কাছে গিয়েছি, তুমি অবহেলা ভরে সে কথা না শোনার ভান করে উড়িয়ে দিয়েছ, উপেক্ষা করেছ আমাকে। অথচ তোমার কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে দিনরাত পড়াশোনা করে কাটাই। তোমার বিষয় কিছু বললেই বল, নিজের চরকায় তেল দে। হয়তো আমি সব দিক থেকে দুর্বল বা তোমাদের সাহায্য নিয়ে চলার চেষ্টা করছি বলেই তুমি এমন করে আমাকে এড়িয়ে যেতে পার। যদি সত্যি সত্যিই তোমার কাছে আমার কোন দাবি না থাকে, তুমি বলে দিলেই ও পথে আর পা বাড়াব না।...

চিঠি লিখতে লিখতে মাঝে মাঝেই সুমিত ভাবছে আর কি লিখবে ? আর কি লেখা তার পক্ষে সম্ভব ? বুদ্ধিবিবেক দিয়ে কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। তবে কি এতেই ভারতী তার মনের ভাবটা বুঝতে পারবে না আরও কিছু লেখার প্রয়োজন আছে ? খাতার পাতাটা খোলা রেখে মনে মনে নানান কথা জল্পনা কল্পনা করছিল সে। এদিকে মা বাইরে বিকেলের কাজগুলি শেষ করছেন। ক্ষেত থেকে শুকনো পাতাগুলি ঝুড়ি করে কুড়িয়ে আনছেন। আগুন ধরাতে ঐ গুলি সাহায্য করে। ভাইয়েরা দু'জনই মাঠে খেলা করতে গিয়েছে। বাড়িতে তখন একলা সুমিত আপন মনে শুধু লিখছে আর ভাবছে।

মাঝে একবার লেখা থামিয়ে যখন আর কি লিখবে তাই ভাবছিল তখন হঠাৎ একখানা অদৃশ্য হাত টেবিলের উপর খুলে রাখা তার খাতার পাতাটাকে চেপে ধরল।

চমকে উঠল সুমিত এবং সজোরে সেও তার খাতাটাকে চেপে ধরল। কে তার খাতাটাকে টেনে নিতে চুপিসাড়ে হাত বাড়িয়েছে তা দেখার জন্য মুখ ফেরাতেই দেখে ভারতী স্বয়ং এসে তার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে

রয়েছে। তার অর্ধসমাপ্ত লেখা চিঠিটার ওপর ভারতীর হাত যেন আঁকড়ে ধরেছে সুমিতের হাতসহ চিঠির পাতাটাকে।

যাকে উদ্দেশ্য করে এই চিঠি লেখা হচ্ছিল তাকেই কাছে দেখে লজ্জায় মুখ লাল হ'য়ে গেল সুমিতের। কথা সরছে না। ওর হাতটা টেনে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। তার শরীরের জোরটুকু যেন হারিয়ে গেছে।

ভারতী বলল, আমার সব পড়া হয়ে গেছে, আর লুকিয়ে লাভ নেই।

তবু ওকে সরাতে হবে ভেবে সুমিত বলল, এই, কেউ দেখে ফেলবে। মা যদি ঘরে এসে এই অবস্থায় দেখে তো কেলেঙ্কারী হ'য়ে যাবে।

এতোতেও ভারতী তার হাত সরাবার পাত্রী নয়। 'যাকনা—' বলে উচ্চকণ্ঠেই বলল, 'মাসীমা আমায় কিছু বলবেন না। আসুক উনি, আমিই ওনাকে বলব যে আপনার ছেলে প্রেমপত্র লিখছে। সামনে পরীক্ষা, সেদিকে তার হুঁস নেই। প্রেম করতে গিয়ে ছেলের ওসব দিকের খেয়াল শেষ হয়ে গেছে।'

ভারতীর চিৎকার চেঁচামেচি শুনে সুমিত আরও বেশী ঘাবড়ে গেল। 'এসব কি হচ্ছে'—বলে সে তার হাতটা বাড়িয়ে খাতার চিঠিলেখা পাতাটা ছিঁড়তে শুরু করল।

ভারতী বাধা দিয়ে বলল, ওটা আমার সুতরাং আমাকে দে।

দেবে না ভেবেই সুমিত কাগজটা ছিঁড়তে শুরু করেছিল। ছিঁড়তে ছিঁড়তেই বলল, এটা তোর নয়, এ অন্য একজনের জন্য লিখছিলাম।

'তাই নাকি? তাহ'লে তো আরও বেশী দরকার'—বলে খপ্ করে হাত থেকে টান মেরে চিঠির পাতাটা কেড়ে নিল ভারতী।

চিলের মত ওর অমন ছোবলটা সামলাতে পারল না সুমিত। মুহূর্তেই বোকা বনে কাকুতি মিনতি করতে লাগল কাগজটা ফেরৎ পাবার জন্য। কিন্তু ফেরৎ পেলো না।

ভারতী বলল, যদি ফেরত দিতেই হয় তবে আরও একখানা কাগজ সংগে দিয়েই ফেরত দেব। এই বলে চিঠিখানা হাতে নিয়ে চলে গেল।

এরপর, সুমিতের বোকা হয়ে বসে থাকা ছাড়া কোনো উপায় রইল না। জানালা দিয়ে যতদূর পর্যন্ত দেখা যায় চলমান ভারতীকে দেখতে লাগল। ভারতী ওদের বাড়ির লেবু গাছটার নিচে গিয়ে পেঁছেই একবার ফিরে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে ছুটে পালিয়ে গেল।

ওর ঐ হাসিটা সুমিতের মনটাকে হালকা করে দিল! ভেবেছিল চিঠি পড়ে ওর কতই না রাগ হ'য়েছে। বোধ হয় ওকে চিঠিটা দেখতে দেওয়া ঠিক হয়নি। কিন্তু সে সব ভাবনার নিরসন হল ওর ছোট্ট হাসির অভিব্যক্তিতে।

তবুও নিশ্চিন্ত হতে পারল না সুমিত। তার মনে নানা সংকোচ তখনও উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে কি ও বলবে? চিঠিটা আগাগোড়া পড়েই বা কি ভাববে? যতক্ষণ আবার ওর সঙ্গে দেখা না হয় তার মনে শান্তি নেই অথচ এই মুহূর্তেই ওদের বাড়ি যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

সুমিতের মনকে উদাস করে দিয়েই ভারতী এইমাত্র চলে গেল। লেখাপড়া আর আজ তার ভাল লাগছে না। বই বন্ধ করে গম্ভীর মুখে রাস্তায় পায়চারি করতে লাগল।

এই অবস্থায় ওকে দেখে বন্ধুদের দু'একজন প্রশ্ন করল, কি অত ভাবছিস রে, আজ খেলতে গেলি না?

সকলকে একই উত্তর দিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করল সুমিত: আজ শরীরটা ভাল নেই। কাল সারারাত ধরে যুদ্ধ করেছি, ঘুম হয়নি. তাই শরীরটা মেজ মেজ করছে।

তখনও পাড়ায় চোর ধরার বীরত্বের জন্য আলোচনা চলছে। সুতরাং সুমিতের খেলতে না যাওয়ার যুক্তিটা সকলেই সহজভাবে নিল। বন্ধুদের সঙ্গে এটা ওটা কথা বলতে বলতে চোখ ঘুরিয়ে মাঝে মাঝে সে দেখে নিচ্ছিল ভারতীর উদ্দেশ্যে তার লেখা চিঠির কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। কান খাড়া করে ওদের বাড়ির আওয়াজ পাবার চেষ্টা করছিল।

ওদের বাড়ি থেকে বেরোবার মুখে রাস্তার পাশেই একটা বিশাল কাঁঠাল গাছ। সেই কাঁঠাল গাছের ছায়ায় ওদের বাড়ীর উঠোন প্রায় অন্ধকার হ'য়ে রয়েছে। পশ্চিম আকাশের সূর্য অস্তমিত প্রায়। লাল সিঁদুরে রংয়ের শেষ আলোটুকুর ছোঁয়া লেগে গাছের পাতাগুলি চিকচিক করছিল। তারই মাঝে সুমিত লক্ষ্য করল নিচু হয়ে ভারতী উঠোনটা পরিস্কার করছে আর আড়চোখে তাকে এক একবার দেখে নিচ্ছে।

তাই দেখে মনের মধ্যে যেন বিদ্যুতের মত শিহরণ জেগে উঠল সুমিতের। তার সর্বদেহে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। আর কতটুকু সময়ই বা বাকি? সন্ধ্যা একবার হলেই হয়, সোজা গিয়ে হাজির হবে গুরুমশাই এর পাঠশালায়।

একটু পরেই সব বাড়িতে বাড়িতে সাজের প্রদীপ জ্বলে উঠল। শঙ্খের ধ্বনি বেজে উঠতে লাগল চারিদিকে। ধীরে ধীরে পৃথিবী নীরবতার কোলে গা এলিয়ে দিয়ে যেন নিদ্রায় মগ্ন হয়ে পড়ল। বন্ধ হয়ে গেল পাখীদের শেষ বেলার গুঞ্জন। রাতের জন্তুজানোয়ারেরা প্রকাশ্যে বেরিয়ে এল। গাছের ডালে ডালে বাদুড়ের পাখার শব্দ শোনা যেতে লাগল। দূরে থেকে বাতাসে ভেসে এল শিয়ালের ডাক। না, আর দেরি করা সম্ভব নয়। সুমিতের মনটা তখন চার দেওয়ালের মধ্যে ঘেরা তার প্রিয়জনের সঙ্গ পাবার জন্য আকুলি বিকুলি করে উঠছিল। দেখা গেল ভারতী তখন ওদের ঘরের জানালার কাছে হ্যারিকেনটা রেখে কি যেন মন দিয়ে পড়ছে। পড়তেই বসেছে বলে মনে হ'ল সুমিতের। নিজের মধ্যেও তার কর্তব্যবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

পড়াশোনার জন্য বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে তার নিজেদের ঘরের দিকে চলে এল সুমিত। ঘরে আসতেই মা বিছানা পেতে দিয়ে বললেন, এখানে পড়তে বোস্, আমি কাঁথা সেলাই করি।

মা ও সেলাই-এর টুকিটাকি নিয়ে বসে পড়লেন পাশে।

সুমিতের কিন্তু মনের ছটফটানি শুরু হ'য়ে গেল। অগত্যা মাকে বলল সে, দীনাদার বাড়ি যেতে হবে একবার উনি যেতে বলেছেন।

দীনাদার কথা শুনে মা অন্য কোন বাক্যব্যয় করলেন না। সুমিতের হাতে একটা হ্যারিকেন দিয়ে বললেন খুব সাবধানে যাবি, ওদিকের রাস্তাটায় ভীষণ জঙ্গল। একটু শব্দ করে করে পথ চলবি। ফেরার সময় না হয় আমাকে হাঁক দিস।

বই খাতা কয়েকটা হাতে নিয়ে সুমিতও বেরিয়ে পড়ল। ঘর থেকে বেরিয়ে তাদের দরজার কাছে শিমুল গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল একটু সময়। জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল ওদের বাড়ির দিকে। কিন্তু ওদের জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসা এক ঝলক হ্যারিকেনের আলো ছাড়া কিছুই দেখতে পেলো না। অন্ধকার রাতে সন্তর্পণে আরও এগিয়ে চলল দীনাদার বাড়ির দিকে।

সন্ধ্যে হতে না হতেই প্রতিবেশী লোকজন সবাই যে যার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। যেতে যেতে চারদিকে শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না সুমিত। শিমুল গাছটাকে বাঁয়ে রেখে ডান দিকের মাটির সরু রাস্তায় পা বাড়ালো সে। দু'পাশে ক্ষেতের বেড়া।

বেড়াগাছগুলির ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে শিম, বরবটি, লাউ, কুমড়ো ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের লতানো গাছ। লতানো গাছগুলির পাতার ভারে বেড়াগাছগুলি ঝুঁকে পড়ে রাস্তাকে সংকীর্ণ করে ফেলেছে। সুমিতের গায়ে পায়ে গাছের পাতাগুলোর স্পর্শ লাগছে। পাতার উপরের শিশিরবিন্দু তার হাতে পায়ে লেগে শরীরে মাঝে মাঝে শিহরণ জাগিয়ে দিচ্ছিল। মনটাও তার দুরুদুরু করছে। কিভাবে—কি মূর্তিতে দেখবে ভারতীকে?

তাদের বেড়ার দিকটা শেষ হতেই গিয়ে দীনাদাদের বাড়ির সীমানায় পেঁছুল। আবার বাঁ-দিকে বাক নিতেই ওদের শিমুল ফুলের গাছের নীচে গিয়ে হাজির হ'লো। শিশির স্নাত সদ্য ফোটা শিমুল ফুলের গন্ধে তার মনটা ভরপুর হ'য়ে উঠল। কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে গন্ধ শোঁকার সময় তার নেই। হাতে হ্যারিকেনটা নিয়ে এক পা দু'পা করে এগোতে লাগল। ওদের বাড়ির কোণটায় পেঁছে তার মনে হ'ল জানালার কাছে গিয়ে একবার আওয়াজ করবে। নিশ্চয়ই ভারতীর কাছ থেকে এই আওয়াজের প্রত্যুত্তর পাবে। প্রত্যুত্তরের ধরণে বুঝতে পারবে ভারতীর মনের অবস্থাটা কি?

আর একটু এগিয়ে জানলার কাছে গিয়েই সুমিত দু'বার পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করে যা-যা-বলে সজোরে নিজের উপস্থিতিটা জানিয়ে দিল। ওখানে একটুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থেকে হাতের হ্যারিকেনটা ঘুরিয়ে জঙ্গলের দিকে নীচু হয়ে অন্ধকার জঙ্গলটাকে লক্ষ্য করতে লাগল। ঐ অবস্থায় দু'একবার চট করে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল কেউ তার ঐ কাজটাকে ঘরের ভেতর থেকে লক্ষ্য করছে কিনা। না, তখনও ওদিককার কোনো সাড়াশব্দ নেই। এবার কাছেই পড়ে থাকা একটা গাছের ডাল হাতে তুলে নিল। সেই ডালটা দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একবার নাড়া দিল। এতক্ষণে সাড়া পেল সুমিত।

জানালা দিয়ে ভারতীর মা মুখ বাড়িয়ে বললেন, কি হয়েছে বাবা?

সুমিত বলল না কিছু না। একটা সাপ এইমাত্র এখান থেকে জংগলের মধ্যে চলে গেল।

ভারতীর মা বললেন, ওমা! গায়ে পড়েনি তো?

সুমিত ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। গম্ভীর গলায় উত্তর দিল, না।

ব্যাকুল কণ্ঠে ভারতীর মা বললেন, তবে শিগ্গির চলে এস বাবা;

ওখানটায় ভীষণ জঙ্গল হ'য়েছে। কতদিন দীনাকে বলেছি ঐ জঙ্গলটাকে কেটে ফেলতে, তা কিছুতেই শুনছে না। ওর নাকি সময় হয় না। ছেলে দেশ উদ্ধার করে বেড়াচ্ছে। তা বাবা—আগে ঘর, তারপর তো বাইর ?

ইতিমধ্যে সুমিত ঘরের মধ্যে ভারতীর মার কাছাকাছি পেঁৗছে গিয়েছিল। দেখল ভারতীও তার মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মায়ের ঐ কথা কটা শেষ হ'তে না হতেই ভারতী তার মাকে জড়িয়ে ধরে সুমিতকে উদ্দেশ্য করে বলল, কিরে, কামড়ে দেয়নি তো ? তোকে খেয়ে ফেলতেও তো পারতো ?

মা স্নেহপ্রবণ স্বরে বলে উঠলেন, যা, এ-কথা বলতে নেই। বালাই ষাট্, ওকে কেন সাপ কামড়াতে যাবে। তোর মুখে আর কিছুই আটকায় না।

সুমিত ভীতু এবং লাজুক মুখে নিজেই দরজার কোণে রাখা মাদুরটা নেবার জন্য এগিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে চিলের মত ছো মেরে আগেভাগে মাদুরটা হাতে নিয়ে ভারতী বলল, ও—বেশী কাজ শিখেছিস বুঝি ? এ বাড়িতে কি কাজের লোক নেই ?

থমকে মাঝ পথেই দাঁড়িয়ে পড়ল সুমিত। রোজকার মত মাদুরটা পেতে দিল ভারতী। একদিকে বই ও হ্যারিকেনটা রেখে মাদুরের ওপর বসে পড়ল সুমিত। ভারতী আজ আর সুমিতের সঙ্গে ঐ মাদুরের পাশে স্থান নিল না। সে গিয়ে তার টেবিলে বসে নিজের পড়া শুরু করল।

ভারতীর মা আগেই চলে গিয়েছিলেন রান্নাঘরে। এই সুযোগে সুমিত নির্বাক হ'য়ে ভারতীর কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগল।. আপন মনে ভাবছিল সে—তবে কি তার আগ্রহকে সমর্থন করতে পারল না ভারতী ? নাকি চিঠিটা পড়ে তার প্রতি বিরক্ত হয়েছে ?

ভারতী আরও জোরে তার পড়া পড়তে লাগল। কোনো দিকেই সে তাকাচ্ছিল না। কিছুই যেন হয়নি, এমনি একটা নির্বিকার ভাব নিয়ে সে তার নিত্য নৈমিত্তিক কাজটুকু করে যাচ্ছিল।

মন দিয়ে এই পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণ করতে পারল না সুমিত। ধিক্কার দিল নিজেকে। এর চেয়ে আজ বোধ হয় তার পড়তে না আসাই ভাল ছিল। এসে যখন পড়েছে, তখন চলে যেতেও পারছে না। এ এক মানসিক যন্ত্রণা।

চুপ করে বসে থেকে একবার ঘরের সব দিক লক্ষ্য করল সুমিত। ভারতী ছাড়া এ ঘরে আর কেউ নেই। দীনাদাও বাড়ি নেই। কতক্ষণে উনি আসবেন তাও কেউ জানেনা। এখন কি করবে সে? দীনাদার আসা পর্যন্ত বসবে, না চলে যাবে? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবে? ভারতীকে জিজ্ঞাসা করলে যদি কোনো সদুত্তর না দেয়? তার চেয়ে অপমান আর কি আছে? মনে মনে স্থির করে ফেলল, ভারতীর সঙ্গে সে আর কথাই বলবে না। নিজেই নিজের ইংরেজী বইটা খুলে আপন মনে পড়তে শুরু করল। একটা একটা করে প্রায় চার-পাঁচটা প্রশ্নোত্তর পড়ে ফেলল। পড়ার ফাঁকে এক একবার আড়চোখে ভারতীকে দেখতে লাগল।

ভারতী তখন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তার পড়া করছে। সুমিতের পড়ায় একটুও মন নেই। অস্থস্তিকর অবস্থাটা কাটিয়ে উঠতে সে এবার একটা খাতা খুলে অঙ্ক কষতে শুরু করল।

তখনও ভারতী জোর দিয়ে 'সেলফিস্ জায়েন্ট' গল্পটার একটা ব্যাখ্যা মুখস্ত করার চেষ্টা করছে। ব্যাখ্যাটির মর্মকথা ছিল…শিশুদের একদিন আমি (স্বার্থপর দৈত্য) তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। সমস্ত পৃথিবী তথা প্রকৃতি ঘৃণা করে আমাকে ভুলে গিয়েছিল। আজ এই সুন্দর বাগানে সেই শিশুটির অনুপ্রবেশ আবার প্রকৃতিকে আমার বাগানে ডেকে আনলো। সুতরাং ওদের আর তাড়ান হবে না। এই সুন্দর বাগান আজ ওদের জন্য এবং চিরদিনই ওদের…।

ভারতীর মুখে 'সেলফিস্ জায়েন্ট' গল্পটির ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে সুমিতের মনে নানান কথাই উথালি পাথালি করে উঠছিল। তবে কি ভারতী তাকে সেই শিশুটি ভেবে নিল? যদি তাই হয় তবে তার পুনরানুগমন ওর মনোময় বাগানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে। সুতরাং সুমিতের মনে নতুন আশার সঞ্চার করল। নিশ্চয়ই ও তার আগমনে আনন্দই পেয়েছে। নতুবা এই বিশেষ অর্থবহ ব্যাখ্যাটি জোর দিয়ে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ওর পড়ার কি কারণ? তাকেই বা ব্যাখ্যাটি শোনাচ্ছে কেন?

এইরকম নানা প্রশ্ন তার মনে আসতে লাগল। এত সত্বেও ক্ষীণ একটা সন্দেহ কিন্তু থেকেই যাচ্ছিল তার মনে। ভারতীর কথাবার্তা শুনে তো মনে হয় ওর হৃদয় অত সহজ নয়। কঠিন বলে এতদিন ভাবা ওর মনের

বিশাল পাথর এত সহজেই কি করে গলবে? না, নিশ্চয়ই সে ঐ অর্থটি ভুল করে ভাবছে। ও হয়তো তাকে স্বার্থপর দৈত্যটির সঙ্গেই তুলনা করছে। হেলায় ওর সব আদেশ-অনুরোধ সে তো উপেক্ষা করেছে। নিশ্চয়ই ও তাই ইঙ্গিত করছে তার জীবন ও ঐ স্বার্থপর দৈত্যটির মত একদা নিস্ফল ও কুৎসিত হবে।

এমন সব কত যে ভাবনা, তার শেষ নেই। অগত্যা অঙ্ক কষায় মন দিল সুমিত। এক এক করে গোটা পাঁচেক অঙ্ক করা হয়ে গেল। তবু ও ভারতী তার নির্দিষ্ট জায়গা ছেড়ে নড়ল না বা পড়াটাও বন্ধ করল না।

সুমিতের মাথায় তখন নানা প্রশ্নের বোঝাটা মস্ত এক পাহাড়ের মত চেপে বসেছে। আর সহ্য করতে না পেরে সে সোজাসুজি বলল, এই, দীনাদা কখন আসবে?

কোন সাড়াই পাওয়া গেল না ভারতীর। ওর ভান দেখে সুমিতের মনে হ'ল পড়ায় ও এতোই মগ্ন যে তার কথা যেন একেবারে শুনতেই পায়নি।

সুমিত নিজেই তখন লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে উঠে গেল ওর টেবিলের কাছে। হাতের এক ঝটকায় ভারতীর সুমুখ থেকে বইটা সরিয়ে নিল।

চট্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ভারতী এবং নিজের ডান হাতখানা ঝুঁকিয়ে এগিয়ে দিল সুমিতের দিকে। টেবিলটা মাঝখানে থাকায় সুমিতের হাত থেকে বইটা নিতে পারল না। বইটা ফিরিয়ে নেবার জন্য কাকুতি-মিনতি করতে শুরু করল।

ওর এমন আগ্রহ দেখে বিরক্ত হ'ল সুমিত। এতক্ষণ ভারতীর নির্বিকারত্ব ও ঔদাসীন্য ভয়ানক পীড়া দিচ্ছিল তাকে। সব সময় খেয়ালী ব্যবহার সহ্য করতে পারা যায় না। নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তেই সে হাতের বইটা ধপ করে টেবিলের সামনে ফেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, বলছিস না কেন, দীনদা কখন আসবেন? যদি দেরী হয় আমি চলে যাব।

নিরুত্তাপ কণ্ঠেই ভারতী জবাব দিল, তার আমি কি জানি? দেখা হলে তোর দীনদাকেই জিগেস করবি?

ভারতীর মুখে নির্লিপ্ত কথা ও উদাসীন ব্যবহার সুমিতকে এতই ক্ষুব্ধ করে তুলল যে, সে কোনো প্রতিক্রিয়ার কথা না ভেবেই বলল, তবে আমি চলি।

কথাটা বলেই টেবিলের কাছ থেকে সরে মাদুরের কাছে চলে এল

সুমিত। বইগুলি গুছিয়ে নিতে লাগল; খাতাটাকে ভাজ করে পেন্সিলটাকে হাতে নিয়ে উঠতে যাবে, এমন সময় তার খেয়াল হ'ল মাদুরটাকে গুটিয়ে আবার যথাস্থানে রাখতে হবে।

চোখেমুখে তার তখন রীতিমত বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। হতাশায় সে নিজেকে অপমানিত বোধ করছিল। মনে মনে ভাবছিল আর কখনই এ বাড়িতে আসবে না, তাতে তার নিজের যতই ক্ষতি হোক। একটু পড়াশোনার জন্য এতো লাঞ্ছনা! রাগে জোরে জোরে সে নিশ্বাস ফেলতে লাগল। চোখ দুটো তার লাল হ'য়ে গেল।

তবু ভারতীর মুখে কোন কথা নেই। এতক্ষণ নীরবে সে শুধু সুমিতের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। মাদুরের একদিকে সুমিতের হাত পড়তেই হঠাৎ ভারতী পিছন ফিরে প্রশ্ন করল, কি অঙ্ক করলি?

সুমিত ওর দিকে না ফিরে বলল, তোর কি দরকার? আমারটা তোকে জানতে হবে না। নিজের চরকায় তেল দে।

গম্ভীর মুখে কথাগুলি বলতে বলতে সুমিত মাদুরটা গুটোতে শুরু করল।

ভারতী এবার দ্রুত চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে মাদুরের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, যাক্—এটা আমিই তুলতে পারব। এতো কাজ না দেখালেও চলবে। এ বাড়িতে লোক আছে।

সুমিতও সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমার জন্য অন্যকে দায়িত্ব নিতে হবে না। আমারটা আমিই তুলে রাখব।

'আমি এখানে পড়তে বসব।' বলেই মাদুরটার এক কোণে বসে পড়ল ভারতী।

সুমিত আর কোন বাদ-প্রতিবাদ না করে এক হাতে হ্যারিকেন এবং অন্য হাতে বইগুলি নিয়ে বাইরে বেরোবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়ালো।

দু' এক পা এগোতেই তার হ্যারিকেনটার হাতল ধরে টান দিয়ে শান্ত স্বরে বলল ভারতী, আয়, রাগ করিস না। এবার আমরা একসঙ্গে পড়তে বসব।

ওর হাতের টানে হ্যারিকেনটার ওপরের দিকে তেল উঠে গেল। ভিতরে দপ্ দপ্ করে আলোটা জ্বলে উঠল। এমনি দু'চারবার দপ্ দপ্ করেই নিভে গেল আলোটা।

হ্যারিকেনের আলো নিভে যেতেই সুমিতের মনের গভীরের আগুনটা

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সে বেশ জোরেই বলে উঠল, আমার বাতিটা নিভিয়ে দিলি কেন ?

তার গলার স্বর ভারতীদের রান্নাঘরে গিয়ে পৌঁছোল। ভারতীর মা ওখান থেকে হাঁক দিয়ে উঠলেন, কিরে ? কি হ'য়েছে ? তোদের পড়ার শব্দ আসছে না কেন ? দীনা এখনই এসে পড়বে, তোরা নিজেরা ততক্ষণ একটু পড়্।

মায়ের কাছ থেকে সাড়া পেয়ে এদিকে দু'জনেরই মুখ বন্ধ হয়ে গেল। সুমিত স্তব্ধ হ'য়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। ভারতী তার হাত থেকে হ্যারিকেনটা নিয়ে চলে গেল রান্নাঘরে।

সুমিতের পক্ষে অন্ধকারে অনড় হ'য়ে স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না। মাদুরের ওপর বসলে ভারতী এসে যদি তাকে কিছু শোনায়, তাই ভেবে বসতেও ইচ্ছে হ'লো না সুমিতের।

দু' মিনিটের মধ্যে হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে নিয়ে ভারতী আবার ঘরে এল। এসেই মাদুরটা আবার ভাল করে পেতে নিজের বইগুলি মাদুরের এক দিকে রেখে নিজে বসে পড়ল।

এবার তার হ্যারিকেনটা চাইল সুমিত এবং সে চলে যাবে বলতেই ভারতী বলল, ঢের হ'য়েছে, এবার আয় দেখি, বোস্ এখানে।

অভিমানী স্বরে বলল সুমিত, কেন, আমি তো স্বার্থপর দৈত্য। তোর কোমলতাকে হয়তো উপলব্ধি করতে পারছি না। ব্যাখ্যাটা আবার পড়, আমার তো এখানে থাকার আর দরকার নেই।

কোনো বাদ-প্রতিবাদ না করে সুমিতের হাত থেকে বইগুলি ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে বলল ভারতী, যা, এবার যা। তোর পড়তে হবে না।

বইগুলি এখানে রেখে বাড়ি চলে যাওয়া সম্ভব নয়। সুমিত গেলও না। অগত্যা মাদুরের ওপর ভারতীর কাছেই নীরবে বসে পড়ল সে পাছে ওর মা ওদের প্রেমানুগ বিরোধীতার এই মাখামাখিটা টের পেয়ে যান।

নীরবেই এক কোণে বসে রইল সে। ভারতী খুবই আন্তরিকতার আবেগ মিশিয়ে নিম্নস্বরে বলল, নিজেকে স্বার্থপর দৈত্য না ভেবে ছোট শিশুটিও তো ভাবতে পারতিস। নিজের মনে পাপ, তাই ওর বেশী আর কি ভাববি ?

তারপর সুমিতকে উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে তার খাতাটা টেনে

নিয়ে নিজের হাতেই খাতাটা খুলতে খুলতে আবার বলল, কি অঙ্ক করলি ?

ভারতীর আগের বলা কথাগুলির কোন গুরুত্ব না দিয়ে শেষের প্রশ্নের উত্তর দিল সুমিত, লাভ-ক্ষতির অঙ্ক করছিলাম।

যেটা সত্য কথা সেটাই বলেছে সুমিত। কিন্তু তাতেও কি তার রেহাই আছে ? বিভিন্ন প্রশ্ন করতে শুরু করল ভারতী।

উত্তর কি হ'ল—লাভ না ক্ষতি ?

সব অঙ্কের কি উত্তর এক হয়—কোনোটা লাভ আবার কোনোটা ক্ষতি।

কোনটা বেশী হ'ল ?

লাভ।

তবে আর কি ? তোর তো লাভ হ'য়েছে।

আমার অঙ্কের উত্তরও মেলে না, লাভও হয় না।

ভারতীর অর্থবহ কথাগুলি বুঝে উঠতে পারেনি সুমিত। তবু 'লাভ' কথাটার ওপর বিশেষ জোর দেওয়ায় লজ্জা হ'ল সুমিতের।

তার মুখটা গম্ভীর দেখে ভারতী তাকে সহজ ও স্বাভাবিক করার জন্য নানান কথা বলে আসল প্রসঙ্গ উত্থাপন করল। কথায় কথায় বলেই বসল তোর মনের জোরটা পরীক্ষা করে দেখছিলাম। চিঠি লিখে মেয়েদের ভালবাসা জানতে হ'লে মনে জোর চাই। চিঠি লিখলি অথচ ভয় পাচ্ছিস—দু'টো একসঙ্গে হয় না।

ওদের ঐসব কথোপকথনের মাঝেই দীনদা এসে উপস্থিত হলেন। ওরা নাকি অনেক সময় ধরে তার জন্য অপেক্ষা করছে ! তাই শুনে দুঃখ প্রকাশ করলেন দীনাদা এবং এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে বসে পড়লেন ওদের নিয়ে।

ওদের শেখানোর জন্য দীনদা বরাবরই কতনা আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করছেন। ওরাও গভীর মনোযোগ সহকারে সব পড়া বুঝে নিতে চেষ্টা করছে। সুমিতের সামনে তখন একটি মাত্র লক্ষ্য। সে লক্ষ্য দীনাদাকে আদর্শ হিসেবে কল্পনা করে পড়া-লেখার ব্যাপারে তাকে অনুসরণ করা। সুমিত দেখেছে—আশানুরূপ ফল বেরোতেই দীনদা শ্রেষ্ঠত্বের আসন পেয়েছিলেন। কত লোক তাকে ইতিমধ্যে আশীর্বাদ করেছেন। কত লোক তাকে দেখতে এসেছেন। কতই না আদর

পেয়েছিলেন তিনি এই উদ্বাস্তু শিবিরে। তাকে অভিনন্দিত করার জ্বলন্ত দৃশ্য সুমিতকে যতটা অনুপ্রাণিত করেছিল, তেমনটি আর কারো জীবনই পারেনি।

দীনাদার সক্রিয় নির্দেশ এবং আন্তরিক সহায়তায় ভারতী ও সুমিতের সম্মিলিত পড়াশোনা চলতে লাগল। আরো কত বিচিত্র ঘটনার প্রবাহে রোমাঞ্চকর দিনও অতিবাহিত হতে লাগল সুমিতের। বহু বাধাবিপত্তির অবধি ছিল না। তবু লক্ষ্যশীর্ষে পৌঁছোবার একটা আকাঙ্খা তাকে সমস্ত বিপদকে অতিক্রম করতে সাহায্য করেছিল।

দীনাদার সাহায্য ছিল অকৃত্রিম এবং অসীম। প্রায় রোজই তার দ্বারস্থ হত সুমিত। কোন সংকোচ না করে দীনাদা সুমিতকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতেন।

দিনকালের হাওয়া যতই পরিবর্তিত হচ্ছিল ততই উদ্বাস্তুদের দৈন্যদশা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সরকার বাহাদুর তার কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পে-কমিশন বসালেন এবং মাঝে মাঝে তাদের বেতন বৃদ্ধিও করলেন। কিন্তু এই অভাগা উদ্বাস্তুদের জন্য কোনদিন কোন কমিশন বসেনি বা কোন বিশেষ সমীক্ষকদলও পরিদর্শনে আসেনি। বরং এই কথা বলা যায়, অদ্ধভুক্ত লোকগুলি সরকারের হুকুম মতো সব কাজ করতে বাধ্য থাকতো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, সেই সময়ে হঠাৎ সরকার ঠিক করল যে, উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন দেবে। এমন নির্দেশও হয়েছিল—যে স্বেচ্ছায় দণ্ডকারণ্যে না যাবে, তার সমস্ত রকম সরকারি সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে।

প্রথম অবস্থায়, কৃষক শ্রেণীয় পূর্বঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের কিছু লোক সরকারের হুমকির কবলে পড়ে দণ্ডকারণ্যে চলে গেল। ধীরে ধীরে খবর আসতে লাগল যে দণ্ডকারণ্য ভয়ঙ্কর জায়গা। জলের ব্যবস্থা নেই, হাট-বাজার নেই, যানবাহন নেই। শুধু ধু-ধু করছে মাঠ আর মাঠ। এইসব শুনে সকলের প্রাণ শুকিয়ে গেল। সরকারি হুকুম না শনিত কোপ। কবে, কে, কখন কিভাবে ঐ শনির কোপে পড়বে! ভীত সন্ত্রস্থ উদ্বাস্তু শিবিরের সবার চোখের ঘুম বন্ধ হয়ে গেল। ভয়ার্ত সকলের মুখে তখন একটিই প্রশ্ন : "অফিস থেকে এলেন ? কোনো নামের লিষ্ট দেখলেন নাকি ?"

ছিন্নমূল মানুষগুলি কি শুধুই মার খাবে, না নতুন নির্বাসনের

প্রতিবাদে গর্জে উঠবে? ভীষণ দ্বন্দ্ব এই সময়ে সকলের মনে আনাগোনা করছিল। এই দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য সম্মিলিত প্রতিবাদের হাল ধরলেন উদ্বাস্তু শিবিরের কয়েকজন বিশিষ্ট লোক। এঁদের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে মাননীয় সর্বশ্রী সুরেশ চক্রবর্তী, দীনেশ মজুমদার ও কানাই আচার্যর কথা। এদের নেতৃত্বে গড়ে উঠল প্রতিবাদের আন্দোলন। উদ্বাস্তুদের মুখে ফুটে উঠল বিদ্রোহের ভাষা—দণ্ডকারণ্যে পাঠানো চলবে না।

এই প্রতিবাদ এক সময় এমন পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছোল যে এক একদিন উদ্বাস্তু শিবিরে এক থেকে দেড় মাইল লম্বা মিছিল বেরোতে লাগল। যেন একটা সাদা কাপড়ের শৃংখলিত মেলা। অধিকাংশ মহিলাদের তথা বিধবাদের সেই সব মিছিলগুলির সামিল হতে দেখা গেল। নিয়মিত এক একটা মিছিল সাদা এক ঝলক বকের মত সারিবদ্ধভাবে মস্তবড় রাণওয়ে ধরে হেড্ অফিসের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সকলের চোখে মুখে ফুটে উঠত কি দারুণ বিক্ষোভের ভাষা। মিছিল বার করা শুধু ধুবুলিয়ার উদ্বাস্তু শিবিরেই সীমাবদ্ধ রইল না। কালক্রমে ছড়িয়ে পড়ল কৃষ্ণনগর শহরে জেলা অধিকর্তার দপ্তর পর্য্যন্ত। ধুবুলিয়া থেকে কৃষ্ণনগর আট মাইল দূরে। তবু কেউ পিছু-পা হলেন না। সকাল হ'তেই সকলে লাইন দিয়ে ছুটে যেতে লাগলেন অত দূরের সদর শহরের দিকে। এমন সুশৃংখল বর্ণাঢ্য মিছিল আজ আর দেখা যায় না।

সরকার বাহাদুর তবুও অনড়। সরকারী কর্তারা দফায় দফায় স্পেশাল ট্রেনে করে উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাতে শুরু করল। ক্রমশঃ প্রতিরোধ আন্দোলনের জোয়ার আরও ব্যাপক হয়ে উঠল। নেতৃবৃন্দ ঠিক করলেন, মিছিল করে কলকাতায় বিধান সভা অভিযান করবেন।

সকলেই চিন্তায় পড়লেন এবার। এতো দূরের পথ কি করে অতিক্রম করা যায়? অবশেষে ট্রেনে করে একত্রে যাওয়ার ব্যবস্থা স্থির করা হোল।

ইতিমধ্যে সরকার বাহাদুর ঘোষণা করল, কোন উদ্বাস্তু বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠলে তাকে কঠোর শাস্তিদেওয়া হবে। তবুও উদ্বাস্তুরা পিছু হটলেন না।

তাদের চূড়ান্ত আন্দোলনের প্রথম পর্য্যায় শুরু হল অরন্ধন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে। অর্ধাহারী মানুষগুলি সেদিন আর কোন আহারই

গ্রহণ করলেন না। কারো ঘরেই সেদিন রান্না হল না। কোন ঘরে আগুনও জ্বালান হল না। এরপর আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্য্যায় হ'ল,—নিস্প্রদীপ। উদ্বাস্তু শিবিরে সন্ধ্যা নেমে এল, গাঢ় অন্ধকার ঢাকা পড়ল চারিদিক ; তথাপি কারও ঘরে আলো জ্বলল না। সমস্ত শিবিরটা সে রাত গভীর কালো অন্ধকারে ঢাকা পড়েই রইল।

এমন বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে একতা বা সংহতির দৃঢ়তা বুঝে আন্দোলনকে পরিচালনা করতে হচ্ছিল। ঐ সব প্রাথমিক সাফল্যের পর নেতৃত্ব স্থির করলেন সকলে হেঁটেই কলিকাতায় বিধানসভা অভিযান করবেন। সকলের কাছে নেতাদের নির্দেশ সেই মুহূর্তের জন্য দেবতার বাণীর মত হয়ে উঠল। সকলেই সেই পবিত্র মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন যে মুহূর্তে তাদের পায়ে হেঁটে কলকাতা অভিযান করতে হবে।

একদিন সত্যিই সেই নির্দিষ্ট দিনের প্রাক্‌সূর্য উদিত হল। সকলেই কয়েকদিনের জন্য গুড়, চিড়া ইত্যাদি পুটলি বেঁধে নিয়ে প্রস্তুত হলেন। সবে সকালের সূর্য্য রক্তিম আভা ছড়িয়ে রূপালী রং ধরে ধীরে ধীরে গাছের ডালের বেড়াজাল ভেদ করে পূব আকাশে উঠছে। সেই মুহূর্তে মিছিলের যাত্রা হল শুরু। সকলেই নিজের নিজের ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করে বঙ্গদেশ ছাড়ার আপত্তি জানাতে পথে বেড়িয়ে পড়লেন।

সেই দিনের স্মরণীয় মিছিল এবং সমাবেশ সরকার বাহাদুরের চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। এই সমাবেশ এতো বিরাট এবং বিশাল হবার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য বা রাজনীতি ছিল কিনা তা বোঝার বয়স সুমিতের তখনো হয়নি। শিবিরের মা-মাসীদের মুখে সে শুনত, দশরথ রাজা রামচন্দ্রকে বনবাসের জন্য দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়েছিলেন।

নিশ্চয়ই এ এক গভীর অরণ্য এবং জনমানবের বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। নতুবা পুরাতন ধর্মগ্রন্থ মিথ্যা। আজ সরকার বাহাদুর তাদের পূর্ববঙ্গ থেকে এনে এমন একটা জায়গায় পাঠিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। এই বিশ্বাসটাও সাধারণ মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। পূর্ববঙ্গের সাধারণ ঘরের মহিলারা তেমন শিক্ষিত না হলেও রামায়ণ মহাভারতের গল্প তাদের অজানা ছিল না।

সুমিতদের মা ও চিন্তিত হলেন। সুমিত রাত্রে মায়ের কাছে বসে পড়তে পড়তে এক এক সময় জিজ্ঞাসা করত, মা ওখানে গেলে কি হবে ?

মায়ের উত্তর শুনে ভীত হত সুমিত। কখন কখন বলত, চল মা, ক্যাম্প ছেড়ে আমরা কোথাও চলে যাই। কোনো চায়ের দোকানে কাজ করে আমি সংসার চালিয়ে নেব।

তখন মায়ের মুখে একটাই কথা শোনা যেত! তুই ভাল করে পড়াশুনা কর। তোর পরীক্ষাটা হ'য়ে গেলেই আমরা এখান থেকে চলে যাবো। তোকে পাশ করতেই হবে।

সুমিতও তার মাকে জড়িয়ে ধরে অভয় দিত: তুমি চিন্তা ক'রো না মা, আমি পাশ করবই। দীনাদাও সেই কথা বলেন।

স্পষ্টই বোঝা যেত যে সুমিতের উত্তর শুনে মায়ের বুকটা আনন্দে ভরে উঠেছে। সুমিতের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মা বলতেন, তোর মুখ চেয়েই তো অপেক্ষা করে আছি বাবা। সব তোর ওপর নির্ভর করছে। তুই একটু ঠিকভাবে চল।

বলতে বলতে মায়ের চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে উঠত। মায়ের অজান্তে দু'ফোঁটা চোখের জল টপ্ করে এসে সুমিতের কোলে লুটিয়ে পড়ত। মাঝে মাঝেই মা সুমিতকে মনে করিয়ে দিতেন তার সেই দৃঢ় প্রতীজ্ঞার কথা।

রাত্রে মানুষ কল্পনার রাজ্যে যতই ভ্রমণ করুক না কেন, সকাল হলেই এসে হাজির হত দৈনিক আহার, অনটন ইত্যাদির জ্বালা! সুমিতরাও অর্থকষ্টে ভুগছে।

কিভাবে সেই অর্থকষ্টের সামান্যতমও লাঘব করা যায়, সে চিন্তা দেখা দিল সুমিতের মাথায়। তখন একটু একটু বোধ এবং চিন্তাশক্তি সুমিতের মধ্যে জন্ম নিয়েছে।

তাদের বহু প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন হলেন মাননীয় দেবেন্দ্রনাথ সরকার। উনিও বহু কষ্টে সংসার চালান। বয়স তার চল্লিশ হবে। একটা পা ছোট; তাই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন। কর্মক্ষমতা নেই বলেই উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় পেয়েছেন। সুমিতরা তাকে দেবেনদা বলে ডাকত।

সুমিত লক্ষ্য করত, শেষ রাতের অন্ধকার একটু ফিকে হওয়া মাত্র দেবেনদা বেরিয়ে পড়তেন দূর মাঠে। সেই মাঠে আগের দিনের গোধূলি বেলায় ঘরে ফেরার পথে গরুর দল মল ত্যাগ করত। রাখাল বালকরা গোবরের প্রতি কোন নজর দিত না। দেবেনদা প্রতিদিন সকালে সেই

গোবর কুড়িয়ে নিয়ে আসতেন। এনে নিজের রান্নার জন্য ঘুঁটে তৈরি করে নিতেন।

একদিন দেবেনদাকে সুমিত প্রস্তাব দিয়ে বসল : দেবেনদা, আপনার সঙ্গে আমি গোবর আনতে যাব।

মায়ের আপত্তি উঠল। তিনি বললেন, এতো ভোরে গোবর কুঁড়োতে গেলে পড়া হবে না।

মাকে বুঝিয়ে বলল সুমিত শেষ রাত্রে উঠে পড়ার কাজটা সেরে রেখেই সে দেবেনদার সঙ্গে যাবে।

তাদের কোন ঘড়ি ছিল না। তাই লোকাল ট্রেনগুলির শব্দই ঘড়ির কাজ করত। একটা ট্রেন শেষ রাত তিনটায় ধুবুলিয়ার মাঠ ভেদ করে ছুটে যেত কলকাতার দিকে। ঐ ট্রেনের শব্দ কানে যেতেই মা ডেকে দিতেন সুমিতকে। হ্যোরিকেনের আলোটা জেবলে দিয়ে তার পাশে জেগে বসে থাকতেন। চোখ মুছতে মুছতে সুমিত বিছানা ছেড়ে উঠে বসত বই নিয়ে। পড়ার কাজটা আগে সারতেই হবে, নতুবা তিনি সুমিতকে দেবেনদার সঙ্গে যেতে দেবেন না। তাই ইচ্ছাই হোক, আর অনিচ্ছাই হোক তাকে পড়তেই হ'ত। ভোরের আকাশে সামান্যতম আলোর রশ্মি দেখা দিলেই একটা গামছা কোমরে বেঁধে সুমিত দেবেনদার 'দরজায় গিয়ে' হাজির হ'ত হাতে একটা ঝুড়ি নিয়ে। দেবেনদাও তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়তেন তার সঙ্গে। বাড়ির লাগোয়া পিচের রাস্তা পেরিয়ে ওরা শিশির-ভেজা মাঠে পা দিত। পাশেই অড়হর ডালের ক্ষেত। কোথাও বা ছোলার ডাল। মাঝের সামান্য জমির আল ধরে হেঁটে চলত ওরা। ক্ষেত পেরিয়ে গিয়ে হাজির হত আমবাগানে। কখনও বাগান থেকে ভেসে আসা আমের মুকুলের গন্ধ মনকে ভরিয়ে তুলত। কখনো বা ছোট্ট ছোট্ট আমের মঞ্জরী দেখে মনটা মাতাল হ'য়ে উঠত। এমন করে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার সুযোগ এর আগে তার হয়নি। তার মনে হ'ত এ সবই তো ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুটো গোটা আমের কুঁড়ি পাবার জন্য মনে মনে আবেদনও জানাতো। রাত্রে ঝড় হলে পরের দিন তার আনন্দের সীমা থাকত না। মনে মনে ভাবত সেদিন নিশ্চয়ই মাঠে প্রচুর আমের কুঁড়ি পাবে। যা ভাবা তাই হ'ত। বৃষ্টিস্নাত সিক্ত মাঠে পা ফেলেই মাঠে ঝরে পড়ে থাকা কুঁড়িগুলি কুড়োতে সুরু করত। এ যেন ঈশ্বরেরই অযাচিত দান। দীন দরিদ্র মানুষের জন্য তাঁরই যেন সমবণ্টন নীতির

প্রতিফলন। কুঁড়িগুলি কুড়োতে কুড়োতে কখনই তার মনে হয়নি যে এগুলি পরের দ্রব্য বা এগুলি নেবার মধ্যে কোন অপরাধ আছে।

প্রায় প্রতিদিনই সে এইভাবে কখনো ছোলার শাক, কখনো আমের কুঁড়িগুলি নিয়ে বাড়ি ফিরত।

গোবর কুড়োতে খানিকটা দূরের মাঠে পেঁছিতে হবে। মাঝের রেললাইনটা পেরোলেই সেই মাঠ অর্থাৎ সদ্য কেটে নিয়ে যাওয়া বিস্তৃত ধানক্ষেত। তখনও ক্ষেতের শুকনো ধানগাছের গোড়াগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারই মাঝে এখানে ওখানে পড়ে আছে গোবর। গোবর কুড়িয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরত।

মায়ের নির্দেশ ছিল ফিরে এসেই মুখ-হাত-পা ধুয়ে প্রাতরাশ সেরে নিয়ে পড়তে বসতে হবে। কোনমতেই আর পড়াশোনা করাটা উপেক্ষা করা চলবে না: এটাও যেন ছিল তার এক দৃঢ় প্রতীজ্ঞা।

গোবর কুড়িয়ে সুমিত সংসারের কতটুকু উপকার করেছে বলতে পারবে না, তবে লক্ষ্য করেছে যে এই কাজে মায়ের মনটা শান্তিতে ভরে উঠত। গোবর কুড়োনো মানে তো উপার্জন নয়, সংসারের দায়িত্ব বহনের ভূমিকামাত্র। সেই ভূমিকাটির সূচনা দেখা দিয়েছে সুমিতের মনে। এই দেখেই বোধহয় মায়ের মনে শান্তি এসেছে! তা বোঝা যেত মায়ের অভিব্যক্তিতে।

মায়ের সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতায় সুমিতেরও আনন্দ হত। তার পরের কাজগুলি করার অনুপ্রেরণা লুকিয়ে ছিল ওরই মধ্যে।

বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্য মাছ ছিল সুমিতদের নাগালের বাইরে। বিশেষ করে সুমিত শিশুকাল থেকেই মৎস্যপ্রিয়। সেই মাছ খুব কম দিনই তাদের ভাগ্যে জুটতো। কদাচ যদি কোন চুনো বা ছোট মাছ আনা হত, কাঁটার জন্য খেতে আপত্তি করত সুমিত।

মায়ের মন কেঁপে উঠত এই আপত্তিতে। কিন্তু সান্ত্বনার ভাষার অভাব ছিল না তার। তিনি বলতেন, ওরে বড়লোকেরা একটা বড় মাছ কেনে, সকলে তা থেকে এক টুকরো করে খায়। আর তোরা প্রতি মুঠো ভাতের সঙ্গে কটা করে মাছ খাচ্ছিস ভাবতে পারিস?

ঐ সান্ত্বনাবাক্যে তখন আর সুমিতের মনে আনন্দের সীমা থাকত না। হাসিমুখে তারপর এক এক মুঠো ভাতে কত সংখ্যক মাছ খেতো তার হিসেব থাকত না।

কখনো কখনো ছুটির দিনে মাছ ধরতে যেতো সে। এই মাছ ধরার ব্যাপারে একদিনের একটি স্মরণীয় ঘটনা আজও তার মনে পড়ে। দেবেনদার সঙ্গে সেদিন মাছ ধরতে যাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। রাত দশটায় বাড়ি থেকে বেরোতে হবে। অত রাত্রে বাড়ি থেকে বাইরে যেতে দেবেন না বলে মা প্রথমটায় সম্মতি দেন নি। শেষ পর্যন্ত দেবেনদা সমস্ত দায়িত্ব নেওয়ায় রাজী হ'য়ে গেলেন। সুমিতও পড়াশোনা শেষ করে তাড়াতাড়ি জামা আর একটা হাফ্-প্যাণ্ট পরে দেবেনদার সংগে মাছ ধরতে রওনা হ'ল। ঘর থেকে বেরোতেই দেবেনদা তার হাতে একটা ব্যাগ ধরিয়ে দিলেন। সুমিত শ্রেফ ওনার ব্যাগ ধরতেই যেন সংগ নিল।

রাত তখন দশটা বাজে। সমস্ত উদ্বাস্তু শিবির ক্লান্তিতে নিদ্রামগ্ন। কোথাও কোন আলোর চিহ্নটুকুও নেই। কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। জনপ্রাণীর সাড়াও মিলছে না। দূরে মাঠে শেয়ালগুলি তারস্বরে চিৎকার করছে। পিচের রাস্তা ধরে এই অন্ধকারে দেবেনদার পাশে পাশে চলেছে সুমিত। মনের ভয়কে প্রকাশ করতে পারছে না। নির্জনতার ভয়ার্ত আমেজ তাকে গ্রাস করতে চাইছে। রাস্তার পাশে বিশাল খেজুরের গাছগুলি দৈত্যের মত চেহারা নিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। প্রবাদ আছে, এখানে নাকি গাছপালায় দৈত্যদানবের বাস। কথাটা মনে পড়তেই সে দেবেনদার হাতটা জড়িয়ে ধরল। উনি অভয় দিয়ে তাকে ধরে পথ চললেন। ধীরে ধীরে সমস্ত উদ্বাস্তু শিবির অতিক্রম করে ওরা নেমে পড়ল মাটির পথে। মাটির পথ ধরে ওরা এগিয়ে চলেছে।

দূরেই জমিদার বাড়ি। বহু পুরাণো এই বাড়ি। বাড়ির বাইরের দেয়ালের প্লাস্টার খসে পড়েছে। ইটগুলি দাঁত বের করে হাসছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে অজস্র আগাছা বাসা বেঁধেছে। কোথাও বা বটগাছ ডালপালা মেলে আকাশের দিকে শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তবুও জমিদার বাড়ির বর্তমান পুরুষরা আভিজাত্যকে সম্বল করেই এই অর্ধ-ভগ্ন গৃহে বসবাস করেন।

একটু এগিয়ে জমিদার বাড়িকে বাঁয়ে রেখে ওরা পৌঁছল একটা বাগানে। এই বাগানও ঐ জমিদারের। এই বাগানের এক পাশে মহাশ্মশান। শ্মশানের বিশাল তেঁতুল গাছটা দৃষ্টিপথে ভেসে উঠল। খুব অস্পষ্ট যেন এক চাক বরফ লম্বা হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কুয়াশায়

কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ভয়ে ও সংকোচে ওদিকে আর তাকাতে পারল না সুমিত।

দেবেনদার মুখে নীচু গলার কথা ফুটে উঠল : এই বাগানেই সেই পুকুর। এটা জমিদারের বাগান। এই পুকুরে আমরা মাছ ধরব। খবরদার, একটুও শব্দ হয় না যেন।

হাত থেকে জালটা জমির ওপর আস্তে রেখে দেবেনদা তার কাপড়টা হাঁটুর ওপর তুলে কোমরে ক'ষে বেঁধে নিলেন। কাঁধের গামছাটা কাপড়ের ওপর জড়ালেন। তখন দেবেনদার চোখ দু'টো নিশাচর প্রাণীদের মত জ্বল জ্বল করে জ্বলছিল। অন্ধকার ভেদ করে তার দৃষ্টি পড়ল পুকুরের সীমানায়। জমির ওপরে নামিয়ে রাখা জালটা আবার হাতে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে পুকুরের ঢাল বেয়ে এক-পা দু-পা করে এগিয়ে গেলেন একেবারে জলের কাছে।

সুমিত ওনাকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করছিল। জলের সীমানায় পেঁছুতেই দেবেনদা ছুঁড়ে দেবার কৌশলমত দু'হাতে জালটাকে ঠিক করে নিলেন। সুমিতকে ফিসফিসিয়ে বললেন, তুই এখানে দাঁড়া, আমি পাঁচ-ছয় হাত ওদিকে গিয়ে জাল ফেলছি। জালটা জল থেকে ওঠানোমাত্র তুই কাছে আসবি।

অস্পষ্ট হলেও সুমিত দেখল, দেবেনদা একপাক ঘুরে বিশেষ কৌশলমত ছুঁড়ে দিলেন জালটা, গোলাকার হ'য়ে ঝপ্ করে গিয়ে পড়ল জলের ওপর। জলের ওপর একটা কম্পন উঠল। তা মুহূর্তমাত্র, তারপর ধীরে ধীরে জালটা অতল জলে তলিয়ে গেল এবং একটু পরেই জলটা শান্ত হয়ে গেল।

ততক্ষণে উত্তেজনায় সুমিত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দেবেনদার দিকে এগিয়ে গেল সে। গিয়েই দেখতে পেল দেবেনদার চোখে মুখে খুশী খুশী ভাব। জালের দড়িটা একটু একটু নাড়া দিয়ে নিচু হ'য়ে কি যেন বুঝতে চেষ্টা করছেন। একটু টেনেই আবার থেমে গেলেন দেবেনদা।

ভয়ে ভয়ে সুমিত জিজ্ঞাসা করল, কি হ'ল দেবেনদা ?

ঠোঁটের ওপর ডানহাতের তর্জনী ছুঁইয়ে দেবেনদা বললেন, চুপ্।

সুমিত অগত্যা ব্যাগটা হাতে ধরে বোকার মত পাশে দাঁড়িয়ে রইল। পুকুরপাড়ের কদম ফুলের গাছটা যেন একটা উলঙ্গ দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই গাছটার নীচেই ওরা দণ্ডায়মান। অবস্থাটা মনে হতেই

দেবেনদার আরও কাছাকাছি সরে এল সুমিত। এবার দেবেনদা নিচু হয়ে খুব সন্তর্পণে জালের দড়িটা টানতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যে জালের প্রথম অংশ ওনার হাতের মধ্যে চলে এল। দেবেনদা তখন পা-ভেজা জলের মধ্যে গিয়ে নেমে দাঁড়ালেন। একটু করে জালটা ছাড়ছেন, আবার একটু টানছেন। এইভাবে ধীরে ধীরে সমস্ত জালটাই প্রায় ওনার হাতের মধ্যে এসে গেল। হঠাৎ এই সময় জলের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করে কি যেন একটা নড়েচড়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে সকল ভয় ভীতি কেটে গেল। যেন এক বিজয়ের আনন্দ মনের মধ্যে চেপে বসল। সুমিতও জলের কাছে এগিয়ে গেল।

ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল সুমিত, বড় কিছু উঠেছে মনে হচ্ছে।

দেবেনদা নীচু গলায় বললেন, হ্যাঁ, একটু ভারী ভারীই তো লাগছে।

ভারী ভারী লাগলে কি হয় সেটা সঠিক বোঝার ক্ষমতা না থাকলেও সুমিত বুঝতে পারলো যে মাছ ধরা পড়েছে।

এবার দেবেনদা জালটা চট্‌ করে টেনে তুলে পাড়ের ওপর ফেললেন। জালটার মধ্যে তখন কিছু কি একটা যেন ঝটপট্‌ করে লাফাচ্ছিল। দেবেনদা একটু একটু করে জালটা ঝাড়তে শুরু করলেন। কিছু শামুক, কিছু ঝিনুক, কয়েকটা পচা পাতা আর কাদা জায়গাটার ওপর ছড়িয়ে পড়ল। তারই মধ্যে ছোট ছোট মাছগুলি ছটফট করে নড়ছিল।

দেবেনদার নির্দেশে হাতের ব্যাগের মুখটা খুলে মেলে ধরল সুমিত। একটা একটা করে মাছগুলি ধরে উনি ব্যাগের মধ্যে ফেলে দিতে লাগলেন।

এমন রোমাঞ্চকর দৃশ্য এর আগে কখনও দেখেনি সুমিত। খুব ভালই লাগছিল তার। জালটা ঝাড়তে ঝাড়তে হঠাৎ একটা কাত্‌লা মাছ জাল থেকে ছিট্‌কে উঠে ধপাস করে মাটিতে পড়ল।

দেবেনদা বললেন, এই সেই ভারী মাছটা। প্রায় দেড় সের ওজন হবে।

মাছটা ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেই সুমিত দু-একবার ব্যাগের মুখটা খুলে আবছা অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করল।

দেবেনদা ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বললেন, ব্যাগের মুখটা শক্ত করে ধরে রাখ, নতুবা পালিয়ে যাবে।

শক্ত করেই ব্যাগের মুখটা চেপে ধরল সুমিত। দৃঢ়চিত্তে সে তখন

ভাবছিল যে কোনমতেই ঐ বড় মাছটাকে পালিয়ে যেতে দেবে না। আরও কয়েকবার জাল ফেললেন দেবেনদা। ছোট বড় মাঝারি নানা সাইজের মাছে ভর্তি হ'য়ে গেল সুমিতের ব্যাগটা। আনন্দের আবেগে সকল রকম ভয়ের ভাবনাই তখন তার চাপা পড়ে গেল। কুয়াশা ইতিমধ্যে ফিকে হয়ে যেতেই রাতটাও যেন প্রভাতী আলোর মত পরিষ্কার হ'য়ে গেল।

এইবার শেষ বার। আর মাছ না পেলেও চলবে। তবু যদি এই শেষ বারে দু'একটা জুটে যায় তো মন্দ কি। এই রকম ভেবে দেবেনদা জালটা ছুঁড়ে মারতেই একটা অঘটন ঘটে গেল।

কাছের জমিদার বাড়ির ভেতর থেকে একটা হুমকি ভেসে এল : কেরে, কে পুকুরে মাছ ধরছে ?

সংগে সংগে ঐ বাড়ির দোতলা থেকে একটা জোরালো টর্চের আলো এসে পুকুরের পাড়ে আছড়ে পড়ল। সমস্ত পুকুর পাড়ে সেই সন্ধানী আলোটা ঘুরতে লাগল।

দেবেনদা জালটা গুটিয়ে তোলবার কোনরকম চেষ্টা না করে সুমিতের হাত ধরে দ্রুত পুকুরের ঢালের এক কোণে একটা ঝোপের আড়ালে মাথা নীচু করে বসে পড়লেন। জালের লম্বা দড়িটা ওনার হাতে ধরাই রইল।

দূর থেকে টর্চের সন্ধানী আলো তাদের খুঁজে পেলো না। তবু জমিদার বাড়ির লোকরা বোধহয় নিশ্চিন্ত হতে পারল না। একটু পরেই লোকরা হাতে টর্চ নিয়ে এগোতে লাগল পুকুর পাড়ের দিকে।

দেবেনদা অবস্থাটা লক্ষ্য করলেন। তাড়াতাড়ি তার হাতের জালের দড়িটা একটা জংগলা গাছের সংগে বেঁধে দিলেন। নিজে পাশের কদমফুল গাছের গোড়ায় লুকিয়ে পড়লেন। সুমিতকে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, এই, তোর জামা-প্যাণ্টটা শিগ্গির খুলে ফেল।

খুলে ফেলার ব্যাপারে একটু গাঁইগুঁই করতে লাগল সুমিত।

দেবেনদা বললেন, যা বলছি শিগ্গির কর, নইলে এবার ধরা পড়তে হবে। আর ধরা পড়া মানেই, ওরা এমনি ছেড়ে দেবে না। মারধোর তো করবেই, উপরন্তু শিবিরের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মহাশয়ের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে। বিরাট বিপত্তি ঘটবে তাতে।

এসব শুনে ভয় পেয়ে গেল সুমিত। খুলে ফেলল তার জামা ও প্যান্ট।

দেবেনদার পরবর্তী নির্দেশ হ'ল : এবার তুই চার হাত পায়ে ভর করে পুকুরের পাড়ে নীচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক। যেইমাত্র ওদের টর্চের আলো পুকুরের পাড়ে এসে হাজির হবে অমনি তুই উল্টো মুখো হ'য়ে তোর শরীরের পিছনের দিক ওদের সামনে রেখে আস্তে আস্তে ওদের দিকে এগোতে থাকবি। বুঝলি তো ব্যাপারটা ? ভয় নেই, আমি তো কাছেই আছি। পিছনমুখো হ'য়ে ওদের দিকে এগোলে দেখবি কি মজা হবে।

মাছভর্ত্তি ব্যাগটা দেবেনদার হাতে দিয়ে ওনার নির্দ্দেশমত উলংগ হয়ে চার হাতপায়ে ভর করে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে রইল সুমিত। ওদিকে জমিদার বাড়ি থেকে দু'জন লোক টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে পুকুর পাড়ে এসে হাজির। তারা টর্চের আলো দিয়ে পুকুরের চারদিক দেখতে লাগল।

এদিকে তো ভয়ে সুমিতের প্রাণটা দুরদুর করছে। কিন্তু পালাবার আর উপায় নেই। খোঁড়া দেবেনদা তো ছুটতেও পারবেন না। তবু দেবেনদার নির্দেশ মাথায় রেখে কাঁপতে কাঁপতে পুকুরের দিকে মুখ করে সুমিত অমনিভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ একবার টর্চের আলোটা এসে তার নীচু হয়ে থাকা উলঙ্গ দেহের পশ্চাৎ অংশে পড়ল। অমনি সে পিছনের দিক তার দু'পায়ের ওপর রেখে উল্টো হামাগুড়ি দিতে দিতে লোকগুলির দিকে এগোতে লাগল।

এবার টর্চের আলোটা যেন স্থির হ'য়ে রইল কিছুক্ষণ। পরমুহূর্তে ওদেরই কে একজন হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, ওরে বাবা, ওটা কিরে !

সুমিত কিন্তু থামল না, ঐভাবে ওদের দিকে তবু এগোতে লাগল, সুমিতের গোটা শরীর ওরা দেখতে পাচ্ছে না, দেখছে শুধু ওর পিছনের অগ্রসরমান অংশটা।

অন্য লোকটি বলল, তাইত ! মাথামুণ্ডু কিছু নেই, অথচ মনে হচ্ছে যেন চারপেয়ে—

তারপরই ওরে বাবারে, গেলুমরে, মলুমরে, বাঁচাও—বাঁচাও বলতে বলতে লোকদুটি উল্টোমুখে লাগাল ছুট। ছুটতে ছুটতে একেবারে জমিদার বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকে সদর দরজায় খিল লাগিয়ে দিল। মাছ-চোর ধরা মুহূর্তেই শেষ হয়ে গেল ওদের।

সুমিতের আর এগোতে হ'লো না। সে উঠে দাঁড়াতেই কদমফুলের গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দেবেনদা ওর জামা-প্যান্টটা এগিয়ে

দিলেন। ওগুলি আবার পরে নিল সুমিত। তার কোনরকম ভয় আর এখন নেই। জমিদার বাড়ির লোকরাও আর আসবে না।

দেবেনদা ধীরে ধীরে জালটাকে গুটিয়ে তুললেন। এবারও প্রচুর মাছ ধরা পড়ল। মাছের ব্যাগটা কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেল।

জালটা জলে ধুয়ে নিতে নিতে দেবেনদা বললেন, আর না, এবার বাড়ি চল্।

ব্যাগটা সুমিতের হাতে তুলে দিলেন তিনি। আনন্দের সঙ্গেই ব্যাগটা হাতে নিয়ে, দেবেনদাকে অনুসরণ করে বাড়ির পথে চলল সুমিত। ঘেঁষাঘেষি গাছগুলির তলায় জমাটবাঁধা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে সুমিতের মনে পড়ল তার মায়ের কাছে শোনা কথাটা ঃ রাত্রে মাছ দেখলে মেছো-পেত্নী পিছন নেয়।

ভয়ে ভয়ে তাই সে এক একবার মাথাটা ঘুরিয়ে পিছনটা দেখে নিচ্ছিল। মনে মনে তার অবশ্য সঙ্কল্প ছিল যে কিছুতেই হাত থেকে ব্যাগ ছাড়বে না। সজোরে ব্যাগের হাতল দুটো ধরে রাখল।

রাতের ঘন অন্ধকারে এইভাবে সকলকে ফাঁকি দিয়ে দেবেনদার সঙ্গে সুমিত এসে বাড়ি পৌঁছল। মা তখনও বিছানায় শুয়ে জেগে জেগে প্রহর গুনছেন। কখন ওরা আসবে, এই তার একমাত্র চিন্তা। দরজায় টোকা দিতেই মা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। দরজা খুলে সুমিতকে দেখামাত্র বললেন, এতো দেরি করলি বাবা। কত রাত হয়েছে জানিস ? না, আর কোনদিন যেতে হবে না। এখন শুয়ে পড়লে উঠবি কখন ?

মায়ের কথা সত্যি। তখন মাঝরাতের দেড়টার ট্রেনটা কলকাতা থেকে এসে ধুবুলিয়া স্টেশনটা ছুঁয়ে মালার মত আলোর রেখাগুলি নিয়ে মাঠের বুক চিরে চলে যাচ্ছে দেখা গেল। ঐ ট্রেনটা দেখেই সুমিত বুঝতে পারল যে রাত দেড়টা বাজে। মুখ-হাত-পা ধুয়েই শয্যা নিল সে। সত্যিই, সেই দিনের শেষ রাত্রে উঠে আর তার পড়া হ'ল না। এতো রাত অবধি জেগে থাকায় ক্লান্তির ঘুমে আচ্ছন্ন মা সে রাতে তাকে সময়মত ডেকে তুলতে পারলেন না।

সকাল হতেই মায়ের মুখে আবার মৃদু ভর্ৎসনার সুর বেজে উঠল ঃ মাছ খেলেই দিন যাবে ? মাছ খাবার অনেক দিন পাবি, আসল কাজটা ফাঁকি দিস্ না খোকা।

ইতিমধ্যে দেবেনদার বাড়ি থেকে রাতের সংগ্রহকরা মাছগুলির একটা

ভাগ এসেছে। মাছগুলি বিনাপয়সায় পেয়েও মা কিন্তু খুশী হতে পারলেন না।

ঐ মাছ পেয়ে সুমিত ও তার ভাইদের সেদিন কি আনন্দ। বড় মাছ দিয়ে আজ তারা ভাত খাবে। এমন বড় মাছতো তাদের বাড়িতে এর আগে কখনো আসেনি।

এমনি নানা সুখদুঃখের মধ্যে দিয়েই সুমিতদের দিন কেটে যাচ্ছিল। সে সময়কার বৈচিত্রময় অনেক ঘটনার মতই আরো একটা ঘটনার কথা তার মনে পড়ে। বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা আজো সে খুঁজে পায়নি।

তাদের পাড়ায় তখন ডিফেন্স পার্টির পাহারা চলছে। বিরাট রাণওয়ের পাশেই পাঁচ নম্বর গ্রুপটা অবস্থিত। এই গ্রুপে দুই সারি করে ঘর। দুই সারির মাঝখানের জায়গাটা চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাতের মতো চওড়া হবে। এক সারি ঠিক রাণওয়েটার লাগোয়া। রাণওয়ের সমান্তরালভাবে দ্বিতীয় সারির লাগোয়া অন্য একটা সরু পিচের রাস্তা। সুমিতদের ঘরটা ছিল ঐ পিচের রাস্তার পাশে। ডিফেন্স পার্টির ওপর দায়িত্ব ছিল রাণওয়ে আর পিচের রাস্তা বরাবর দু'দিকে লক্ষ্য রাখা। দুই দিকের সারিবদ্ধ ঘরগুলির মধ্যে পাড়ার লোকদের চলাফেরায় অন্য একটা আঁকা-বাঁকা পায়ে চলা সরু পথ আপনা থেকেই তৈরী হয়েছিল। ভিতরের ঐ চলার পথটা চলে গিয়েছিল কারও ঘরের কোণ দিয়ে, কারও দরজার সামনে দিয়ে এবং কারও বা জমির মাঝ-বরাবর। পাহারাওয়ালাদের অবশ্য সর্বদিকই লক্ষ্য রাখতে হ'ত। এগুলি ছাড়া আরও একটা বড় দায়িত্ব ছিল তাদের। পাড়ার অতি সন্নিকটে অবস্থিত ছিল বাপুজী বিদ্যামন্দির। বলা চলে এ পাড়ার সংলগ্ন মাঠের প্রান্তেই ঐ স্কুল। পাড়া থেকে ওটার দূরত্ব কমবেশী কোয়াটার মাইল। দেখলেই মনে হবে ঐ স্কুলটা ঠিক ইংরাজী 'ইউ' অক্ষরের মত এবং স্কুলের মুখটা ছিল এ পাড়ারই দিকে।

স্কুল প্রসঙ্গে মা সরস্বতীর কথা মনে পড়ে। কোনো যুগে কখনও সেই মা সরস্বতী দুর্বৃত্ত দ্বারা লাঞ্ছিতা হ'য়েছেন, এমন ঘটনা বিরল। কিন্তু এই উদ্বাস্তু শিবিরে স্বয়ং মা সরস্বতী বিসর্জ্জনের সময় নিরঞ্জন মিছিলে প্রায়শই লাঞ্ছিতা হতেন। পরিচালকদের তোড়জোড়ের আতিশয্যে মা কখনও কখনও মুন্ডুবিহীন হ'য়ে স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন ক'রতে বাধ্য হোতেন। এমন সব সহৃদয় মনুষ্যকুলের হাতে পড়ে অন্য সব বিদ্যালয়ের মতই এই বাপুজী বিদ্যামন্দিরও তার নিজস্ব চেহারাটা প্রায় হারিয়ে

ফেলেছিল। একে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করবার জন্য যত প্রকার প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যায় তাই করা হ'ত। এক এক করে টিন, জানালা, দরজা ইত্যাদি খুলে নেওয়া হ'য়েছিল। এই বস্তুগুলি একদল সুবিধাবাদীর দল কিছু অর্থের বিনিময়ে অপরের হাতে চালান করে অর্থশালী হয়ে বসল। শুধু বাপুজী বিদ্যামন্দিরই নয়, উদ্বাস্তু শিবিরে সরকার বাহাদুরের দেওয়া অন্যান্য স্কুল এবং প্রতিষ্ঠানগুলি অতি অল্প সময়েই অমনি বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছিল।

বহুদিন ঘরে থাকার পর কোন দেবীমূর্তির বস্ত্র কোন অবুঝ শিশু যদি হরণ করে নেয়, তবে পূজ্য দেবীর চেহারায় যে বীভৎস দৃশ্য এবং অসংলগ্নতা ফুটে ওঠে, স্কুলটির চেহারায় সেরূপ দৃশ্যই লক্ষ্য হতে লাগল। স্কুলের দেয়াল ভেদ করে ইতিমধ্যেই আগাছা জন্ম নিয়েছিল। দাঁত বার করা ক্ষুধার্ত জন্তুর মতো ভরদুপুরেই স্কুলটাকে দেখা যেত, তেমনি রাত্রেও এর চেহারায় কি যেন এক অজানা আশঙ্কার আবহ সৃষ্টি করত। ফলে, কেউই সন্ধ্যার পর এই স্কুলে যেতে সাহস পেত না।

এই উদ্বাস্তু শিবিরে যাদের দৌরাত্ম প্রবল ছিল তাদের গোপন কার্য্য-কলাপের পরামর্শের জন্য প্রয়োজন ছিল ঐসব নিরিবিলি অঞ্চলের। ভাংগাচুরা ঐ বাপুজী বিদ্যামন্দির তাদের গোপন আস্তানাগুলির মধ্যে ছিল অন্যতম। রাত্রে ওদের সাময়িক বসবাস এবং নিরালা মিলনের কেন্দ্রস্থল হ'য়ে উঠেছিল ঐসব পড়ে থাকা পুরানো বাড়ীগুলির অভ্যন্তর। হয়তো বা এরই ফলে প্রচার ছিল যে ঐসব বাড়িগুলিতে সদাসর্বদা প্রেতাত্মাদের চলাফেরা আছে। সেই ভয়ে রাত্রে সুমিত এবং তার পাহারাদার-সংগীরা কখনও ঐ বাড়িগুলিতে পা দিত না।

কিন্তু ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, এই পাহারাওয়ালাদের ওপর দায়িত্ব ছিল রাত্রে বাপুজী বিদ্যামন্দিরের দিকে লক্ষ্য রাখার। কারণ এই স্কুলটা ছিল তাদের গ্রুপ এলাকার অধীন। সুতরাং প্রতি রাতে সমস্ত সময়ের জন্য সম্ভব না হলেও অন্ততঃ একবার প্রতিটি পাহারাওয়ালা-গ্রুপকে এই স্কুল-বাড়িটার আশপাশ দিয়ে পরিক্রমা করতে হত। একটি বারের জন্য শুধু লক্ষ্য করা যে ওখানে বিরাট কিছু অঘটন ঘটছে কিনা। তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে ওখানে যদি তেমন কিছু হয় তবে তাদের গ্রুপ-লিডারের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

প্রতি রাতে ছয়জন করে একটা গ্রুপ করে পর্য্যায়ক্রমে তারা গোটা অঞ্চলটা পাহারা দিত। এই ছয় জনের মধ্যে আবার তিন তিন জন করে দু-ভাগে ভাগ হয়ে পাড়ার বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য রাখত। কিন্তু যখন রাত প্রায় দেড়টা কি দু'টো হ'ত ছয় জন পাহারাওয়ালা তখন একটা নির্দিষ্ট-জায়গায় জড়ো হ'ত। এবার তাদের কর্তব্য হ'ত দলবদ্ধ হ'য়ে ঐ স্কুল বাড়ির দিকে এগিয়ে যাওয়া। ছয়জন এক সংগে থেকেও তারা নিশ্চিন্ত নির্ভয় হ'তে পারতো না। সকলের মনে একটা গা-ছমছমে ভয় লেগেই থাকত। ফলে তারা কথা বলতে বলতে এবং অনর্থক গল্প করতে করতে স্কুল-বাড়ির দিকে রওনা দিত। যদি কোন দুর্ভাবনার ব্যাপার-স্যাপার ওখানে লুকিয়ে থাকে এতোগুলি লোকের গলার আওয়াজ শুনলে হয়তো তা গা-ঢাকা দেবে। শুধু কি কথা আর গল্পই সম্বল ছিল তাদের? তা নয়, পথ চলার সময় দূর থেকেই তারা স্কুলবাড়ির ওপর টর্চের তীব্র আলোটা ফেলত। হাতের লাঠিগুলি দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে করতে যেতো। ফলে খট্ খট্ করে জোরে শব্দ হ'ত। এত নিরাপত্তার সজাগ দৃষ্টি সত্ত্বেও অতি ভয়ে ভয়ে স্কুলের বারান্দায় পা ফেলত তারা। পাছে ভীতি বা কাপুরুষতা প্রকাশ পায় এই লজ্জায় কেউ কারো হাত না ধরলেও প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে যেতে যেতে একটা একটা করে ঘর দেখে নিত। এইভাবে কোনমতে স্কুলের চত্বরটা দেখা হলেই তাদের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ত। লক্ষ্য রাখার বিরাট দায়িত্বটা যেন মাথা থেকে নেমে যেত।

একবার সত্যি সত্যিই পাহারা দেবার সময় ঐ স্কুলে একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। মনে হলে আজও সুস্মিতের শিহরণ জাগে এবং অবাক হয়ে ভাবতে থাকে কি করে এমন ব্যাপারটা ঘটেছিল।

সে রাতটা ছিল অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার। অতল জলধীর মত চারিদিক শুধু কালোর আস্তরণ। একটু দূরের কিছুই তাদের নজরে আসছিল না। পরিবেশের প্রভাবেই বোধ হয় স্থমিতের কেবলি মনে পড়ছিল এই নিশিথেই নাকি দৈত্যদানবের দল অবাধে চলাফেরা করে। তার মায়ের কাছে শোনা ভূত-প্রেতের গল্পগুলি ঘুরে ঘুরে মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারছিল।

রাতের প্রথম দিকটায় তবুও তারা ছ'জন টর্চ আর লাঠির দাপটের ওপর ভরসা করে পাড়ার মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল। পাড়ায়

তাদের একটা বড় ভরসা আছে, চিৎকার করলে অন্ততঃ পাড়ার লোকজন উঠে পড়বে, প্রয়োজন হলে ছুটেও আসবে। তাই যতই ভয় থাক, পাড়ার মধ্যে সামলে নিতে অসুবিধা নেই, প্রথম রাতটায় তাদের তেমন অসুবিধা হলও না।

পাড়ায় চক্কর মারতে মারতে হঠাৎ তারা লক্ষ্য করল দূরে মাঠের ওপর দিয়ে রাত দেড়টার সেই ট্রেনটা ধুবুলিয়া ছেড়ে মুড়াগাছার দিকে যাচ্ছে। অর্থাৎ এখন মাঝ-রাত।

ট্রেনটার দিকে লক্ষ্য পড়তেই গ্রুপ লিডার দেবেনদা বললেন, এবার একবার স্কুল-বাড়িটায় যাওয়া দরকার।

কথাটা শুনেই সকলে যেন চমকে উঠল। কে একজন ভয়ে ভয়ে বলল, আজ আর স্কুল-বাড়ি যাওয়ার দরকার নেই। প্রায় ভোর তো হয়েই এসেছে, এই অল্প সময়ের জন্য ওখানে গিয়ে কি লাভ?

লিডারের মন মানল না। না না বলে আমতা আমতা করতে লাগলেন। একটু পরে তিনি বললেন, একবার গেলে হ'ত। সকলে মিলে যাবো, কোন ভয় নেই।

লিডারের কথা শুনে পাহারাওয়ালা সংগীরা কেউ কিছু বলল না। সবাই চুপ করে থেকে পক্ষান্তরে দেবেনদার বক্তব্যের বিরোধীতাই করল।

দেবেনদা তার দায়িত্বের কথা ভেবে বললেন, একবার কিন্তু যাওয়া উচিত, নতুবা যদি একটা কিছু ঘটে যায় তাহলে থানায় কৈফিয়ৎ দিতে দিতে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে।

থানার কথাটা শুনে সকলেই চমকে উঠল। সরকারি সাহায্যেই বেঁচে আছে তারা। রাতে নিজ নিজ অঞ্চল পাহারা দেওয়াটা সেই সরকারেরই নির্দেশক্রমে করতে হচ্ছে। এই কর্তব্যটুকু পালন করতে অবহেলা করলে তারা বিতাড়িত হতে পারে। এইসব নানান প্রশ্ন তাদের মনে জেগে উঠতে লাগল। তবু ভয়কে মন থেকে তারা মুছে ফেলতে পারছিল না।

দেবেনদাকে একবার বলল সুমিত, আজকের রাতটা অমাবস্যার। চারিদিক অন্ধকার। আর এখনতো মাঝ-রাত, এই সময় ওখানে যাওয়াটা কি সমীচীন হবে?

অন্য সব সঙ্গীরা প্রকাশ্যে কিছু না বললেও আকারে ইঙ্গিতে ওখানে না যাবার জন্য ভাবভঙ্গি প্রকাশ করল।

দেবেনদা পড়লেন সমস্যায়। এইসব ছোট ছেলেদের জোর দিয়ে কিছু বলতে পারছেন না, অথচ নিজের কর্ত্তব্যকেও এড়াতে দ্বিধা হচ্ছে। এই উভয়সঙ্কট অবস্থায় পড়ে তিনি ইতঃস্ততত করছেন, এমন সময় বিজয় নামে দলের এক ছেলে বলে বসল : থাক্ থাক্, তোদের মুরদ জানা আছে তোদের কাউকে যেতে হবে না, আমি একাই যাব।

ওর কথা শুনে সুমিতরা সকলেই সমস্বরে হেসে উঠল।

হাসি শুনে বিজয়ের বোধ হয় আঁতে ঘা লাগল, বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল বিজয় এবং স্কুল-বাড়ি একা যাবার জন্য বিতর্ক শুরু করে দিল।

বিজয় দুঃসাহসী ছেলে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবু এমন একটা কাজ ওর পক্ষে একা করা সম্ভব নয়, উচিৎও নয়। গ্রুপ লিডার দেবেনদাও চান না যে ও একা যাক। সুমিতরা ওকে একা যেতে দেবে না বলে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, ও কিন্তু একাই যাবে বলে জিদ ধরল।

কোন কথা বা যুক্তি দিয়ে ওকে যখন নিরস্ত্র করা সম্ভব হল না তখন ঠিক হ'ল যে দলের সবাই স্কুল-বাড়ির পাশ দিয়ে সোজা এগিয়ে আসা রাণওয়ের ওপর থাকবে। ও একাই যাবে। ওর সঙ্গে থাকবে একটা বল্লম। সমস্ত রাস্তাটাই ও টর্চ জ্বালাতে জ্বালাতে চলবে যাতে সুমিতরা ওর গতিবিধি রাস্তা থেকে লক্ষ্য রাখতে পারে। উপরন্তু স্কুল-বাড়িতে পেঁৗছে ও যেন হাঁক দিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে।

বিজয়ের যতটা নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী সজাগ দৃষ্টি ওর ওপর রাখার চেষ্টা করল সুমিতরা।

স্কুল-বাড়িটা রাস্তা থেকে একেবারেই সোজা। ফলে, চলমান ঐ আলো বা ওর গতির লক্ষ্যপথে কোন বাধাই নেই। সুমিতরা পাঁচজন তখন রাস্তার ওপর টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বিজয় মুখ ঘুরিয়ে স্কুল-বাড়ির দিকে তাকাল একবার। পর মুহূর্তেই হাতে বল্লম এবং টর্চটা তুলে নিল। তার হাতের টর্চটা জ্বলে উঠল। সদর্পে স্কুল-বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল সে।

সুমিতরা তাদের হাতের টর্চ জ্বালিয়ে ওর পথকে দেখতে সামান্য সাহায্য করল।

পাথরের রাস্তা পেরিয়ে মাটির পথে পা দিয়েই একবার উল্টো দিকে ঘুরে নিজের টর্চের আলোটা সুমিতদের মুখে ফেলে বিজয় উচ্চকণ্ঠে বলল, দেখিস্, তোদের যেন শিয়ালে না কামড়ায়।

সংকুচিত পাহারার ছোট দলটি ঐ বিদ্রূপের কোন সদুত্তর দিতে পারল না বটে, তবে উৎসাহ দিয়ে বলল, ভয় নেই—কোন অসুবিধা মনে করলেই হাঁক দিবি, আমরা সবাই ছুটে যাবো।

থাক্ থাক্, নিজেদের সামলা—এই বলে আবার মুখ ঘুরিয়ে পথ চলতে লাগল বিজয়।

ওর টর্চের আলোটা মাটির রাস্তার ওপর মাঝে মাঝে পড়ছিল। নিঃশব্দে তা লক্ষ্য করছিল সুমিতরা।

পথ চলতে চলতে চারিদিকের মাঠ-ঘাট টর্চের আলোয় দেখে নিচ্ছিল বিজয়। ওর টর্চের তীব্র আলোয় মাঠের জংলা গাছগুলিও দেখা যাচ্ছিল।

ধীরে ধীরে পাহারার দল ও বিজয়ের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে লাগল। আলোর রশ্মি কিছু পরে ক্ষীণ হ'য়ে এল, তবু আলোটা একেবারে চোখের আড়াল হ'ল না। স্কুলটা তাদের দৃষ্টিপথের সোজাসুজি অবস্থিত বলেই ঐ ক্ষীণ আলোটা একেবারে অদৃশ্য হতে পারল না।

দেখতে দেখতে বিজয় অনেকটা পথ এগিয়ে গেল। দলের সকলে আন্দাজেই বুঝতে পারছিল যে এবার ওর সামনে পড়েছে একটা খেলার মাঠ। এই মাঠে একসময় ছাত্র-ছাত্রীরা দিনের বেলা স্কুলের অবসর সময় খেলা করত। ঐ মাঠ থেকে আর মাত্র একশ' গজ এগোলেই স্কুল-বাড়িতে পৌঁছবে। তবে তো পৌঁছেই গেল বিজয়।

মুখে না বললেও মনে মনে বিজয়ের সাহসিকতার জন্য তারিফ না করে পারছিল না সুমিত। ওদিকে নিজের বীরত্বকে আরও জোরালো করে দেখাবার জন্য বিজয় যেন ধীর মন্থর গতিতে সমস্ত মাঠটা পরিক্রমা করল একবার। ওর হাতের জ্বালানো টর্চের আলোর ইতঃস্ততঃ গতিটা বুঝিয়ে দিল সেকথা। শেষবারের মত আলোটা ঘুরিয়ে দিল দলের দিকে। প্রত্যুত্তরে সুমিতরাও তাদের টর্চের আলো দিয়ে ওকে উৎসাহের ইঙ্গিত দিল এবং ওকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিল নির্ভয় হবার জন্য তাদের সহযোগিতামূলক অবস্থিতি।

সুমিততো উৎসাহে উত্তেজনায় চেঁচিয়ে বলেই ফেলল, সাবাস্ ব্যাটা। কিরে—আসবো ?

বাঁশী বাজিয়ে নিজ দায়িত্বের সচেতনাকে প্রকাশ করলেন লিডার দেবেনদা।

বিজয় কিন্তু ওদিক থেকে জোর গলায় বিদ্রূপ করেই বলল, যা-যা,

তোরা বাড়ি গিয়ে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পর। জানটার জন্যে তো তোদের ভীষণ ভয়।

এই শুনে সুমিতদের মুখে আর কোন কথাই সরল না। বোকার মত তারা নিজেদের টর্চ জ্বালিয়ে মাঝপথেই দাঁড়িয়ে রইল। যদি তাদের আলোটা দেখলে বিজয় একটু ভরসা পায়।

একটু পরেই তারা দেখতে পেলো বিজয়ের টর্চের আলোটা যেন ঘুরে গেল। সেই আলোটা গিয়ে পড়ল স্কুল-বাড়ির দেওয়ালে। দেওয়ালটায় আলো পড়ে চারিদিকে ছিট্‌কে পড়ছিল। পর মুহূর্তে সমস্ত দেওয়ালটাই আলোয় আলোময় হয়ে গেল। এবার ঐ আলোটা একটু নড়ে চড়ে স্কুল-বাড়ির বারান্দায় পড়ল। মনে হ'ল একবার দূরে থেকেই বিজয় নিজের আলোটা ঘুরিয়ে সমস্ত স্কুল-বাড়িটাকে দেখে নিচ্ছে। বোঝা গেল ধীরে ধীরে মাঠটা পেরোচ্ছে বিজয়। স্কুল-বাড়ির একেবারে সামনাসামনি হ'ল সে। রুদ্ধশ্বাসে তারা দেখল যে বিজয়ের আলোটা আরও তীব্রভাবে স্কুল-বাড়িটাকে গ্রাস করল।

এরপর বিজয় একটা পা উঁচিয়ে যেন স্কুলের বারান্দায় উঠে পড়ল। এখন ওকে স্কুলের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরতে হবে 'ইউ'-এর মত আকারের জায়গাটা।

সুতরাং রাস্তার দিকে মুখ করা স্কুলটাকে পরিস্কারভাবে লক্ষ্যে রাখতে পারছিল সুমিতরা। বিজয়ের স্কুল-বারান্দায় চলার গতিও টর্চের চলমান অলোর ইঙ্গিতে বুঝতে পারছিল তারা।

স্কুল-বারান্দায় উঠেই বল্লমের লাঠিটা দিয়ে প্রথমে বারান্দায় আঘাত করল বিজয়।

ঐ আঘাতের জোর আওয়াজটা তাদের কানে এসে বিঁধল। আশ্বস্ত হ'ল তারা।

আরও বেশী বেশী লাঠির আওয়াজ করে বিজয় এগোচ্ছিল। এবার ওর টর্চের আলোটা গিয়ে পড়ল স্কুলের ঘরগুলির ভিতর। দরজা-জানালা বিহীন ভাঙ্গা ঘরগুলি থেকে আলোর আভাস মাঝে মাঝে বাইরে বেরিয়ে আসছিল।

এমনিভাবে একটা একটা করে প্রতি ঘরে আলো ফেলতে লাগল বিজয়। এক একবার হাঁক দিয়ে ওর সাফল্যের কথা বোঝাতে চেষ্টা করছিল। প্রত্যুত্তরে তারাও বিজয়কে হাঁক দিয়ে উৎসাহিত করছিল।

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সঙ্গবদ্ধ দৃষ্টি ফেলে সুমিতরা বেশ বুঝতে পারছিল যে বিজয় একটা একটা করে ঘর দেখে যাচ্ছে এবং একটু একটু করে পাশের বারান্দার ওপর দিয়ে এগোচ্ছে। স্কুলের অর্ধেকটা ঘুরে ওর দেখা প্রায় শেষ হয়ে এল।

এদিকে সুমিতরা অনুচ্চ কণ্ঠে ওর বীরত্বের জন্য বাহবার কথা বলছে। এমন সময় হঠাৎ বিজয় একটা চিৎকার করে উঠল।

সেই চিৎকার শুনে সচকিত হয়ে সুমিতরা সকলেই স্কুল-বাড়ির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। ভয়ার্ত চোখেই তারা দেখল বিজয়ের হাতের টর্চটা ছিটকে পড়ল মাটির ওপর। মাটিতে পড়ে টর্চটা দুলতেই লাগল। আশ্চর্য্য! টর্চের আলোটা কিন্তু নিভে গেল না। বোধ হয় ও সুইচটা ফিকস্ট করে নিয়েছিল। তাই মাটিতে পড়ে আলোটা হেলে দুলে চারিদিকে ঘুরতেই লাগল। অথচ বিজয়ের আর কোনো সাড়া নেই। কি হ'ল ওর?

দেবেনদা অনুমান করলেন অঘটন কিছু একটা ঘটেছে। সজোরে বাঁশি বাজিয়ে দিলেন তিনি। বললেন, চলো, সবাইকে এখনি স্কুলে যেতে হবে।

সকলেই এক সাথে নিজের নিজের টর্চগুলি জ্বালিয়ে লাঠি-বল্লম হাতে নিয়ে ছুটে চলল স্কুল-বাড়ির দিকে। যেতে যেতে তারা চিৎকার করে বলতে লাগল—ধর ধর

তাদের ধারণা হয়েছিল বিজয় বোধ হয় ওখানে লুকিয়ে থাকা সমাজ-বিরোধীদের হাতে পড়েছে। এই সম্মিলিত চিৎকার শুনলে ওরা হয়তো ভয় পেয়ে বিজয়কে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে।

ভয়ভীতি ভুলে গিয়ে সুমিতরাও তাই চিৎকার করতে করতে ছুটে গিয়ে হাজির হ'ল স্কুল-চত্বরে। আরে একি! বিজয়ের টর্চের আলোটা যে মাটিতে পড়ে এখনও জ্বলছে। বিজয় তাহলে গেল কোথায়? চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। এখানে দ্বিতীয় কোনো প্রাণী আছে বলে ত মনেই হচ্ছে না। তবে?

সুমিতদের দলের একজন চট্ করে জ্বলন্ত টর্চটাকে হাতে তুলে নিল। সবাই এক সাথে লাফিয়ে উঠে পড়ল স্কুলের বারান্দায়। মেঝেয় হাতের লাঠি এবং বল্লমের আঘাত দিতে দিতে সতর্ক অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলে খানিকটা এগোল। মাঝে মাঝে 'কে—কে' বলে চিৎকার করে চারিদিকে

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আলো ফেলতে লাগল। এই মুহূর্তে বিজয়কে খুঁজে বার করতেই হবে। দেবেনদার ঐ কড়া নির্দেশে তারা মরিয়া হ'য়ে দ্রুত গতিতে গিয়ে স্কুলের মাঝামাঝি পেঁাছে গেল।

ওখানে পেঁাছে যা দেখল তাতে তো তাদের চক্ষু একেবারে ছানাবড়া। স্কুলের-বারান্দায় টর্চের আলো ফেলতেই দেখতে পেলো বিজয় মেঝের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে। পাশেই পড়ে আছে ওর বল্লমটা। বিজয়ের কোনো সাড়া নেই, হাত-পা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। বিজয়ের সারা গায়ে টর্চের আলো ফেলে উৎকণ্ঠিত হয়ে সকলে আঘাতের চিহ্ন উদ্ধার করার চেষ্টা করল। কিন্তু কৈ—কোথাও তো কোন আঘাতের চিহ্নমাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে ওদের মধ্যে দু-তিন জন দেবেনদার নেতৃত্বে সমস্ত স্কুলটা ঘুরে দেখে নিল। কোথাও কোনো জনমানবের চিহ্নটুকুও দেখতে পেল না তারা।

অগত্যা দেবেনদা নির্দেশ দিলেন, ওকে এখান থেকে নিয়ে চল।

নির্দেশমত সকলে ধরাধরি করে বিজয়কে কাঁধে নিয়ে অদূরের বড় রাস্তার দিকে এগোতে লাগল। তাদের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে পাশের গ্রুপের পাহারায় নিযুক্ত যুবকের দলও দ্রুত এসে উপস্থিত হল। সকলের সাহায্য নিয়ে জ্ঞানহারানো বিজয়কে রাস্তার ওপর বয়ে আনা হল। ওকে টান করে রাস্তায় শুইয়ে দিলেন দেবেনদা।

গভীর অন্ধকার। শীতের প্রকোপও বেশ অনুভূত হচ্ছে। বিজয়ের কিজন্যে এমন অবস্থা হল তার কোনো কারণই তারা খুঁজে পাচ্ছিল না। অথচ বিন্দু বিন্দু অস্পষ্ট ঘাম বিজয়ের সমস্ত মুখমণ্ডলে দেখা যাচ্ছে। দেবেনদা একবার ওর হাতটা তুলে নাড়ীটা বোঝার চেষ্টা করলেন। গ্রুপের যুবকরা সকলে মিলে ওকে ঘিরে বসে পড়ল।

একটু সময় গভীর চিন্তা এবং মনযোগ সহকারে ওর নাড়ীটা দেখে দেবেনদা বললেন, না—তেমন ভয়ের কিছু নেই, শরীর ওর সুস্থই আছে। তবে, কি করে ও অজ্ঞান হয়ে গেল এবং অমন ভয়ার্ত চিৎকারই বা করল কি দেখে তা তো বোঝা যাচ্ছে না।

এবার দেবেনদা মুখটা ঘুরিয়ে বললেন, একটু গরম দুধ পেলে ভাল হত।

এতো রাতে দুধ পাবে কোথায়? তবু এই বিপদে পিছু-পা হবার উপায় নেই। মনে তাদের নানান প্রশ্ন জেগে উঠছিল। ভোর হলে পাড়ার

লোকদের ব্যাপারটা সম্বন্ধে কি জবাব দেবে তারা ?

দু'জন ছুটে গেল কাছাকাছি নাগবাবুর গোয়ালঘরের দিকে। ডেকে তোলা হ'ল ওনাকে। উনি বয়োবৃদ্ধ লোক। ঘটনাটা শুনেই তাড়াতাড়ি একটা বাটি নিয়ে গোয়ালঘরে ঢুকলেন। মুহূর্তমধ্যে বাটিভর্তি দুধ সংগ্রহ করে কয়েকটা পাটকাঠি জ্বালিয়ে দুধটা গরম করে নিলেন। গরম দুধসহ নাগবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তারা আবার এসে হাজির হ'ল বিজয়ের কাছে। নাগবাবুর হাতে ছিল একটা হ্যোরিকেন। সেই হ্যোরিকেনটা নিচু করে কাউকে কিছু না বলে তিনি অভিজ্ঞ হাতে বিজয়ের চোখের পাতটা টেনে একবার দেখে নিলেন। তারপর বললেন, একটু গরম কাপড় দিয়ে ছেঁক দাও।

দেবেনদা তার কোমরে জড়ানো গামছাটা খুলে হ্যোরিকেনের ওপর রেখে গরম করে ছেঁক দিতে লাগলেন। কিছু সময় পরে বিজয়ের মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে এল এবং হাত-পা একটু একটু টান করতে শুরু করল। আরও খানিকক্ষণ পরে ওর মাথাটা একটু নড়ে উঠল। একবার ও জিহ্বাটা বের করে ঠোঁটে বুলাতে লাগল। এই ভাবভঙ্গী দেখে ওর পিপাসা পেয়েছে বুঝতে পেরে নাগবাবু এবার গরম দুধটা খাইয়ে দিলেন। গরম দুধ পেটে পড়তেই ওর জীবনটা যেন ফিরে এল।

ওঃ মাগো—বলে চোখ খুলে তাকাল বিজয়। সুমিতদের কাছে বসে থাকতে দেখে এবং কথাবার্তার শব্দে ও যেন ভরসা পেল। একটু ঘুরে শুতে চেষ্টা করল। ওর জ্ঞান ফিরেছে বুঝে সুমিতদের মনে জোর এল।

তারপর চুপচাপ বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। তারা দেখল দূরে মাঠের মধ্য দিয়ে রাত তিনটায় ট্রেন চলে যাচ্ছে। তারা অনুভব করল প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে বিজয়ও প্রায় স্বাভাবিক হ'য়ে গেছে। একটু আধটু কথাও বলছিল সে।

কিছু সময়ের মধ্যেই বিষয় সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠল। বোঝা গেল, কেমন যেন লজ্জা ওকে আচ্ছন্ন করেছে। তবু, কেউ কিছু ওকে বলতে চাইছিল না। তখনও নাগবাবু তাদের সঙ্গে থেকে বিজয়ের শুশ্রূষা করছিলেন। বিজয় সম্পূর্ণ সুস্থ হতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে, তোর কি হয়েছিল ?

প্রথমে লজ্জায় কথা বলতে পারল না বিজয়। ওর হাবভাবে তা বিশেষভাবেই প্রকাশ পেল। তবু ব্যাপারটা জানতে সকলেরই আগ্রহ।

বলার জন্যে ওকে পিড়াপিড়ী করতে লাগল সকলে।

এবার বিজয় পদ্মাসন করে সকলের মধ্যমনি হয়ে বসল এবং বিড় বিড় করে বলতে লাগল—

একটা একটা করে ঘরগুলি দেখছিলাম। কোন অসুবিধাই আমার হয়নি। স্কুলের মাঝ-বরাবর যেতে একটা ঘরে টর্চের আলোটা ফেলতেই দেখলাম লাল চওড়া পাড়ের কাপড় পরা একজন মহিলা স্কুলের দেওয়ালের ওপর বসে আছে। তার পা দুটো ঝুলছে। সেই লম্বা পা দুটো এসে পড়েছে স্কুলের মেঝে পর্যন্ত। তা লম্বা প্রায় দশ-বারো ফুট হবে। চমকে উঠলাম। দ্রুত টর্চের আলো ফেললাম ওপরের দিকে। দেখলাম মহিলার কপালে বিরাট একটা সিঁদুরের ফোঁটা। জ্বলজ্বল করছে তার চোখ। চোখমুখের আকৃতিটাও বিরাট বড়। সব দেখে মনে হল মহিলাটি কম করে কুড়ি ফুট লম্বা হবে। তার মুখে টর্চের আলো পড়তেই ঝকঝকে সাদা দুপাটি দাঁত বের করে খিলখিল করে হেসে উঠল সে। দাঁতগুলি যেন এক একটা কোদালের ফলার মত। তার হাসির বিভৎস আওয়াজ আমার কানে এসে বিঁধল। থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলাম আমি। আমার মাথার মধ্যে এক অসহ্য যন্ত্রনা অনুভব করলাম। তার চোখ থেকে ঠিক্‌রে আসা আলো যেন আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত হ'ল। ভয়ে একবার চিৎকার দিলাম। কিন্তু আর দ্বিতীয়বার চিৎকার দেবার সুযোগ পেলাম না। তারপর আর আমি কিছুই জানিনা। এমন অঘটন যে সত্যি সত্যি ঘটতে পারে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে আজ আমি শিখলাম।

ভারতীর সাড়া-জাগান সান্নিধ্যের পাশাপাশি দেবেনদার সংগে মাছ ধরতে যাওয়া বা ডিফেন্সপার্টির সংগে পাহারা দিতে গিয়ে ঐ রকমের অদ্ভুত সব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়াটা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক হ'লেও পারিবারিক প্রয়োজনের আসল দিকটার ওপর নজর রাখতে হ'য়েছিল সুমিতকে। এত সব চমকপ্রদ ব্যাপারগুলো মন থেকে মুছে ফেলে সময়মত আবার পড়ার টেবিলে বসে তাকে পড়াশুনায় মন দিতেই হ'ত।

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা ধীরে ধীরে খুব কাছে চলে আসছে। সুমিতের প্রস্তুতিও চলছে পুরোদমে। এবার তার কতকগুলি প্রয়োজনীয় বই কেনা দরকার। আর কিছু না হোক, দু'টো ডিক্‌সেনারি এবং একটা টেস্টপেপার। অথচ মায়ের কাছে এমন সম্বল নেই যে এর ব্যবস্থা করেন। দীনাদার আন্তরিক সাহায্যের অবশ্য ঘাটতি নেই। ভারতীর বইগুলিও

কখনো কখনো পাওয়া যাচ্ছে। তবু পরীক্ষার ঠিক আগের মুহূর্তে কেউ বই ছাড়তে রাজী হয় না। তার চেয়েও বড় প্রশ্ন—ছাড়লেই বা ও কত সময়ের জন্য দেবে ? ওর নিজের ও তো প্রয়োজন। এই সব নানন কথা ভেবে শেষে মাকে বইগুলির জন্য বলতে শুরু করল সুমিত। কিন্তু মা নিরুপায়। তাঁর হাত-কামড়ানো ছাড়া কিছুই করাব ছিল না।

এই অবস্থায় সুমিত স্মরণাপন্ন হ'ল তার খেলার সাথী সুখলালের। সুখলাল পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে। এতো কষ্ট করে পড়াশুনা আর করতে পারেনি। সুমিত যখন স্কুলের ক্লাস করা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, ও তখন গ্রাম অঞ্চলে যায় গায়ে খেটে দু'টো পয়সা রোজগার করতে।

ওর কাছে গিয়ে সুমিত বলল, আমার কিছু পয়সাব প্রয়োজন।

ও বলল; তবে ছুটির দিন আমার সংগে চল্। বোজ অন্ততঃ দেড় থেকে পোনে দু'টাকা মত রোজগার হবে।

ঐ দিনে দেড় থেকে পোনে দু'টাকা সুমিতদের কাছে যেন ধনকুবের ভান্ডার। সুখলালের মুখ থেকে আশ্বাসের কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। ওর প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে বলল, আসছে রোববারই তোর সংগে যাব।

মাকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলল। নিরুপায় হ'য়ে মা শেষ পর্য্যন্ত রাজীও হলেন। এক এক করে দিন গুনতে লাগল সুমিত, কবে প্রস্তাবিত রবিবারটা আসবে। পাঠ্য বইগুলি সংগ্রহের জন্য তার পয়সার একান্তই প্রয়োজন। তার চেয়েও বড় আনন্দ যে নিজে খেটে সে অর্থ আয় করবে।

অবশেষে সেই শুভ রবিবার এসে হাজির। ভোর হতেই কোনো কথা নেই, একেবারে সুখলালেব দরজায় গিয়ে সোজা হাজির হ'য়ে বলল, কিরে, যাবি না ?

হ্যাঁ, দুপুরের জন্য কিছু খাবার সঙ্গে নিবি, নতুবা খিদেয় কষ্ট পাবি কিন্তু। সাবধান করে দিল-সুখলাল।

ছুটে এলো সুমিত তার মায়ের কাছে। মা তাড়াতাড়ি আটা বের করে চারখানা রুটি করে দিলেন। এক টুকরো গুড়ও দিলেন রুটি ক'খানার সঙ্গে। খাতার বাতিল পাতা ছিঁড়ে তাতে রুটি কটা জড়িয়ে নিল। এই সঙ্গে একটা গামছা কোমরে বেঁধে সে চলল তার বন্ধুর দরজায়। বন্ধু সুখলাল ও তৈরী হ'য়ে নিল। তৈরী হ'য়ে সুমিতকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রোজগারের ধান্দায়।

উদ্বাস্তু শিবির পেরিয়ে এগোতে লাগল ওরা। পথে দু'একবার সুখলালকে জিজ্ঞাসা করল আমাকে কি করতে হবে রে?

প্রত্যুত্তরে সুখলাল শুধু বলল, চলই না, পৌঁছে নি, দেখবি কত কাজ।

কাজটা কি, কিভাবে তা করতে হবে, ঐ কাজ করার যোগ্যতা তার আছে কিনা, কিছুই জানে না সুমিত। তবু সে চলেছে ওকে অনুসরণ করে।

সামনেই হাসাডাঙ্গা গ্রাম। এই গ্রামের এক প্রান্তে বিশাল একটা ঝিল। ঝিল থেকে কিছু দূরেই বাহাদুরপুরের রেল স্টেশনটা দেখা যাচ্ছে।

যেতে যেতে সুখলাল ঝিলের পাড়ের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। সবিস্ময়ে সুমিত লক্ষ্য করল, ঐ বিশাল ঝিলের অনেকটা জায়গা জুড়ে চরের মত অসংখ্য কি যেন ভাসছে। সেগুলির ওপর বসে আছে সারি সারি বক, পানকৌড়ি আর অজস্র পাখীর দল।

একটু পরেই ঝিলের পাড়ের আঁকাবাঁকা পথ ধরে এক বৃদ্ধ হুকো টানতে টানতে ওদের দিকে এগিয়ে এল। বৃদ্ধটি একটু দাঁড়িয়ে ওদের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বলল, কাম কইরবা নাকি গো ছাওয়ালরা?

সুখলালের মুখের কোন পরিবর্তন নেই। নির্ভীক কর্মীর মতই সে বলল, কাজ করতেই তো এসেছি।

বৃদ্ধ আবার জিজ্ঞাসা করল, পাট ছাড়াতি জানো?

হ্যাঁ।

কত নিবা?

আপনি কত করে দেবেন শুনি?

সুমিত নির্বাক। এক অপরাধী শিশুর মত দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছিল।

এতেও কি মুক্তি আছে! বৃদ্ধ সুমিতের দিকে চোখ রেখে আবার প্রশ্ন করল: অ, তুমি বুঝি লতুন আইলা?

সুমিত থতমত খেয়ে বলল, না—না—

সুখলাল ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, কেন, আপনার ঝিটকিপোতা বিলের পাট ও আর আমি একসঙ্গে একদিন তো ছাড়ালাম, আপনার মনে নেই?

সুমিতের মত নতুন নতুন কত ছেলে হঠাৎ এসে এই কাজ করে যায়।

সবাইকে মনে রাখা বুদ্ধের পক্ষে সম্ভব নয়। সুখলালের কথার জবাবে তাই শুধু বলল, হু—অ—

গুড়ুক গুড়ুক করে বারকয়েক তামাক টেনে শেষে হঠাৎ একটা জোর টান দিয়ে ধোঁয়াটা মেজাজ করে ছাড়তে ছাড়তে বুদ্ধ বলল নেও, রোজ হিসাবে পাঁচ সিকি পাবাক্ষন।

সুখলাল এই কাজ করে অভ্যস্ত। দরদাম করতে শুরু করল। ও বলেই বসল : দুটো টাকা লাগবে কত্তা। সকাল আটটায় কাজে লাগব, চারটায় কাজ ছেড়ে যাব। মোট আট ঘণ্টা কাজ করব, মাঝে একবার টিফিনটা করব শুধু।

বুদ্ধও দর কষাকষি শুরু করল। বিভিন্ন বাদানুবাদের পর রোজের মূল্য ঠিক হ'ল দেড় টাকা। সুখলাল তাতেই রাজী হ'য়ে গেল।

এবার ঝিলের পাড়ে বসে ও একটা কৌটোর থেকে বিড়ি বার করল। বিড়িটা ধরিয়ে কিছুক্ষণ মেজাজ করে টানতে লাগল। সুমিতকে তারপর হুকুম করল, কোমরে গামছাটা জড়িয়ে তৈরী হয়ে নে।

সুমিত গায়ের জামা খুলে জামার ভাঁজের মধ্যে রুটির প্যাকেটটা রেখে দিল। ঝিলের পাড়ে পড়ে রইল তার জামা আর রুটি।

এবার সুখলালও কোমরে তার গামছাটা বেঁধে নেমে পড়ল ঝিলের জলে। কোমর সমান জলের মধ্যে আস্তে আস্তে এগিয়ে একটা উঁচু দ্বীপের মত ভাসমান পাটের গাদা ধরে টানতে লাগল। টান পড়তেই গাদার উপর বসে থাকা বকগুলি উড়ে গেল, আর খাঁজে খাঁজে আশ্রয় নেওয়া ব্যাঙগুলি লাফ দিয়ে ঝপ্ ঝপ্ করে জলে পড়তে লাগল। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল পচা কাদার দুর্গন্ধ। গা ঘিন ঘিন করতে লাগল সুমিতের। কিন্তু দিনের শেষে দেড় টাকা হাতে পাবে ভেবে, না নেমে পারল না। সুখলালকে অনুসরণ ক'রে সেও জলে নেমে পড়ল।

জলে নামতেই তাদের পায়ের তলায় অজস্র পাটের কাঠি মড়মড় করে ভাঙ্গতে লাগল। পায়ের চাপে জলের উপর পচা নোংরাগুলি ভেসে উঠল। যে কোন সুস্থ শরীরের লোকের এই জলে নামলে হাতে পায়ে ঘা না হ'য়ে পারে না। তবুও সুমিত এগিয়ে পাটের গাদার অপর প্রান্ত ধরে কাছে টানতে লাগল। এবার পুরো পাটের গাদাটা তাদের হাতের কাছে চলে এল। কাঁচা পাটকাঠিগুলি কাদা, মাটি, ইঁট, পাথর—এইসব দিয়ে চাপা ছিল। ঐগুলির ভার চাপিয়ে প্রতিটা পাটের গাদা পচানোর জন্য

জলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে।

সুমিত তাদের হাতে ধরে রাখা গাদাটার উপর থেকে একটা একটা করে পাথর, ইঁট ইত্যাদি সরিয়ে জলে ফেলতে লাগল। উপরের ইঁট-পাথর সরানোর পর গাদার উপরকার কাদামাটির প্রলেপ ধুয়ে ফেলতে হ'ল এবার ঐ জলে দাঁড়িয়ে ছাল ছাড়িয়ে প্রত্যেকটি কাঠি আলাদা করে টেনে বার করে পারের সংলগ্ন জমির ওপর রাখতে শুরু করল। ঐ ছালগুলিও জড়ো করে আরেক পাশে রাখা হতে লাগল। শুকোলে ঐ ছালগুলিই হবে পাট।

সুখলাল এই কাজে অনেক পুরোনো লোক। তাই ও যতটা তাড়াতাড়ি করতে পারছিল, সুমিত ততটা পারছিল না। তবে ও যেভাবে সুমিতের সদ্য শেখা কাজের অপটুতাকে গোপন করে রাখলো তাতে সুমিত বিস্মিত হল। ওর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে গেল। সব সময় তার অল্প কাঠিগুলির সঙ্গে ওর কাঠিগুলি মিশিয়ে রাখতে লাগল যাতে বুদ্ধ তার ধীরগতি অপটু কাজটা লক্ষ্য করতে না পারে।

ইতিমধ্যে আগুনঝরানো উত্তপ্ত সূর্যটা তাদের মাথার উপরে চলাফেরা করতে শুরু করেছে। এই কাজে ঐসব কষ্টের দিকে লক্ষ্য করলে চলে না। মাঝে মাঝে অসহ্য চিড়বিড় করছে সুমিতের সারা গা। জলে-কাদায় তার শরীরের সর্বত্র লেপ্টে গেছে এবং শুকিয়ে গিয়ে ভেতর থেকে যেন চামড়া ধরে টানছে। এই সময়ে গনগনে জ্বলন্ত সূর্যটা ঠিক তাদের মাথার উপর এসে হাজির হ'ল।

সুখলাল বলল, এবার হাত-পা ধুয়ে খাবারটা খেয়ে নে।

ও নিজেই ঐ পচা জলে হাত-পা ধুয়ে নিল। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুমিতেরও কোন উপায় ছিল না। কাছাকাছি আর কোন জলাশয় নেই।

হাত-পা ধুয়ে কোমরে জড়ানো গামছা দিয়ে মুখটা মুছে নিল। ঝিলের পাড়ে দম ছেড়ে বসে পড়ল। এমন পরিশ্রম এর আগে কখনও সে করেনি। তার মতো বহু লোকেই তো সমস্ত ঝিলটার পাড় বরাবর ঐ কাজ করছে। ওদের দেখে সে আবার ভরসা পেল। জামা থেকে জড়ানো রুটির প্যাকেটটা হাতে তুলে নিল। দেখল, অজস্র বড় বড় কালো পিঁপড়া সমস্ত রুটির প্যাকেটটার উপর চলাফেরা করছে। দু'একবার ঝেড়ে প্যাকেটটাকে পিঁপড়ে মুক্ত করল। পিঁপড়েদের দৌলতে রুটিগুলো ঝাঁঝরা হ'লেও অবশিষ্ট যা আছে তা ফেলে দেবার উপায়

নেই। সারাদিন পেটে অন্ন পড়েনি, তাছাড়া আরও চার ঘণ্টা কাজ করতে হবে।

পিঁপড়েগুলি ঝেড়ে ফেলে কাগজের মোড়কটা খুলতেই সুমিত দেখল যে, গুড়ের দলাটা নেই। গরম রুটিগুলোর মধ্যে গুড়ের দলাটা রাখায় তা গলে সমস্ত রুটিতে মাখামাখি হ'য়ে গেছে। তাতে অবশ্য কোন দুঃখ নেই, বরং তার তো ভালই হল। নইলে দাঁত দিয়ে কামড়ে গুড়ের দলাটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে খেতে হ'ত। পরিবর্তে রুটিগুলি এক সাথে গোল করে পাকিয়ে মুখে পুরে চিবোতে লাগল। খিদের সময় এটাই যেন অমৃত বলে মনে হচ্ছিল তার।

তাদের দুজনের খাওয়া শেষ হল। খাওয়া শেষ হ'তেই নিতান্ত শিশুর মত সুখলালকে বলল সুমিত ঃ এখন জল পাব কোথায়?

সুখলাল বলল, এখানে খাবার জল নেই জল খেতে হলে সেই বাহাদুরপুর স্টেশনে যেতে হবে। ওখানে একটা টিউবওয়েল আছে। সে অনেক দূর। তাছাড়া, কাজ ছেড়ে বুড়ো যেতেই বা দেবে কেন?

অতএব জলের তৃষ্ণা মনেই রইল। তৃষ্ণা নিবারণ করার কোন উপায় না পেয়ে আবার দু'জনে কাজে লেগে পড়ল।

কাজ চলছে, দিনও ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়ছে। এক সময় ভীষণ তেজী সূর্যটা বাহাদুরপুর ফরেস্টের গাছে গাছে ঢাকা পড়ে গেল। তারা দেখতে পেলো, আশপাশের গাছগুলির ছায়া লম্বা হ'য়ে ঝিলের পাড়ে এসে পড়েছে।

সুখলাল বুঝেছিল যে এবার তাদের কাজ শেষ করার পালা। সুমিতকে বলল, এই আঁটিটা ছাড়িয়েই আমরা কাজ শেষ করব।

ঐ কথা শোনামাত্র সুমিতের মনে তখন কি আনন্দ! তা হ'লে আজকের মত তাদের কাজ প্রায় শেষ! তাড়াতাড়ি হাত চালাতে লাগল। মুহূর্তেই বাকী কাজটুকু শেষ হ'য়ে গেল। ঝিলের জলেই হাত-পা ধুয়ে পাড়ে উঠে পড়ল তারা, তবুও তাদের সর্বাঙ্গে কাদার ছোঁয়া লেগেই রইল।

এই সময়ে বুদ্ধ হঠাৎ এসে একটু বিরক্ত হ'য়েই বলল, কি কইরলা বাপু, কামই ত হইল না।

সুখলাল খুব কর্কশ ভাষায় উত্তর দিল ঃ ও যতই কাজ হোক আপনার সন্তুষ্টি হবে না, একবারও তো আমরা বসিনি কত্তা।

বৃদ্ধ আর কথা না বাড়িয়ে কোমরে বাঁধা কাপড়ের গিঁট খুলে ধীরে ধীরে গুণে তিন টাকা বের করল। সুখলালের হাতে খুচরোসমেত টাকাদুটি দিয়ে বলল, এই নেও, কাল আবার বাপুরা আইবা কিন্তু।

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবো' বলে টাকাকটা হাতে নিয়ে সুখলাল সুমিতকে বলল, চল্।

জামাটাকে হাতে নিয়ে সুমিত পথ চলতে লাগল। পথ চলতে চলতে সুখলাল তাকে তার অংশ অর্থাৎ দেড় টাকা হাতে দিয়ে বলল, এই নে তোর টাকা।

টাকা হাতে পেয়ে সুমিতের সারাদিনের ক্লান্তি যেন দূর হয়ে গেল। গা-পোড়ানো রোদের প্রখর তাপের কথা মুহূর্তেই ভুলে গেল। মনে মনে ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম করল। ভাবল আজকের উপার্জিত টাকাটা মায়ের হাতে দিলে কতই না খুশী হবেন তিনি। এমনি নানান রঙিন ভাবনায় তার মনটা ভরে উঠল। কল্পনায় এতই মগ্ন হয়ে উঠেছিল যে মুখে কোন কথাই সরছিল না।

হঠাৎ সুখলাল বলল, তোর প্রথম রোজগার আমি করিয়ে দিলাম, আমাকে কিছু খাওয়াবি না?

হ্যাঁ, চল্ কটকটি খাব। উৎসাহভরে বলল সুমিত।

তখন কটকটি ভাজাই সুখলাল ও সুমিদের একান্ত প্রিয় খাবার ছিল। দামও কম, স্বাদও বেশ মিষ্টি।

সুখলালের মন ঐ কটকটি ভাজায় ভরল না। ও তো অনেক আগে থেকেই আয় করছে। কিছু কিছু এদিক ওদিক খরচ করার ক্ষমতাও হয়েছে এবং তা করেও থাকে। বহুদিন থেকে ও ধূমপানের অভ্যাস করে ফেলেছে। দামী কোন তামাক বা সিগারেট নয়, বিড়ি খায়। সুমিতকে ও বলল, চল্ পাঁচের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসের কাছে গিয়ে একটা সিগারেট খাব।

বেশ, তাই চল্। মাথা হেলিয়ে বলল সুমিত।

কৃপা এবং অনুকম্পার কথা ভেবে ওর আবদারে বাধা দিতে পারল না সে। বিলের পাড় ধরে এগিয়ে তারা এসে পড়ল মাটির বাঁধানো উঁচু রাস্তার উপর। বৃষ্টিতে মাটি বাঁধানো উঁচু রাস্তার কোথাও ধস নেমেছে, কোথাও বা খাদ হ'য়ে মাটির রাস্তাটা দুটো ভাগ হয়ে হা করে আছে। কখনো একটু লাফিয়ে খাদ পেরিয়ে কখনো বা একটু বাঁক ঘুরে

তারা এসে উঠল পাঁচের বড় রাস্তায়। এই রাস্তা কৃষ্ণনগর থেকে এসে তাদের এ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে সুদূরে বহরমপুরের দিকে গিয়েছে। রাস্তার দু'পাশে রয়েছে বড় বড় গাছ। আম, জাম, বট ও শিমুল গাছের সারি। এই সব রকমারী গাছগুলির প্রলম্বিত ছায়া পথের উপর এসে পড়েছে। তারাই ফাঁকে ফাঁকে বেলাশেষের ঠাণ্ডা নরম লালচে রোদ চিক্‌চিক্‌ করছে। গাছের ডালে ডালে বসে থাকা নাম-না-জানা অজস্র পাখীদের বিচিত্র কিচিরমিচির শব্দ সুমিতের কানে যেন মধু ঢেলে দিচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে তারা প্রায় ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসের কাছে পৌঁছে গেল। খেয়াল হতেই দেখতে পেলো তাদের সামনে ইউনিয়ন বোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয়। প্রত্যহ ওখানে প্রচুর দরিদ্র রোগীদের সমাগম হয়, ওখানকার ডাক্তার গড়াইবাবুর একটু কৃপালাভের জন্য রোগীদের ডেকে রোগের সম্পূর্ণ বিবরণ শোনার আগেই শ্লিপ লেখা শেষ করে ফেলতেন ডাক্তারবাবু। রোগীদের দেখার ঘরের লাগোয়া আর একটি ঘর আছে। একজন কম্পাউন্ডার সে ঘরে সর্বদা কর্মব্যস্ত থাকে তার সামনে টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে পেটমোটা বড় বড় চারপাঁচটা বোতল বোতলগুলি লাল, নীল, হলুদ রংয়ের ঔষধে ভর্তি। ঘরটার কোণের ঘুলঘুলি দিয়ে ঔষধভর্তি দাগ আঁটা শিশিটা বাড়াতে না বাড়াতেই কম্পাউন্ডার বলত, আজ তিন দাগ, কাল তিন দাগ এটা ছিল তার ছকবাঁধা নিত্যকার বলার অভ্যাস।

এমনও অনেক দিন হয়েছে, দুইজন ভিন্ন রোগী হয়তো ডাক্তারখানায় লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওদের একজন বলল—পেট খারাপ, অন্য জন বলল—মাথা ধরছে, জ্বর জ্বর লাগছে। ওদের নাম, বয়স ইত্যাদি জিজ্ঞসা করেই ঘচ্‌ করে পেনের খোঁচায় প্রেসক্রিপসানের কাগজে ডাক্তারবাবু কি যে লিখলেন কেউই বুঝলো না কিন্তু কম্পাউন্ডারের কাছে যেতেই ওদের দুজনকেই ঔষধ দেওয়া হল একই বোতল থেকে এবং যথারীতি কম্পাউন্ডারের মুখে শোনা গেল—'আজ তিন দাগ, কাল তিন দাগ।'

ঔষধ দেওয়ার মধ্যে কিছু সন্দেহজনক ব্যাপার আছে মনে করে লাইনের রোগীরা একদিন রাগে গজ্‌গজ্‌ করে উঠল। তারা ডাক্তারী বুঝতো না সত্য, কিন্তু দু'রকম রোগের এক ঔষধ হবে কেন? সুতরাং সকলে চিৎকার চেচামেচি শুরু করে দিল। ডাক্তারবাবুও তার হাতোল

বিহীন চেয়ার থেকে দ্রুত উঠে এসেই বললেন—তাহ'লে তোমরাই আমার চেয়ারে বস, ওটা, তোমরাই কর, আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

এমন বিচিত্র চিকিৎসাও কিন্তু শিবির বাসীদের প্রাপ্য ছিল।

এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের পাশাপাশি ইউনিয়ন বোর্ডের অন্য অফিস। সেই অফিসের সঙ্গেই কয়েকটা পান বিড়ির দোকান। একটা দোকানের কাছে গিয়ে পকেট থেকে পয়সা বের করে একটা সিজার সিগারেট চাইল স্নমিত

সুখলাল বিরক্ত হয়ে বলল, এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন! তোকেও একটা খেতে হবে।

স্নমিত এর আগে কোনদিনই ধূমপান করেনি। ধূমপান করা বড়দের নিজস্ব অধিকার বলেই সে জানে। সুতরাং আপত্তি করল।

নাছোড়বান্দা সুখলাল বলল, তবে আমিও খাবো না।

ওকে অখুশী করতে পারবে না ও তার উপর রাগ করুক এমন কথা স্নমিত ভাবতেই পারছে না। অতএব তাকে একটু স্বার্থ ত্যাগ করতেই হল। সে দুটো 'সিজার' কিনল

সুখলাল দোকানের পাশে রাখা একটা জ্বলন্ত বাতি থেকে দলা-পাকানো একটা কাগজ ধরিয়ে নিল। নিজের মুখের সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়েই সেই কাগজটা স্নমিতের দিকে এগিয়ে দিল।

'একটু পরে ধরাব'—বলে ওকে আশ্বাস দিয়ে পথ চলতে লাগল স্নমিত।

কিছু একটা অনুমান করে বিনা আপত্তিতে নিজের মুখের সিগারেটটা টানতে টানতেই সুখলাল পথ চলতে লাগল। ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসের পেছনেই দু'তিনটে বাড়ি, তারপর ফাঁকা রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে পাটক্ষেত।

ধীরে ধীরে পথ চলতে চলতে তারা বাড়ি ক'টা ছাড়িয়ে গেল, সুখলাল কিন্তু ভোলার পাত্র নয়। আবার বলল, এবার ফাঁকা রাস্তা, এখানে ধরিয়ে নে।

হাতটা বারবার মুখে তুলতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু কিছুতেই সাদা লম্বা সিগারেটটাকে মুখে ধরতে ভরসা পাচ্ছিল না স্নমিত। লজ্জা, সঙ্কোচ, দ্বিধা নানানভাবে তার মনকে শাসাচ্ছে। বাধ্য হ'য়েই সুখলালকে বলল, চল, ঐ পাটক্ষেতের মধ্যে বসে খাব।

তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে সুখলাল পাটক্ষেতের মধ্যে যেতে রাজী হ'ল। দু'জনে পাটের গাছগুলি দু'হাতে সরাতে সরাতে ক্ষেতের মাঝখানে চলে গেল। ক্ষেতের জমিতে সামান্য দুর্বাগাছ গজিয়ে উঠেছে। কোমর থেকে গামছাটা খুলে মাটিতে পেতে তার উপর বসে পরল দু'জনে। পাটের গাছগুলির ফাঁক দিয়ে তখনও রাস্তা দেখা যাচ্ছে। রাস্তাকে পিছন দিক করে বসল সুমিত। দ্বিধা এবং সংশয় থাকা সত্বেও সিগারেটটাকে বহু কষ্টে চার আঙ্গুল দিয়ে নিজের মুখে চেপে ধরল।

সুখলাল ওর জ্বলন্ত সিগারেটটা সুমিতের মুখের সিগারেটের সঙ্গে ছুঁইয়ে দিয়ে বলল, টান।

টানতে লাগল সুমিত একটু একটু করে। প্রথমে কিন্তু ধোঁয়া বেরোল না।

সুখলাল উৎসাহ দিল: একটু জোরে টান, দেখবি ধোঁয়া বেরিয়ে পড়বে।

ওর কথায় জোরে জোরে টান দিতে লাগল সুমিত। হঠাৎ চট্ করে এক রাশ ধোঁয়া তার সমস্ত মুখটার মধ্যে এসে হাজির হ'ল।

ও বলল, এবার নাক দিয়ে ধোঁয়াটা বের করে দে।

ওর কথা শুনে ধোঁয়াটা নাক দিয়ে বার করবার জন্য মুখে চাপ দিতেই সুমিতের ভীষণভাবে কাশি পেল। গলা খুস্ খুস্ করতে লাগল। তারপর কাশির পর কাশি। দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম! তার চোখমুখ লাল হ'য়ে গেল, চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল। এই অবস্থা দেখে ভীত হ'য়ে তার মাথায় ফুঁ আর মৃদু মৃদু চাপড় দিতে লাগল সুখলাল। প্রায় পাঁচ মিনিট এমনভাবে কাশতে কাশতে সুমিত অবশেষে স্বাভাবিক হ'তে পারল।

ভীত সুখলাল আর সেদিনের মত তাকে ধূমপান করতে অনুরোধ করল না। ওর মুখের জ্বলন্ত সিগারেটটা সুখলালকে দিয়ে দিল।

দুজনেই আবার পাটক্ষেত থেকে বেরিয়ে পীচের রাস্তার উপর এল। সামনের কাঁঠালবাগান পেরিয়ে সাত নম্বর গ্রুপের এলাকার মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসে তারা পেঁছিল খেলার মাঠে। মাঠটা পেরোলেই সুমিতদের বাড়ি। বাড়ি পর্য্যন্ত পেঁছিতে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। সারাদিন মা তাদের জন্য খুব চিন্তিত ছিলেন। এর আগে কোনোদিন এমন ভাবে অর্থ-উপার্জনের জন্য সুমিত কোথাও যায়নি। আর আজ কিনা সে সকাল

থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ির বাইরে রয়েছে। উপার্জনের আশায় চলে গিয়েছিল কত দূরে।

বাড়িতে পৌঁছে মার সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র মা বললেন, তোর মুখ-চোখটা একবার দেখেছিস ?

আমার মুখ! তবে কি সিগারেট টানতে গিয়ে কিছু বিকৃত হয়েছে ? ধরা পড়ে গেলাম নাকি মায়ের কাছে ?—নিজের সম্বন্ধে এই সব ভাবতে ভাবতে গামছাটা দিয়ে ভালো করে মুখ মুছে নিল সুমিত।

মা বললেন, ইস্. মুখটা একেবারে কালো হ'য়ে গেছে! যা যা, আগে মুখটা ভালো করে ধুয়ে আয়।

এই কথায় স্বস্তি পেলো সুমিত। সে যে ধূমপান করেছে, মা তাহ'লে তা বুঝতে পারেন নি। মায়ের হয়তো ভাবনা, সারাদিন সে না খেয়ে রোদের মধ্যে বসে ছিলো। এখনও তো তার হাতে পায়ে ছিট্ ছিট্ কাদার দাগ লেগে রয়েছে।

বলল সে, একেবারে স্নান করেই আসি না ?

শঙ্কিত কণ্ঠে মা বললেন, না বাবা, এই ভর-সন্ধ্যায় তোকে স্নান করতে হবে না। হাত-পা ধুয়ে আগে কিছু খেয়ে নে। তারপর দরকার হয় মাথাটা ধুয়ে ফেলবি।

মায়ের কথা অনুসারেই হাতমুখ ধুয়ে এসে ভাত খেতে বসে পড়ল সুমিত। সারাদিনের পরিশ্রমের পর সকালের ঠাণ্ডা ভাত যেন তার কাছে অমৃত মনে হ'ল। সঙ্গে কি কি উপকরণ আছে তা নিয়ে অনুযোগ-আবদারের আর তর সইলো না। ভাতের সঙ্গে ডাল আর সামান্য শাক-পাতাই যেন সেদিন রাজকীয় ভোজ বলে মনে হ'ল তার কাছে। গোগ্রাসে খেয়ে উঠল সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত অন্ন। ক্ষুধার্ত পেট এবারে শান্ত হ'ল। তার দেহ ও মনের ক্লান্তির অবসান ঘটল। খেয়ে উঠে আঁচিয়ে এসেই মায়ের হাতে তুলে দিল তার কষ্টার্জিত সেদিনের উপার্জন।

দু'হাতের অঞ্জলির মধ্যে সেই উপার্জনটুকু তুলে নিলেন মা। তখন কী তার পরিতৃপ্তি! হাতের মুঠো শক্ত করে নিজের বুকে চেপে ধরলেন তিনি। মুখে তার কোনো কথাই সরল না।

অপলক দৃষ্টিতে সুমিত খানিকক্ষণ মায়ের দিকে চেয়ে রইল। পরমুহূর্তেই মায়ের চোখে দেখা দিল শিশির বিন্দুর মত দু'ফোঁটা জল। ঐ অবস্থায় মা তাকে জড়িয়ে ধরলেন। অর্থ যত সামান্যই হোক তবু

তার ছেলের উপার্জন।

মায়ের চোখের সেই দু'ফোঁটা আনন্দাশ্রু আশীর্বাদের অভিব্যক্তি হ'য়ে ঝরে পড়ল সুমিতের পিঠের উপর।

কিছুক্ষণ পরে মা বললেন, যতদিন বাঁচবো এমন করে আমাকে দেখবি তো?

কি যে বল! বলে মাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল সুমিত।

মায়ের ঐ কথা কয়টা তাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল যে, স্বামীহারা মায়েদের নিজ সন্তান ছাড়া আর কোনো শেষ সম্বলই থাকে না।

তারপর একটু বিশ্রাম নিতে বসল সুমিত। তার পাশে বসে মা তাকে একদৃষ্টে দেখতে লাগলেন। সুমিতের মনে তখন নানান্ কল্পনা উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল। প্রথমে ভাবল নতুন পাওয়া কাজের এই স্বল্প আয় শুধু বই কেনার জন্য খরচ করবে না, অন্য কিছু করাও দরকার। কয়েক দিনের আয় জমিয়ে তাদের তিন ভাইএর জামা করলে ভাল হয়। কখনোসখনো ছুটির দিনে এমনভাবে সুখলালের সঙ্গে গেলেই হবে। আশা পূরণ করবার মত অর্থ নিশ্চয়ই হ'য়ে যাবে।

মায়ের কল্পনা সুদূরপ্রসারী। মা বললেন, তোর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। ওসব কেনাকাটা পরে হবে, বরং একজন মাষ্টারের কাছে যদি পড়তে পারিস তবে ভাল হয়।

মায়ের কথায় সায় দিয়ে বলল সুমিত, হ্যাঁ, এ সময়ে প্রাইভেট কোচিং-এর জন্য একজন মাষ্টার হ'লে সত্যিই আমার খুব ভাল হয়।

সেদিনের মত আলোচনা শেষ করে পড়তে বসল সে। আজ আর দীনাদার বাড়ি গেল না। সারাদিন ভারতীর সঙ্গে দেখা হয়নি, ওকে দেখার প্রবল ইচ্ছা থাকতেও গেল না। জানতো যে ভারতী কখনই তার এই ধরণের কাজকে প্রশংসা করবে না। বরং উত্তপ্ত বাক্যবান দিয়ে তার মনের উৎসাহকে নষ্ট করে দেবে। তাই ওর সঙ্গলাভের একান্ত ইচ্ছাকে দমন করল। মাও দীনাদার বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারে তাকে কিছু বললেন না। মা জানেন, সে এখন ভীষণ ক্লান্ত, আজ তাই নিজেদের ঘরেই পড়তে বসেছে।

পরদিনই সকাল হতে শেষরাতের পড়া ছেড়ে উঠে পড়ল সুমিত। হাত-মুখ ধুয়ে এসে মায়ের বানানো আটার রুটি দড়ির মত করে পাকিয়ে চা'য়ে ভিজিয়ে খেয়ে নিল। এমনি করে রুটি ভিজিয়ে খেতে

খেতে চা'য়ের আসল স্বাদ নষ্ট হয়ে যেত। প্রায়ই চা বলে কোনো আলাদা পদার্থ পান করার সুযোগ থাকত না। তবুও ওতেই সে খুশী। ডোরা কাটা লম্বা লম্বা দাগওয়ালা বেঢপ জামাটা দেহে গলিয়ে নিল। ঐ জামার ঝুলে পরণের প্যাণ্টটাও ঢাকা পড়ে গেল। এ সবের জন্য কোনো লজ্জাবোধ অবশ্য তখন হয়নি।

বেরিয়ে পড়ল সে তার ক্লাশের বন্ধু আশীষের খোঁজে। সে জানত, আশীষ একজন মাষ্টারের কাছে পড়ে। তাঁকে মহেন্দ্র মাষ্টার বলে সবাই এক ডাকে চেনে। স্থানীয় একটা স্কুলেই উনি শিক্ষকতা করেন। তাদের এই উদ্বাস্তুশিবিরে ওনার খুব নামডাক। সবাই বলেন—এমন মাণ্টার হয় না।

আশীষরা থাকে তাদেরই পাশে পঁচিশ নম্বর গ্রুপে। ওদের বাড়িতে গিয়ে হাঁক দিতেই ওর মা বললেন, এখনো বাবুর ঘুম ভাঙ্গেনি, দাঁড়াও ডেকে দিচ্ছি।

মায়ের ডাকাডাকি শুনে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল অশীষ। খানিকক্ষণ পূবমুখো হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে সূর্য্যকে প্রণাম করে সুমিতকে বলল, কি রে, কি খবর?

হয়তো ভেবেছিল সে কোন বই-টই চাইতে এসেছে।

সুমিত বলল, তোর সঙ্গে একটা বিশেষ গোপন কথা আছে।

'আয় আমার সঙ্গে'—বলে সুমিতকে সে তার নিজের ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে বলল, একটু ব'স। আমি হাত-মুখটা ধুয়ে নি, তারপর তোর কথা শুনছি। কি তোব এমন গোপন কথা যে এই সাত-সকালেই বলতে হাজির হ'য়েছিস?

হ্যাঁ, তুই আগে মুখটা ধুয়ে আয়, তারপর শুনবি, বলল সুমিত।

আশীষ আর কথা না বাড়িয়ে মুখ ধুতে চলে গেল। সেই অবসরে সুমিত ওর পড়ার সাজসরঞ্জাম দেখতে লাগল। একটা খাতা উল্টেপাল্টে ওর কষা অঙ্কগুলি দেখতে থাকলো। খাতায় কোথাও রয়েছে ট্রানস্লেসন, কোথাও বা জ্যামিতি। সমস্ত খাতাটা জুড়ে রয়েছে ওর নিষ্ঠার ছাপ। দেখতে দেখতে সে মোহিত হ'য়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে মুখ-হাত ধুয়ে আশীষ এসে হাজির। গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, এবার বল; কি তোর কথা?

কোন সংকোচ না করেই সুমিত বলল, তোর একটু সাহায্য চাই।

আরে বাবা সব ব্যাপারটা খুলেই বল না। অসহিষ্ণু কণ্ঠে কথাটা বলল আশীষ।

সুমিত অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, যদিও আর্থিক ক্ষমতা নেই, তবু একজন মাষ্টারের সাহায্য আমার দরকার। শুনেছি তুই যাঁর কাছে পড়িস, তিনি খুব ভাল মাষ্টার। একটু বলে কয়ে আমাকে ওনার কাছে পড়ার ব্যবস্থা করে দিলে বড়ই উপকৃত হব। তুই বললে উনি নিশ্চয়ই রাজী হ'য়ে যাবেন।

আশীষ তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানিয়ে তাকে বলল, হ্যাঁ হ্যা ভালই হবে। প্রতিদিন একা একা পড়তে যাই, রাত্রে একা ওনার বাড়ি থেকে ফিরতে বড় ভয় করে। তুই সঙ্গে থাকলে ভালই হবে। তবে আজই বিকেলে স্কুল থেকে ফিরেই চলে আয় আমাদের বাড়ি। একসঙ্গে দুজনে চলে যাব মাষ্টারমশায়ের কাছে। বললে উনি ঠিকই রাজী হ'য়ে যাবেন।

ওর কাছে আশ্বাসের কথা শুনে সুমিতের মনে আনন্দের সীমা রইল না। আপন মনে সে ভাবল, দক্ষিণা যাই লাগুক না কেন, ও গায়ে খেটে ঠিক জোগাতে পারবে

আশীষের সঙ্গে কথাটুকু সেরে বাড়ির পথ ধরল সুমিত। তখন সকালের লাল সূর্যটা বিশাল থালার আকার নিয়ে দূর মাঠের বক্ষাদি ভেদ করে ধীরে ধীরে পূব-আকাশের গায়ে উপরের দিকে উঠছে। রোদে ঝলমল করছে তার পায়ের তলাকার পাথরের চওড়া রাস্তাটা। সেই পথে তখন নিত্যকার অভ্যাসমত গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে আগন্তুক চাষী মেয়ে ও বৌদের দল মাথায় শাকসব্জীর ঝুড়ি নিয়ে বাজারের দিকে ছুটে চলেছে। উদ্বাস্তু শিবিরের কিছু কিছু বাসিন্দারাও ছোট ছোট থলি হাতে বাজারের দিকে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও স্থানীয় গৃহবধূ বা গৃহকর্তারা শেষ রাতে মাঠ থেকে তুলে আনা গোবর দিয়ে এই পাথরের রাস্তার পাশেই বসে ঘুটে দেওয়া শুরু করেছেন। আবার কেউ বা কুড়িয়ে আনা কয়লার গুড়ি জলকাদা দিয়ে মেখে গোল গোল করে গুল দিচ্ছেন। নিজ নিজ সংসারের অর্থের সাশ্রয় করতে সাধ্যমত সকলেই তৎপর। সেই তৎপরতার জন্যেই এই পাথর-বাঁধানো বিশাল চওড়া রাস্তার বেশ বড় অংশ তার নিজস্ব গৌরবময় চেহারাটা হারিয়ে ফেলেছে। দুধারেই কোথাও ঘুটের গোল গোল দাগ, কোথাও বা গুলের অসংখ্য লাঞ্ছনা। ঘুটে আর গুলের কালো কালো দাগে রাস্তার সাদা রং চাপা পড়েছে। এমনি করেই

ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেছে শুভ্র রাস্তাটির সর্বাঙ্গ।

পাথরের ঐ রাস্তার ওপর দিয়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে প্রায় বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল সুমিত। এবার মতিদের দরজার সামনে থেকে মাটির পথ ধরে এসে নিজেদের জমির সীমানায় হাজির হ'ল। দেখতে পেলো সেই বিশাল শিমুল গাছটার লাল টকটকে ফুলগুলি মৃদু হাওয়ায় দুলছে। এধারে ওধারে কয়েকটা শিমুল ফুল শুকিয়ে মাটিতে ঝরে পড়েছে। ঝরে পড়া সেই ফুলগুলির সৌরভ হাওয়ায় মাতালের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। চোখ তুলে শিমুল গাছটার দিকে চাইতেই লক্ষ্য করল, ছোট ছোট গোটাকয়েক ফল তাদের সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছে। এগুলিই তো তাদের আগামী দিনের সফল পরিণতির সাক্ষ্য।

এই সব দেখতে আর অনাগত সাফল্যের কল্পনা করতে করতেই নিজেদের ঘরের দরজায় পৌঁছে গেল।

তার সাড়া পেয়েই মা অনুযোগের স্বরে বললেন, এই সাত-সকালে কোথায় গিয়েছিলিরে ?

প্রথমে কোনো জবাব না দিয়ে খুশীর আবেগে সে মাকে জড়িয়ে ধরল।

শশব্যস্ত মা বললেন, আরে আরে, কি হ'য়েছে বল্না।

বিষয়টা জানবার জন্য মা অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন বুঝতে পারল সুমিত। তবু বিষয়টাকে গোপন রেখে শুধু 'হয়েছে—হ'য়েছে' বলে মাকে এক পাক ঘুরিয়ে দিল। তারপরই ছেড়ে দিয়ে মাকে টিপ্ করে একটা প্রণাম করলো।

দিশেহারা মা কৌতূহলী হ'য়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন, বল্নারে কি হ'য়েছে ?

এবার মাকে আশ্বস্ত করতে বলল, আশীষ কথা দিয়েছে আমাকে ওর মাষ্টারমশায়ের কাছে নিয়ে যাবে।

কথাটা শুনেই মা একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলেন। মুহূর্ত পরেই বললেন, কিন্তু মাইনে কত নেবেন তা জিজ্ঞাসা করেছিস্ ?

মায়ের কাছে মাইনেটাই বড় প্রশ্ন। এই সংসারটা চালিয়ে হাতে এমন কিছু অবশিষ্ট থাকে না যার সাহায্যে সুমিতের প্রয়োজনে মাইনে দেওয়া চলতে পারে।

এই সব ভেবে বোধ হয় মায়ের মুখটা ভার হ'য়ে গেল। হতাশার

স্বরে বললেন, টাকাই বা পাব কোথায় !

তার একদিনের উপার্জনের উপর ভরসা করতে পারলেন না।

সম্ভব কি অসম্ভব না ভেবেই সুমিত বলল, ওটা আমার চিন্তা। তোমায় ঐ নিয়ে ভাবতে হবে না। সুখলাল নিশ্চয়ই এই সামান্য সাহায্যটুকু করবে। সব ছুটির দিনে ওর সঙ্গে যাব, কিছু উপার্জন হবেই।

সকালের কাজ তখনও মা শেষ করে উঠতে পারেন নি। ছাগলটা রান্নাঘরের কাছে দাঁড়িতে বাঁধা পড়ে রয়েছে। বাড়ির দুটো হাঁস তখনও ঝুড়ির তলায় লুটিয়ে বসে প্যাঁক প্যাঁক করছে। কলাগাছটার তলার ইটপাতা জায়গায় জড়ো করা একরাশ এঁটো থালাবাসন হাত পড়েনি। ঘরের সব কিছুই অগোছালো, কোনো কাজেই মা উৎসাহভরে হাত লাগাচ্ছেন না।

মায়ের মানসিক অবস্থা অনুমান করে একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই বলল থাক তবে, মাস্টারমশায়ের কাছে আর যাবো না।

চকিতে মা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, না, না, যাবি না কেন, নিশ্চয়ই যাবি। না হয় আর একটু কষ্ট হবে। এ আর ক'মাস? দেখতে দেখতেই কেটে যাবে।

বাস্, আর সুমিতকে পায় কে। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন ভরে গেল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে ছুটে গেল ছাগলটার কাছে। ছাগলের গলায় বাঁধা দড়িটা খুঁটো সমেত হাতে তুলে নিল। ঝুড়িটাও উল্টে দিয়ে হাঁস দুটোকে ছেড়ে দিল। ও ছুটে গেল কলাগাছতলায় জড়ো করা এঁটো থালাবাসনগুলোর দিকে। হাতের দড়ি ধরে টানতে টানতে ছাগলটা নিয়ে সেই মুহূর্তেই চলল সে মাঠের দিকে।

তাদের বাড়ির সামনের ছোট পীচের রাস্তা পেরিয়ে যে মাঠ, সেই মাঠে শিবিরের উদ্বাস্তুরা অবাধে তাদের গরু ছাগল বাঁধে। সুবিস্তৃত এই মাঠটি সবুজ ঘাসে ভরা। ঐ মাঠের মধ্যে কিছুদূর এগিয়ে এদিক ওদিক পড়ে থাকা টুকরো ইটগুলির মধ্যে একটা আধলা ইট সে কুড়িয়ে নিল। তাদের কালো ছাগলটার গলায় বাঁধা দড়িটার খুঁটোটাকে কুড়ানো আধলার ঘা দিয়ে মাটিতে পুঁতে দিল। আধলাটাকে রেখে দিল খুঁটোটার পাশেই। তোলবার সময় ওটার আবার দরকার হবে।

ছাগলটাকে মাঠে চরতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সুমিত বাড়িমুখো হতেই লক্ষ্য করল, পীচের রাস্তার পাশের টিউবওয়েলের কাছে ভারতী দাঁড়িয়ে

রয়েছে।

সুমিত মুখোমুখি হতেই ও ওর মুখ আর দেহটা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে তার দিকে পেছন করে দাঁড়াল। ওর হাতের খালি বালতিটা তখনও দুলছে। তার উপস্থিতি টের পেয়েও মুখ ঘুরিয়ে নিল কেন? তবে কি বিরক্ত হয়েছে বা রাগ করছে তার উপর। কাল সারাদিন ওর সাথে সুমিতের দেখা হয় নি, আজও সকালে সুমিত বাড়ি ছিল না। ও কি ইতিমধ্যে তাকে খুঁজেছিল? কৈ, মা তো তেমন কিছু বললেন না।

রাগই করুক বা বিরক্তই হোক, তার এই পড়ার ব্যাপারে শুভ সংবাদটা ওকে শোনাতেই হবে। তাই চুপি চুপি কলতলায় গিয়ে ওর পিছনে দাঁড়াল সে। গ্রাম্য পথের কুলবধূরা কোনো পরপুরুষের সংগে মুখোমুখি হ'লে যেমন পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে মুখ আড়াল করে, তেমনি ভারতীও তার মুখটা সরিয়ে নিল। কলে তখন একজন বৃদ্ধা জল নিচ্ছিলেন।

ভারতীর সঙ্গে এই অবস্থায় কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে না সে। বৃদ্ধা তার বালতিটা ভর্তি করে কলতলার বাঁধানো চাতাল থেকে নেমে ঘাসের উপর সরে দাঁড়িয়ে রইলেন। বোধ হয় স্নান করবেন।

ফলে সুমিত আর দেরী করতে পারল না। এগিয়ে গিয়ে কলের পাম্প করার হাতলটা ধরে, একবার মাথা তুলে ভারতীর দিকে তাকাল।

স্পষ্টই বুঝলো যে ভারতীর মুখে বিরক্তির ছাপ। মাথাটা দুলিয়ে অন্য দিকে চেয়ে রইলো সে। সুমিতকে যেন চেনেই না

তখন সুমিতের আর কোনোভাবেই সময় ব্যয় করার উপায় নেই। হাত না ধুয়ে মুখে জলের কয়েকটা ঝাপটা দিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল। এতো কিছু করেও ভারতীর কোনো সাড়া পেলো না।

ওদিকে তাদের ঘরে তখনও উনুন জ্বলোন। মা সবে গোবরমাটি দিয়ে রান্নাঘর নিকিয়ে অদূরের ইটপাতা জায়গাটায় গিয়ে পৌঁচেছেন। রান্না হতে এখনও অনেক দেরী।

মাকে বলল, দীনাদাকে একটিবার মাস্টারের খবরটা দিয়ে আসি?

সংসারের নানা কাজ করলেও মা তার মাস্টারের কথাই ভাবছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। মাষ্টারমশাইকে দীনা ঠিকই চিনবে। জিজ্ঞাসা করবি, কেমন হবে?

মার কাছ থেকে আর দ্বিতীয় কথা শোনার অপেক্ষায় রইল না সুমিত।

ছুটে দিল দীনাদার বাড়ি। দূর থেকে 'দীনাদা—'বলে হাঁক দিল। উদ্দেশ্য ছিল যাতে তার আগমনের খবরটা ভারতীর কানে পেঁছে যায়। কিন্তু দীনাদার বাড়ির দরজায় পেঁছনো মাত্র দেখল ভারতী একটা ঝাঁটা হাতে দরজার সামনে থমথমে মুখে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

তাকে দেখে ভারতী গম্ভীর গলায় বলল, দাদা এখন বাড়ি নেই।

আর কোনো কথা না বলে নীরবে সে ঘর ঝাঁট দিতে শুরু করল।

একটু দমে গেলেও সুমিত আবার উৎসাহভরে বলল, দাদা বাড়ি নেই! তবে কি আমি চলে যাব?

—চলে যাবি না তো দাঁড়িয়ে থাক। মুখ না ফিরিয়েই বলল ভারতী।

ওর মুখে এইটুকু উত্তর শুনতেই কি তার এত দ্রুত ছুটে আসা? ভারতীর এতটা উদাসীনতা সহ্য করতে পারল না সুমিত। মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিল। পাশ কাটিয়ে সোজা ঘরের ভেতর ঢুকে ওর পড়ার টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই টেবিলের ওপর উল্টে রাখা খাতাটা সোজা করতেই দেখল একটা পাতার একদিকে ভারতী লিখেছে—যে কাজই কর সামান্যতম সম্মানটুকু রক্ষা করেই করা উচিত। আর এমন সঙ্গও নেওয়া ভাল নয় যে সঙ্গ বিপথে নিয়ে যেতে পারে। তোর দীনাদা তো কোনদিন এমন বন্ধুর সঙ্গ নেয় না।...

বাকী অংশ পড়বার আগেই ভারতী ছুটে এসে পলকের মধ্যে চিলের মত ছোঁ মেরে তার হাত থেকে খাতাখানা কেড়ে নিল।

বোঝা গেল সুখলালকে কটাক্ষ করে তার উদ্দেশ্যেই ভারতী ঐসব লিখতে শুরু করেছিল। লেখার বাকী অংশটা পড়ার জন্য সুমিত ব্যাকুল হয়ে হাত বাড়াতেই ও দূরে সরে গেল।

সুমিত এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ও একহাতে খাতাটা ওর বুকের মধ্যে চেপে ধরে অন্য হাতে ঘর ঝাঁট দিয়ে ঝাঁটাটা দরজার কোণে রেখে দিল। তারপর পায়চারি করতে করতে আপন মনে নিজের লেখাটা পড়তে লাগল।

সুমিতের আগ্রহ শতগুণ বেড়ে গেল ওকে ওর লেখাটা ঐভাবে পড়তে দেখে। মনে মনে মতলব আঁটলো কেড়েই নেবে খাতাটা। ওর তন্ময়তার সুযোগে সাহসভরে যেইনা একটু এগিয়েছে অমনি ঘরে এসে ঢুকলেন ওর স্নেহময়ী মা এবং সুমিতকে দেখতে পেয়ে বললেন, এই যে বাবা, কাল

তোকে একবারও দেখলাম না তো।

ব্যঙ্গ করে ভারতী বলল, কাল একটু আয় করতে বেড়িয়েছিল যে!

গুরুজনের সামনে দাঁড়িয়ে কি জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারছিল না সুমিত। তবুও আমতা আমতা করে বলল, না মাসীমা, পড়াশুনোর জন্যে আমার কিছু বইপত্তর কেনার দরকার, তাই—এই পর্য্যন্ত বলে কথার ইতি টানতে চেষ্টা করল সে।

আড়চোখে দেখল যে ভারতী তখনও তার খাতাটা খুলে দেখছে। হঠাৎ সুমিতের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বলেই বসল মাসীমা, দীনদা একটা ট্রানশ্লেশন লিখে দিয়েছে। ওর কাছে বার বার চাইছি তবু দেখতে দিচ্ছে না। এবার থেকে দীনদাকে বলব সব আমার খাতায় লিখে দিতে।

অভিযোগের জবাব দিতে এক দণ্ডও অপেক্ষা করল না ভারতী। বলল, মা, ওকে খাতা নিয়ে এসে লিখে নিতে বললাম, তা বাবু পারছে না। একবার চোখ বুলোলেই কি মুখস্ত হ'য়ে যাবে? রীতিমত পড়তে হবে, তবেই তো মুখস্ত হবে।

মাসীমাও ওর কথায় সায় দিয়ে সুমিতকে বললেন, তবে তোর খাতাটা নিয়ে এসে লিখে নে না।

এই সময় বেরিয়ে আসা মানেই ভারতী খাতাটা লুকিয়ে ফেলবে, আর দেখা হবে না। তাকে একেবারে বোকা বানাতে চাইছে।

হাল না ছেড়ে সে বলল, আচ্ছা যাচ্ছি, আগে একবার দেখিই না কি লিখেছেন?

—দেখছিস না আমি মুখস্ত করছি, তুই পরে নিস্। এই কথা বলে ভারতী মুচকি মুচকি হাসতে লাগল আর মাসীমার চোখ আড়াল করে ঘুরে ঘুরে তাকে জিব ভ্যাঙচাতে লাগল।

বোকা বনে যাওয়ার দুঃখে সুমিতের সর্ব শরীর জ্বলে গেলেও কোন উত্তর দিতে পারল না। ইতিমধ্যে মাসীমা ঘর থেকে একটা থালা হাতে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলেন। ঘরে রইল সুমিত আর ভারতী।

নির্জনতার এই সুযোগ পেয়ে সুমিতের মন আবার নেচে উঠল। ফিস ফিস করে সে বলল, এই—দেনা, লেখাটা একবার পড়ি। জানিনা বাবা, এতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে।

ভারতী তবু অনড়। কিছুতেই পড়তে দেবে না। অগত্যা নানাভাবে

ভয় দেখাতে লাগল সুমিত। তাতেও ওকে টলাতে পারল না। নিরুপায় হ'য়ে সে নানাভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে শুরু করল : বিশ্বাস কর তোর কাগজ তোকেই ফেরত দেব। আমি নিয়ে নেব না, তোর খাতাও ছিঁড়ে ফেলব না। একবারটি পড়েই তোকে দিয়ে দেব।

মনে তার ভীষণ কৌতুহল দানা বাঁধছিল। হয়তো এরপর আরও অনেক রাগের কথা লিখেছে। তার অসুবিধার কথা ওকে বোঝাতেই হবে। এমনিভাবে ও রাগ করে থাকলে সহ্য করতে পারবে না সে। ও তার একমাত্র সুখদুঃখের এবং প্রাণখোলা আলোচনার বন্ধু। ভেবে পাচ্ছিল না কি করে ওকে রাগ-মানানো যায়। ওর দিকে চুপ করে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ঘরের একপাশে সাজানো ঠাকুরের আসন চোখে পড়ল সুমিতের। ওখানে চলে গেল সে। আসনের কাছে দেওয়ালে টাঙানো মাকালীর ফটোতে হাত রেখে বলল, এই দ্যাখ্, মায়ের পায়ে হাত দিয়ে বলছি তোর কাগজ ছিঁড়বো না বা নিয়েও যাবো না।

মাকালীর ফটোটা তার হাতের স্পর্শে কয়েকবার দুলে উঠল। ফটোর নিচ থেকে একটা টিকটিকি চট্ করে সরে উঁচু দেওয়ালের দিকে চলে গেল।

ভারতী তখনও অনড়। এবার নিজেকে নিদারুণ অপমানিত মনে হল সুমিতের। এ পর্য্যন্ত যা কিছু হ'য়েছে হাল্কা ইয়ার্কি বা ঠাট্টার মধ্যেই ধরে নিয়েছিল। আর নয়। ঠাকুরের আসনের সামনে কঠোর মুখভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ক্ষোভের সঙ্গে বলল, চলি, আর কোনদিন তোদের বাড়ি আসবো না। প্রতিজ্ঞা করছি—তোর সঙ্গেও কোনদিন কথা বলব না। যদি স্বেচ্ছায় কথা বলি তোর যা খুশী বলে দিবি, দেখি, আমার কথা রাখতে পারি কিনা

মুখটা ঘুরিয়ে দরজার দিকে এগোতে লাগল সুমিত। রাগে তখন তার শরীর জ্বলছে। ভারতীর দিকে ফিরেও তাকালো না। লম্বা লম্বা পা ফেলে বাইরের দিকে পা বাড়াল। হঠাৎ পিছন থেকে তার জামাটা টেনে ধরল ভারতী। পিছন ফিরেই এক ঝটকায় ওর হাত থেকে জামাটা ছাড়িয়ে নিল কিন্তু ভারতী দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পথরোধ করে দাঁড়াল এবং তার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে বলল, এই, রাগ করিসনা, বোকা কোথাকার, এতক্ষণ একটু মজা করছিলাম। ছেলেদের বাপু কথায় কথায় রাগ, এতো রাগ ভাল লাগে না।

মিনতিভরা ওর হাতের স্পর্শ পাওয়ামাত্র সুমিতের মনের রাগ নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল। দর কমে যাবে বলে নিজের মনের ভাবটা জানতে না দিয়ে কঠোর স্বরেই বলল সে, একটা কথাও না বলে তুই মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে চেয়ে রইলি, আর এখন কিনা ছেলেদের রাগের নিন্দা করছিস? তোদের রাগই রাগ, আমাদের বুঝি কিছু নেই?

মুচকি হেসে ভারতী বলল, থাম্, আর কথার ফুলঝুরি ছাড়তে হবে না। মাকে চালটা ধুয়ে দিতে হবে। এখানে বসেই পড়বি সব, খাতার পাতাটা ছিড়বি না কিন্তু। আমি মার কাছে গিয়ে কিছু কাজ করে দিয়ে আসি। নইলে আবার চিৎকার শুরু করবে।

সুমিতের হাতে না দিয়ে সামনের টেবিলের ওপর খাতাটা ধপ্ করে ছুড়ে দিল ভারতী। ঘর থেকে ও চলে যেতেই সুমিত চেয়ারটায় গিয়ে বসে চোখের সামনে মেলে ধরল খাতার সেই পাতাটা। এবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে গোড়া থেকে লেখাটার ওপর চোখ বুলোতে গিয়েই দেখল কোনো শিরোনামা নেই, চিঠি বলে মনে হবে না মনে হবে যেন কিছু একটা প্রশ্নের উত্তর একটানা মুখস্ত করে লিখেছে। হাতের লেখাটা ওর খুবই সুন্দর। তার কাছে আরও সুন্দর এইজন্য, একান্ত তাকে উপলক্ষ্য করেই এই লেখা। মনের ভাবটুকু আবেগ মিশিয়ে ভারতী লিখেছে···তোর ভালমন্দ তো আমারও ভালমন্দ। কোনো সৎসঙ্গে মিশে যদি তোর উন্নতি হয় তবে তা হবে আমার গর্বের, কিন্তু যদি একটা অসৎ সঙ্গে মিশে তোর ক্ষতি হয় সে ক্ষতি হবে, আমার জীবনের ভীষণ অভিশাপ। লোকেরা বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তোকে লক্ষ্য করলে আমি তা সহ্য করতে পারব না। পতির অপমানে যদি সতী দেহত্যাগ করতে পারে, তবে তোর অপমানে আমারই বা কষ্ট হবে না কেন? তোকে ভাল হতেই হবে। আমার জীবনের তুই-ই একমাত্র স্বপ্ন। তোকে কেন্দ্র করেই আমার সব কল্পনা। তুই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবি, এটাই কাম্য। মূল লক্ষ্য থেকে কোন ভাবেই সরে আসলে চলবে না। আমার মনের বাসনা, অন্তরের কামনা তোকে পূর্ণ করতেই হবে। মুখে বলে বা দু-পাতা চিঠি লিখে সব বোঝাতে পারছি না। তবু বলছি, সুন্দর নীড় তখনই সম্ভব যদি সুন্দর জীবন গড়ে তোলা যায়। অর্থই বড় কথা নয়—সহানুভূতি, সহমর্মিতা, প্রেম ও ভালবাসাই সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে পারে।

এ সব কি লিখেছে ভারতী! এতো ভালবাসে ও আমাকে? ভাগ্যিস

আমি আর বাড়াবাড়ি করিনি। না বুঝে আমি ওর মনে কতবড় আঘাত দিতে যাচ্ছিলাম!—নিজের সম্বন্ধে এইসব ভাবতে ভাবতে আনন্দের আবেগে স্থমিত বার বার চিঠিটার প্রথম থেকে শেষপর্য্যন্ত পড়তে লাগল। ইত্যবসরে ভারতী কখন আবার ঘরে ফিরে এসেছে জানতেও পারেনি। নিঃশব্দে ও এসে তার পিছনে দাঁড়িয়েছে। এক সময় ওর হাতের গামছা তার মুখের ওপর পড়াতেই চমকে উঠে ওকে দেখেই চট্ করে খাতাটাকে দু'হাতে চেপে ধরল।

এবার কিন্তু ভারতী খাতাটা নেবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করল না। গম্ভীর মমতাভরা দৃষ্টি নিয়ে সে বলল, কিরে, কতটা রাগ করলি?

এ কথার জবাব দেবার সামর্থ স্থমিত তখন হারিয়ে ফেলেছে। ভারতীর হাতটা নিবীড় করে চেপে ধরে শুধু ওর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ওর স্পর্শে যে এত গভীর আনন্দ আছে এর আগে সে কখনও বোঝেনি। ওর মুখটাও স্নেহময়ী করুণার রূপে নিয়ে স্থমিতকে দেখছিল। এইভাবে দু'এক মিনিট সময় কোথা দিয়ে যে কেটে গেল তা বুঝতেই পারল না স্থমিত। ওর হাতদুটো টেনে সে তার বুকের মধ্যে তুলে নিল।

হাত ছাড়িয়ে না নিয়ে ভারতী সচকিতভাবে বলে উঠল, এই, কি হচ্ছে? মা এসে পড়বে!

সলজ্জ ভারতীর হাত দুখানা ছেড়ে দিয়ে স্থমিত একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। এই অবসরে ভারতী খাতাটা বন্ধ করে ফেলল।

স্থমিত গাঢ়স্বরে বলল: এই, খাতাটা দে না, আর একবার চিঠিটা পড়ি। এই চিঠিটা আমার নিজের কাছে রাখবার জন্য ভীষণ ইচ্ছে করছে।

মাথা দুলিয়ে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে ভারতী বলল, না না, আর পড়তে হবে না। মাথাটা খারাপ হ'য়ে যাবে। আগের কাজ আগে কর, এটা পরের কাজ। আজ তো সকালে তোর পড়ার সাড়াই পেলাম না।

স্থমিত বলল, আজ সকালে গিয়েছিলাম অশীষের বাড়ি। ওর মাষ্টারের কাছে এই ক'মাস পড়ব ভাবছি। আজই বিকেলে ওর মাষ্টারের কাছে নিয়ে যাবে বলেছে। ওর কথায় হয়তো মাষ্টারমশাই আমাকেও পড়াতে রাজী হবেন।

মহেন্দ্রমাষ্টারের নাম ডাক এবং তার কাছেই যে আশীষ পড়ে তা ভারতীও জানে। স্থতরাং এই ব্যাপারে ও খুশী হয়ে বলল, মহেন্দ্রবাবু

তো ? বেশ ভালই হবে। ওনার পড়ানোর ভীষণ নাম ডাক আছে। ভালই পড়ান—ওনার ছাত্ররা কেউ-ই সাধারণতঃ ফেল করে না। আরো ভালো এইজন্যে যে আমিও নোটগুলি তোর থেকে পেয়ে যাবো।

সুমিত একটু হেসে বলল, তবে তুই অর্ধেক টাকা দিবি। তুই দিলেও তো আমার দেওয়া হল। তোরটাই তো আমার, তোর আর আমার মধ্যে তফাৎ কি বল ?

সম্মতি সূচক মাথা নেড়ে ভারতী বলল, অমন ভাগ করতে হবে না। অর্ধেক কেন বেশী পারলেও আমি সব ম্যানেজ করব। ভালমত তৈরী হ'তে পারছিস, তাতেই আমার আনন্দ।

এমন একাত্ম করে তাকে ভাবতে পারে তা কোনোদিন কল্পনা করেনি সুমিত। ভারতীর আন্তরিকতা পূর্ণ কথাগুলি তাকে অভিভূত করে ছিল। কিছুতেই তার ভারতীর কাছ ছাড়তে মন চাইছিল না। তবু তাকে এবার উঠতেই হবে।

ব্যথিত কণ্ঠে সে বলল, আর বেশী অপেক্ষা করা যাবে নাবে। এবার চলি। স্কুল যেতে হবে, ফিরেই যাবো মহেন্দ্রমাস্টারের বাড়ি। এই শোন—চিঠিটা ফেলবি না কিন্তু। রাত্রে এসে আর একবার পড়ব।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সুমিত। ওর মুখের দিকে চেয়ে আবার বলল, ভীষণ রাগ করেছিলাম, এখন আর রাগ নেই। চলি—বলতে বলতে দরজার দিকে পা বাড়ালো। ওদের ঘরের পেছনের ফুলগাছগুলির পাশ দিয়ে রাস্তায় যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে দেখল, ভারতী জানলার জালটা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিজের মুখটা চেপে ধরেছে জালের উপর। সুমিতের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লজ্জাকভাবে মাথাটি নত করে নিল। অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, আজ রাতে আরেকবার আসিস কিন্তু।

ভারতীর এমন মধুর সান্নিধ্য ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে মনের মধ্যে গভীর বেদনা অনুভব করছিল সুমিত। নেবু গাছ পর্যন্ত এগিয়ে একবার পিছন ফিরেই সবিস্ময়ে দেখল ভারতী বালতি হাতে করে নিঃশব্দে পিছু পিছু চলে এসেছে। দূর থেকেই আড়চোখে তাকে বারবার দেখছে। এখানে দাঁড়িয়ে তো ওর সঙ্গে আর কথা বলা যাবে না। এটা যে পাড়ার সদর রাস্তা। এখন শুধুই চোখের দেখা। রোজই তো দু'জন দু'জনকে কতবার দেখছে। তবু যেন তাদের দেখার নেশা মিটছে না। অনিচ্ছুক পা-টা টেনে টেনে এগোতে লাগল বাড়ির দিকে। বাড়িতে ঢুকেই

চেঁচিয়ে বলল, ও মা, রান্না হয়েছে ?

মা বললেন, হ্যাঁ।

মুহূর্তমাত্র দেরী না করে সুমিত চলে গেল কলে। স্নান করে এসেই তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে চলে গেল স্কুলে।

সামনেই প্রিটেস্ট পরীক্ষা। এই সময়ে মহেন্দ্র মাস্টারমশাই-এর কাছে পড়া, বাড়িতে পড়া, মাঝে মাঝে দীনাদার টোলে পড়া ইত্যাদি পড়াশোনার একটানা কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়ে তার দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। এখন একটাই শুধু কল্পনা, তাকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে। তাকেও দীনাদার মত একদিন সকলের প্রিয় হয়ে উঠতে হবে। অন্য উদ্বাস্তুদের মত দণ্ডকারণ্যে না গিয়ে সংসারের সকল দুঃখ কষ্ট দূর করার ভবিষ্যৎ দায়িত্ব সে মাথায় তুলে নেবে বলে মাকে আশ্বাস দিয়েছে।

যথাসময়ে তাদের প্রিটেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেল পরীক্ষাটা যতদূর সম্ভব ভালভাবে দিল সে কিছুদিন পরই ক্লাসে মাস্টারমশাইরা একটা একটা করে প্রতি বিষয়ের ফলাফল ঘোষণা করতে শুরু করলেন। সে সকল বিষয়েই ভাল ভাবে পাশ করেছে।

সুতরাং পড়াশোনায় আর ও তাকে মন দিতে হ'ল। পাড়ার অন্য কোন ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় রইল না। এমন কি ভারতীও কেমন যেন নিজেকে দূরে দূরে রাখতে শুরু করেছে।

এই সময়ে এগিয়ে এলো দুর্গাপুজোর ছুটি ছুটিতে এখানকার কেউই বাইরে যায় না। যাবার তেমন সুযোগও নেই উদ্বাস্তুদের। শিবিরের অঞ্চলে বন্দী হয়েই উদ্বাস্তুরা শারদীয় উৎসব উপভোগ করে। সেটুকু উপভোগের সুযোগও সুমিতের রইল না। নতুন করে আবার তাকে প্রস্তুতি নিতে হবে সামনের টেস্ট পরীক্ষার জন্য। পুজোর ছুটির পরই তো সেই পরীক্ষা।

পরীক্ষার জন্য সর্বদা সুমিত ভীত। উদ্বিগ্ন চিত্তে মা ও দিনগুলো কাটাচ্ছেন। প্রস্তুতির কোন ত্রুটি রাখলে চলবে না। মায়ের মনে সর্বদা প্রতিফলিত হচ্ছে কল্পনার ছাপ—তাঁর দৃষ্টিতে রয়েছে সুমিতের ভবিষ্যৎ।

প্রতি রাতেই না ঘুমিয়ে মা জেগে বসে থাকতেন সুমিতের পাশে। তাকে উৎসাহ দেবার জন্য মার এই কৃচ্ছ্রসাধন। সুমিত কখনো কখনো দেখত মাঁর মুখে চোখে কত ক্লান্তির ছাপ। তবুও তিনি অনড়।

সুমিত আপন মনে পড়ত, আর ভাবত—টেস্টে পাশ করলেই আবার

পরীক্ষার ফি-এর টাকা সংগ্রহ করতে হবে। কি করে করবে?

এই সব ভেবে ভেবে সুমিত নার্ভাস হয়ে পরত, তাই ওর মা মাঝে মাঝে বলতেন—ওসব ভাবনা আমার পাশটা ত কর, তখন দেখা যাবে।

হ্যেরিকেনের আলোর সামনে বসে সুমিতকে সর্বপ্রকার উৎসাহ জুগিয়ে এমনি করে প্রতিদিনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত গুণে চলেছেন, কবে তার ছেলের সাফল্যের সেই শুভ দিনটি আসবে.

মাননীয় মহেন্দ্রমাষ্টারও খুব জোর দিয়ে তাদের জন্য চেষ্টা করছেন। শীতের কনকনে ঠাণ্ডা রাত উদ্বাস্তু শিবিরবাসীরা লেপ-কাঁথার-তলায় নিদ্রামগ্ন। কোথাও কোনো প্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। সুমিতরা কিন্তু তখনও মাষ্টারমশাইএর বাড়িতে বসে পড়াশোনা করে চলেছে। সুমিতের গায়ে ডোরাকাটা পাতলা সরকারি জামা। তার উপর সরকার বাহাদুরের দেওয়া কম্বল। এটাই সময় অসময়ে চাদরের কাজ করত। প্রায় দিনই তারা বারোটার পর মাষ্টারমশায়ের বাড়ি থেকে ছাড়া পেত।

একদিন একটা মজার ঘটনা ঘটল. এই সময়ে উদ্বাস্তু শিবিরের বাজারে পালাকীর্তন চলছিল। পড়ুয়া দলের সব বন্ধুরা মিলে একদিন পরামর্শ করল: আজ বাড়ি ফেরার পথে সবাই একবার বাজারের কীর্তন শুনতে যাবে। সুমিতও ওদের মতে মত দিল। সেদিন পড়াতে পড়াতে মহেন্দ্রবাবু একবার যখন বাইরে গেলেন. সেই সুযোগে আশীষ ওনার কৌটো থেকে চারপাঁচটা বিড়ি তুলে নিলো। শীতের রাত। সকলেরই ইচ্ছা পথে যাবার সময় ধূমপান করে শরীরটা গরম করবে।

পড়া শেষ হতেই সকলে ঘরের বাইরে চলে গেল। বসার মাদুরগুলি গুটিয়ে দরজার পাশে রাখতেই মহেন্দ্রবাবু ইশারা করে সুমিতকে বাইরে ডাকলেন। সুমিত তাঁর কাছে যেতেই তিনি ফিসফিস্ করে বললেন, এই সুমিত, শোনো।

সুমিত ওনার কাছে আর একটু ঘেষে দাড়াতেই উনি বললেন, কিছু দেখছ?

কৈ স্যার, কিছু দেখছি না তো। সুমিত বলল।

দাঁত চিবিয়ে উনি বললেন, তা তুমি দেখবে কেন? তুমি তো ঐ দলের গাধা নয়।

সুমিত আবার ওঁনার দৃষ্টি অনুসরণ করে কিছু বুঝতে না পেরে বাইরের দিকে চোখ রেখে বলল, কোথায় স্যার?

—দেখছ না, ওরা আমার বিড়িগুলো নিয়ে হ্যোরিকেনের আগুন দিয়ে ধরাচ্ছে।

তাইত! সুমিত লজ্জায় হতবাক্।

মাস্টারমশাই ও সুমিতের কথাবার্তা ওদের কানে গিয়ে পেঁছুল। ওরা তাড়াতাড়ি ফুঁ দিয়ে হ্যোরিকেনটা নিভিয়ে দিয়ে, মারল ছুট।

মাষ্টারমশাই বলে উঠলেন, দেখ দেখ বোকাগুলির কান্ড। অন্ধকারে হ্যোরকেনটা নিভিয়ে দিল, কিন্তু মুখের আগুনগুলি যাবে কোথায়?

আর কোনো কথা না বাড়িয়ে আবার বললেন, ওদের ডাক দাও, নয়তো এই রাতে তুমি একা বাড়ি ফিরতে পারবে না।

সুমিত ওদের তারস্বরে ডাকতে লাগল, ওরাও প্রাণপণে ছুটতে লাগল। অগত্যা মাষ্টারমশাই সুমিতকে বললেন, তুমি তাড়াতাড়ি ছুটে ওদের গিয়ে ধর, আমি দাঁড়াচ্ছি।

ওদের পিছু পিছু ছুটল সুমিত ছুটতে ছুটতে কিছুদূর গিয়ে ওরাও দাঁড়িয়ে পড়ল দেখা হতেই ওরা সকলেই স্নুমিতকে দোষ দিতে লাগল। কেউই কিন্তু নিজের নির্বুদ্ধিতা স্বীকার ক'রল না। ভাগের পাওনা বিড়িটা হাতে পেয়ে স্নুমিত ওদের সব বকাঝকা ভুলে গেল। সকলে গিয়ে তারপর ঢুকল বাজারে।

বাজারের চত্বরে পালাকীর্তন চলছে। উদ্বাস্তু শিবিরের বৃদ্ধবৃদ্ধার দল কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে ভক্তিতে গদগদ হ'য়ে একমনে কীর্তন শুনছে। স্নুমিতরাও চুপি চুপি গিয়ে তাদের পিছনের সারিতে বসে পড়ল।

মুখের জ্বলন্ত বিড়িটা মাটিতে ঘষে নিভিয়ে দিয়ে কোলের উপর বইকটা রেখে গায়েমাথায় কম্বলটা ভাল করে জড়িয়ে নিল স্নুমিত। মন দিয়ে সবাই গান শুনতে লাগল গানের তালে তালে আবার নৃত্য। বড় মজাই লাগছিল ওদের।

কিন্তু এই সুখ ওদের কপালে বেশীক্ষণ সইল না। কয়েক মুহূর্ত পরেই স্নুমিতের গায়ের কম্বলটা হঠাৎ চিলের মত ছোঁ মেরে কে যেন নিয়ে নিল। শীতের কনকনে হাওয়া স্নুমিতের শরীরকে আড়ষ্ট করে ফেলল।

—'এই যাঃ—' বলে চিৎকার করে উঠল স্নুমিত। ভাবল নিশ্চয় এটা আশীষের কাজ কম্বলটা টানবে বলে চাকতে পিছনে মুখ ঘোরাতেই দেখল এক অভাবনীয় দৃশ্য। বিশালদেহী তাদের মাষ্টারমশাই তার গায়ের

কম্বলটা হাতে ধরে পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বইগুলি হাতে নিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সে। তখনও তার অন্য বন্ধুরা ওনাকে দেখতে পায়নি।

উনি কিছু বলার আগেই নিরুপায় হয়ে সুমিত বলল, স্যার, ওরা কেউ বাড়ি গেল না, আমি তাই বাধ্য হয়ে বাজারে এসেছি।

এবার ওদেরও টনক নড়ল। দাঁড়িয়ে উঠল ওরাও। কেউই কিন্তু ছুটে পালাতে পারল না। সদলবলে ওরা ধরা পড়ল মাস্টারমশাই-এর কাছে। মাথা নীচু করে নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা।

থমথমে গম্ভীর মুখে মাস্টারমশাই তাঁর হাত থেকে কম্বলটা সুমিতকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, গাধাগুলিকে এখনই সঙ্গে নিয়ে বাড়ি চলে যা। সকালে উঠেই পড়তে হবে। বাড়িতে মা চিন্তা করছেন, খেয়াল নেই— হতভাগা!

'আর কোনদিন আসবো না—'বলে সুড়সুড় করে সকলেই ওরা কীর্তনের আসর থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। অন্ধকারে মাস্টারমশাইকে আর দেখতে পাওয়া গেল না।

পথ চলতে চলতে এবার ওদের মধ্যে শুরু হ'ল নানা জল্পনাকল্পনা। আশীষ বলেই বসল, নিশ্চয় সুমিত বলে দিয়েছে, নয়তো কি ক'রে উনি জানলেন যে আমরা গান শুনতে যাব?

সকলেই আশীষের কথাকে সমর্থন করল। কিন্তু অন্ধকারে প্রত্যেকের মুখের জ্বলন্ত বিড়ির আগুন যে মাস্টারমশাইকে অনুসরণ করতে সাহায্য করেছে কেউই তা বুঝতে চাইল না। এই নিয়ে ঝগড়া করতে করতে সে রাতে ওরা বাড়ি ফিরেছিল।

এমন অনেক রাত্রের মধুময় স্মৃতির কথা সুমিতের আজও মনে আছে।

দুঃখ দৈন্যের মধ্যেও শিবিরে প্রাণের চাঞ্চল্য ছিল। ধুবুলিয়া বাজার সমিতির পরিচালনায় প্রতি বৎসর—তিন বা চার দিনব্যাপী যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হত। যেহেতু এখানে কোন সিনেমা হল বা অন্য কোন মনোরম চিত্তবিনোদনের কিছু ছিল না, সেই হেতু যাত্রাপালা দেখার জন্য লোকের ভীড় উপচে পড়ত। বিশেষ করে শিশু এবং কিশোর ছেলে-মেয়েরা ভীষণভাবে যাত্রাপালা উপভোগ করত। এর বিশেষ কারণও ছিল···যাত্রায় ইতিহাসের সাজাহান থেকে শুরু করে লর্ড ক্লাইভকে রাজকীয় পোষাকে দেখা যেত। সারা শরীরে চকচক করত ঝলসানো জামা

কাপড়। কোমরে গোঁজা থাকতো তলোয়ার। মাথায় থাকত রাজার মুকুট। অভাবনীয় সেই দৃশ্য। তাই শিবিরের লোকেরা ভীষণ কৌতূহলের সঙ্গে উপভোগ করতো যাত্রাপালা। আলোক সজ্জা বলতে শুধু মাত্র চারটা হ্যাজাক লাইট প্যাণ্ডেলের সঙ্গে ঝুলতো।

যাত্রা শুরু হত রাত দশটা কি এগারোটার পর। শিবিরের উদ্বাস্তুরা খাওয়া দাওয়া শেষ করে, হাতে একটা করে চাটাই নিয়ে বসে পড়ত প্রশস্ত বাণওয়ের উপর শুরু হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত শোনা যেত শিশু ও কিশোর বালক বালিকাদের চিৎকার—আর হৈ চৈ।

যেই মুহূর্তে বাঁশের ঘেরা গণ্ডির মধ্য দিয়ে বাজনদারদের আসা শুরু হত; তাদের দেখে আরও চিৎকার শুরু হয়ে যেত। জনতার মধ্যে উৎসাহের হুল্লোড় পড়ে যেত। কল্পনার রাজার আসার সময় আগত প্রায়। ধীরে ধীরে বাজনদারগণ তাদের জায়গা দখল করে বসে পড়ত। একটু একটু করে বাজনার আওয়াজ কর্ণকুহরে পৌঁছতে লাগল। ওনারা তখন যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখছেন। তারই মধ্যে বাদাম, লজেন্স, চানাচুরের প্যাকেট নিয়ে হকারের দল 'একটু দেখি দাদা, বলে যাবার পথ করে নিয়ে 'চাই নাকি দাদা, নেবেন নাকি', বলে হাঁক দিচ্ছে।

কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে যদি রাজার মুকুটটা গ্রীণ রুমের বস্তা ঘেরা জায়গা থেকে উঁচু হয়ে দেখা দিয়েছে, তো আরও চিৎকার চেঁচামেচি বেড়ে যেত। যেন কতদিনের আকাঙ্ক্ষিত রাজা আসছে। তিনি প্রস্তুত তার বেশভূষা নিয়ে। এবার বেজে উঠল বাজনা। বাঁশির জোড়ালো টান দর্শকদের সময়ের সংকেত দিয়ে জানিয়ে দিত, পালা শুরু হতে আর সামান্য সময় বাকি। এমন করে তিনবার বাজনা বাজতো। সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখ স্থির হয়ে থাকতো গ্রীন রুমের দিকে, রাজার আবির্ভাবের সম্ভাবনার জন্য।

চিৎকার করতে করতে যাত্রার স্টেজে আসছে সাহাজাহান ···না-না— জাহানারা, ওকে ক্ষমা করা যায় না। ও দারাকে হত্যা করেছে, সুজাকে করেছে বন্দী। আমাকে অন্তরিক্ষে করেছে নজরবন্দী!

তারা পিছু পিছু আসতে শুরু করত জাহানারা। এমন উপভোগ্য দৃশ্য এখানকার দর্শকদের মন কেড়ে নিত। সব চুপ, একটি কথাও নেই। বোঝাই যেত না যে এখানে এত লোক এক সঙ্গে বসে আছে!

কখনও বা এমনও হয়েছে, সাহাজাহানের সেই করুণ আবেদন,

দর্শকদের চোখে জল এনে দিয়েছে। দর্শকরা কাঁদছে। এর মধ্যে সাহাজাহান বলে চলেছে,....শুনতে পাচ্ছিস জাহানারা, আমার প্রজারা প্রাসাদের বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলছে, সম্রাট সাহাজাহানের জয়। ওরা বলছে, ঔরঙ্গজেবের অত্যাচার মানবে না। জাহানারা আমি বৃদ্ধ স্থবীর। তুই একবার আমাকে হাতে ধরে ওদের কাছে নিয়ে যেতে পারিস, আমি ওদের বলব, আমি এখনও মরিনি। আমি তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারের প্রতিকার করব।

আবার একটু স্থির দৃষ্টিতে দূর পানে চেয়ে থেকেই বলল, না-না—জাহানারা, ঐ তোর মা—মমতাজ বলছে, তুমি না ওকে ক্ষমা করেছ? তুমি না ওর পিতা! মমতাজ কাঁদছে, মমতাজের চোখে জল। না-না—জাহানারা—তুই প্রজাদের বল, সম্রাট সাহাজাহান মৃত। সে আর কিছুই করতে পারবে না।

শুনতে শুনতে দর্শকরাও হাউ হাউ করে কাঁদছে। তাদের সামনে—শৃংখলে আবদ্ধ সাহাজাহান। অদূরে তাজমহল। পুরো ইতিহাসটা ভেসে উঠেছে। সবাই মন প্রাণ দিয়ে ভোগ করতো এমন সুন্দর যাত্রা পালা।

সুমিতের আবার মনে পড়ে, হরিশ্চন্দ্র পালার একটা করুণ দৃশ্যের কথা। কি ভয়াভয় তার রূপ! পুত্রহারা মা সন্তানকে কোলে নিয়ে বসে, সন্তানকে দাহ করার মত একটা কড়িও নেই। আর তারই স্বামী স্বয়ং রাজা হরিশ্চন্দ্র সর্বত্যাগী। ডোম কড়ির জনা কঠিন পণ করতে লাগল। পরিচয় হতে, রাজা তার ভাগ্যের পরিহাসের জন্য কাঁদছে। স্ত্রী কাঁদছে রাজার এমন পরিণতি দেখে দর্শকদের চোখের বাঁধ ভেঙ্গে জলের বন্যা বইতে শুরু করত। সুমিতের বেশ মনে আছে, সেদিন সেও কান্নাকে রোধ করতে পারেনি। যাত্রা বিষয়টা এই অঞ্চলে ভীষণ জনপ্রিয় ছিল!

যাত্রা শেষ হতে প্রায় ভোর হয়ে যেত। রাতে শেষে পরিতৃপ্তির নেশা এবং সারা রাত জেগে থাকার জন্য দর্শকদের চোখ দুটো ছোট হয়ে আসত। তবু কত আনন্দ হত, ভাষায় বোঝান সম্ভব নয়।

ঠিক এমনি উপভোগ্য ছিল শিবিরের সরস্বতী পূজা। এখানে ছিল অগুনতি ক্লাব। প্রত্যেক ক্লাবে একটা করে সরস্বতী পূজা হত। দুর্গাপূজো এখানকার অর্থনৈতিক অবস্থায় ছিল, ব্যয়বাহুল্য ব্যাপার।

সেই তুলনায় সরস্বতী পূজো ছিল অল্প ব্যয়সাধ্য। তাই এই পূজো ভীষন অনাড়ম্বর অনুসারে হত। কম করে দু'তিন শো সরস্বতী পূজো হতো!

পূজোর তিন-চার দিন আগে থেকে পড়তো সাজ-সজ্জার তোড়জোড়। প্রতি ক্লাবের সামনে একটা করে মণ্ডপ তৈরি হত। তবে বাইরের দৃশ্যাবলি তৈরি হত স্থানীয় গাছগাছালি দিয়ে। আর্থিক কারণ ছিল এর মূলে। তবে বালক বালিকারা অতি আগ্রহের সংগে কলাগাছ বা দেবদারু পাতা সংগ্রহ করে চার পাঁচ দিন ধরে রূপসজ্জায় ব্যস্ত থাকতো।

পূজোর ঠিক আগের দিন চারদিকে শুধু মাইক আর মাইক। মাইকের এমন চিৎকার শুরু হত, কোন মাইকে কোন গান বা পালা চলছে, কারও বোঝার ক্ষমতা ছিল না। শুধু একটা বিকট আওয়াজ আকাশ বাতাসময় ছড়িয়ে পড়ত। তাতেও তাদের দুঃখ নেই। এটা এখানকার জাতীয় উৎসব বলে পরিগণিত হতো। সারা রাত জেগে ছাত্র-ছাত্রীর দল মাইকের শব্দ শুনতো, আর মায়ের সাজের শেষ কাজটা নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। সারা রাত ধরে চলত, তাদের কাজ। ভোর হতে না হতেই ছাত্র-ছাত্রীরদল ছুটে যেত স্নান করতে। কারণ এরপরই কলার পাতা কেটে বিশাল আখের রাশিকে কেটে টুকরো করতে হবে। এমন পবিত্র ও সুন্দর পরিবেশ কল্পনায় ভাবা যায় না বা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সকলেই যেন মা সরস্বতীর সেবা যত্নের মধ্য দিয়ে কথা আদায় করে নিতে চাইছে, সামনের বছর যেন পরীক্ষার ফল ভাল হয়। সে যাই হোক, নিষ্ঠার কোন ত্রুটি ছিল না। এই দিন ছিল পুরোহিতদের মজা লোটার দিন। একটা ধুতি পরে, কাঁধে একটা গামছা ফেলে গ্রুপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে চলেছে। তাদের ব্যস্ততা ছাত্র-ছাত্রীদের মনে ভয়ের সঞ্চার করত। কলার পাতায় নানান ফলের সমারহ তৈরি করে, সাঁজ সকালে স্নান করে শীতের উত্তুরে হাওয়ায় ঠকঠক করে কাঁপছে। গায়ে একটা পাতলা জামা। উপায় নেই মায়ের পায়ে তাদের বিশেষ নিবেদন রাখতেই হবে। এমন মনোরম দৃশ্য ভাবাই যায় না।

কোনো মতে একবার পুরোহিত মশায়ের নাগাল পেলেই হয়। হাঁটু গেড়ে বসে, সবাই শুরু করত, দেবীর বন্দনা এবং প্রার্থনা। সবশেষে অঞ্জলি দিয়ে দেবীকে সন্তুষ্ট করত। এমনি করে সারাটা দিন মহা

আনন্দে কাটতো। সন্ধ্যে হলেই শিবিরবাসী মহা আনন্দে দেবী দর্শনে বেড়িয়ে পড়ত। চলত সারা রাত ধরে এই দর্শনের পালা।

পরের দিন দেবীর প্রত্যাবর্তনের পালা। আজ দেবীকে বিসর্জন দিতে হবে। এই শিবিরের নিয়ম ছিল, বিসর্জনের দিন সকলে ঠেলাগাড়ী করে দেবীর মূর্তি নিয়ে হাজির হত, হেড অফিসের সামনে।

এক বৎসর এই বিসর্জনের প্রাক মুহূর্তের ঘটনা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। প্রায় দু'শো সরস্বতী মূর্তি লাইন দিয়ে হেড অফিসের সামনে রাণওয়ের উপর দাঁড়িয়ে। সকলে অপেক্ষা করছে শিবিরের সর্বময় কর্তা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার বাবু আসবেন এবং কোন প্রতিমা সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে ঘোষনা করবেন। তিনি প্রথম পুরস্কার বিতরণ করবেন। এই অপেক্ষার মধ্যে প্রত্যেক পাড়ার ছেলেরা নিজের নিজের প্রতিমার সামনে আরতি করছে, ঢাকি ঢাক বাজাচ্ছে, ফলে সমস্ত পরিবেশটাই ধোঁয়ার কুণ্ডলী, আর আবছা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

কানে দু'-তিনশ ঢাকের বাজনা একসঙ্গে আঘাত করছে। স্বয়ং বর্গীরাও এই আওয়াজ শুনলে ভীত হত। কিন্তু শিবিরবাসী ঠিক এই অবস্থাকে তাদের নিজস্ব উৎসব করে তুলে নিয়েছিল। ফলে এর আনন্দ ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শিবিরবাসীর নিজস্বতা লোক সমাগম দেখলেই বিশ্বাস করা যায়।

এমন একটা দিনে এই দেবীদের সমাগমের মধ্যেও ভীষণ কান্ড বেঁধে গেল। শিবির অধিকর্তা একটা একটা করে দেবীমূর্তি দর্শন করছেন। তার পিছু পিছু অসংখ্য লোক এবং ছেলের দল ঘুরছে। কর্তা সাহেবের নিজস্ব মতামত জানবার জন্য। সমস্ত অঞ্চলটা ঘুরে দেখার পর তিনি ঘোষণা করতেন, কোন দেবীমূর্তি সব চেয়ে বেশী সুন্দর হয়েছে এবং কে সেই প্রথম পুরস্কার পাবে।

হঠাৎ সেবার দেখা গেল, অধিকর্তা চলে যাবার ঠিক পর মুহূর্তে একদল যুবক এসে তাড়া করেছে, বিবেকানন্দ সঙ্ঘের দেবীমূর্তির উপর। বিবেকানন্দ সংঘের ছেলেরা ঠেলাগাড়ীকে লাইন থেকে বের করে নিয়ে প্রাণপণে ছুটছে, নিজেদের গ্রুপের দিকে। দেবীর শেষ রক্ষা করার জন্য। বিশাল রানওয়ের উপর ঠেলাগাড়ীর লোহার বেড়ি দেওয়া চাকার সংঘর্ষে ঘড় ঘড় শব্দ হতে লাগল। ওদের ছুটতে দেখে সমস্ত ক্লাবের ঠাকুর এবং ছেলের দল ছুটছে সমস্ত রাস্তা জুড়ে শুধু ঘড় ঘড় শব্দ। সকলেই

প্রাণের ভয়ে ছুটছে। সবাই হয়তো আসল ঘটনাই জানে না, তবু ছুটছে।

এবার একদল যুবক ছুটতে ছুটতে এসে হাতের বিশাল লাঠি দিয়ে আঘাত করল, বিবেকানন্দ সংঘের প্রতিমার মাথার উপর। দেবীর মূর্তি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সংঘের ছেলেরা দেবীর শেষ রক্ষা করতে পারল না। দেবী লাঞ্ছনার কারণ হিসেবে জানা গেল, এইবার এই দেবীর মূর্তিই অধিকর্তার বিচারে প্রথম হয়েছে। কিন্তু অন্য একদল যুবক এই ঘোষণায় সন্তুষ্ট হতে পারল না। তার জন্যই এই বিশাল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ।

যেই মুহূর্তে বিবেকানন্দ সংঘের দেবীমূর্তি ভূ-লুণ্ঠিত হয়ে পড়ল, তাদের মাথার রক্তও গরম হয়ে গেল। দেব-দেবী নিয়ে যুদ্ধ একমাত্র রামায়ণ-মহাভারতেই শোনা যায়। নিজের চোখে দেখা যায় না। সুমিত প্রত্যক্ষ করল সেই যুদ্ধ।

এবার বিবেকানন্দ সংঘের ছেলের দল, রাস্তার পাশের পরে থাকা বড় বড় পাথর হাতে তুলে নিল। ছুটতে লাগল দ্রুতগামী ঠেলাগাড়ীর দিকে। কে সেই অপরাধী এবং কারাই বা ওদের দেবীমূর্তিকে ভেঙেছে তা দেখার বা বিচার-বিবেচনা করার দরকার নেই। হাতের সামনে যে মূর্তি পাওয়া গেল, মারল তার গায়ে আঘাত। ধপ করে পরল লুটিয়ে মাটিতে। এমন করে বিশাল আনন্দের পরিবেশটা যুদ্ধের আকার ধারণ করল। সমস্ত দেবীর গাড়ীগুলি ছুটছে। সমস্ত রাস্তায় লোকের হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। লোকের চেয়ে দেবী সরস্বতীর বেশী দুর্ভোগ দেখা দিল। সেই রাত্রের এই বিভৎস ঘটনায় প্রায় ছ' সাত খানা ঠাকুর ভেঙ্গে পরে গেল। তবুও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই উৎসব অত্যন্ত আনন্দদায়ক এবং মনোরম ছিল।

টেষ্ট পরীক্ষা সুরু হবার আর মাত্র দু'দিন বাকী। যথাসম্ভব প্রস্তুতি ও শেষ, তবু সুমিতের ভাবনার শেষ নেই। জীবনের এক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে যেতে পারবে কিনা, এই চিন্তাই সর্বদা তাকে ঘিরে রেখেছে। এর আগে এতগুলি ক্লাসের পরীক্ষা দিয়েছে, কৈ, এমন দুশ্চিন্তা তো কখনও হয়নি তার। যতদিন এগিয়ে আসছে, ওর খাওয়া-দাওয়ার কোন খেয়ালই থাকছে না। রাতের ঘুম প্রায় নেই বললেই চলে। সদাসর্বদা একটাই চিন্তা, এ তরীকূলে ভেরাতেই হবে।

পরীক্ষার দিন সকাল থেকে ব্যস্ততার সীমা নেই। কোথায় কলম, কোথায় কালি, কোথায় পেনসিল—সব কিছু গুছিয়ে নিল সুমিত। সকাল আটটা বাজতেই স্নান সেরে নিল। ভাতও খেয়ে নিল প্রতিদিনের চেয়ে বেশ আগেই। খাওয়াদাওয়া সেরে জামাপ্যাণ্ট পরে তৈরী হ'ল সে।

ঘরের এক কোণে তিনখানা ইট পেতে ঠাকুরের আসন পেতেছিলেন ওর মা। মাথা নীচু ক'রে সটান হ'য়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে ঐ আসন ছুঁয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করল। অলক্ষ্যের দেবতা বা দেবী কি করবেন জানেনা, তবু ভক্তিতে গদগদ হ'য়ে মনে মনে দু-একবার 'মা মা' বলে ডাকল।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মা। ঠাকুরের আসন থেকে উঠে এসে মাকে প্রণাম করতেই মায়ের হাতটা তার মাথা এসে স্পর্শ করল।

তাকে অভয় দিয়ে মা বললেন, ভয় নেই, নিশ্চয়ই পরীক্ষা ভাল হবে। মন দিয়ে পরীক্ষা দিবি। তাড়াহুড়ো করবি না, সব প্রশ্নের উত্তর লিখ ব।

দোয়াত, কলম ও পেন্সিল ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে স্কুলে রওনা হ'ল সুমিত। স্কুলে পেঁাছে দেখল মেয়েদের পরীক্ষা তখনো শেষ হয়নি। ওদেরও টেষ্ট পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সুতরাং ওরাও প্রাণ দিয়ে যে যার খাতাটাকে আগলে ধরে শেষ প্রচেষ্টায় ব্যস্ত।

স্কুলের জানালা দিয়ে একবার ভারতীকে লক্ষ্য করতে চেষ্টা করল সুমিত। কোথাও ওকে দেখতে পেল না। সমস্ত স্কুল ঘুরে ওর তখন লক্ষ্য করা সম্ভব নয়। অনেক ভেবে, শেষে স্কুলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

ঢং ঢং করে বেজে উঠল শেষের ঘন্টা। স্কুল-বারন্দায় এক একজন করে বেরিয়ে এল মেয়েরা। সকলেরই মুখে ভাবনার ছাপ। কেউ শলাপরামর্শ করছে, কেউবা নিজের উত্তর ঠিক হ'য়েছে কিনা খুঁতিয়ে দেখার জন্য বই খুলে দেখে নিচ্ছে এবং বান্ধবীদের দেখাচ্ছে। ওদের দলের সঙ্গে ভারতীও একসময় বেরিয়ে এল।

বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলের দল এবার স্কুল-বারন্দার দিকে এগিয়ে চলল। ওদের সঙ্গ ধরে সুমিতও স্কুলের বারন্দায় পেঁাছে গেল। কালো বোর্ডটায় নজর পরতেই দেখতে পেল, রোল নাম্বার অনুসারে তার সিট পড়েছে দশ নম্বর ঘরে। চক পেন্সিল দিয়ে লেখা ঘরের নম্বরগুলি খুব আবছা হ'য়ে রয়েছে। কেউ যেন হাত বুলিয়ে মুছে ফেলেছে।

তবু কষ্ট করে নম্বরটা খুঁজে সুমিত নির্দিষ্ট ঘরের দরজায় পোঁছলো। সঠিক জায়গাটা খুঁজে পাওয়ামাত্র বসে পড়ল সেখানে। শেষ মুহূর্তের জন্য বইটা খুলে একবার দেখতে লাগল। উত্তেজনায় তার বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল। তেমন সময় আর হাতে নেই। এতোদিন কত কষ্ট করে সব পড়েছে, কিন্তু হায়! মনে হচ্ছে সব যেন গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তবে কি সব ভুলে গেল? তবু বইটার বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো ওল্টাতে লাগল।

যথাসময়ে ঘণ্টা পড়ল। অমনি পরীক্ষানিয়ন্ত্রক ঘরে এসে হাজির হলেন। একবার দেখে নিলেন পরীক্ষার্থীরা সবাই যথাস্থানে ঠিকমত বসেছে কিনা। তাঁর হাতেই রয়েছে এক গাদা প্রশ্নপত্র। এ যেন রামের হাতে ধরা রয়েছে রাবণের মৃত্যুবান। রাবণ যেদিকেই তাকায়, দেখে শুধু রাম। নিয়ন্ত্রক স্যার ঘরের মাঝখানে পায়চারি করছিলেন। সকলেই তাঁর হাতের দিকে চেয়ে রয়েছে। তাঁর হাতের প্রশ্নপত্রে কি রহস্য আছে কে জানে!

আবার ঘণ্টা পড়ল, স্যার প্রশ্নপত্র বিলি করতে শুরু করলেন। প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে কপালে ঠেকিয়েই সুমিত দেখল 'নবকুমার' থেকে লাইন তুলে প্রথম প্রশ্ন 'তুমি অধম হইবে বলিয়া, আমি উত্তম হইব না কেন' ইত্যাদি। খুবই সহজ প্রশ্ন।

পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন শুরু হ'য়ে গেল। সকলেই প্রশ্নপত্র পড়ছে। হঠাৎ পিছন থেকে বিমল বলে উঠল, স্যার, দারুণ ভালো প্রশ্ন হ'য়েছে।

স্যার বললেন, কথা ব'লো না, লেখো। পরে সময় পাবে না।

সকলে মাথা নীচু ক'রে লিখতে শুরু করল। তিন ঘণ্টা সময় রুদ্ধশ্বাস কক্ষে যে যার কাজ নিভৃতে সারতে লাগল। শেষ ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলের লেখা গেল থেমে। খাতা জমা পড়তে লাগল পর পর। সুমিতও তার উত্তরপত্র জমা দিয়ে বই পেন সব গুছিয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল। এমন করে সবগুলি পরীক্ষা একে একে শেষ হ'য়ে গেল।

পরীক্ষার্থীদের সাময়িক বিরতি। চাতক পাখীর মতো সকলকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে পরীক্ষার ফল না বেরোনো পর্যন্ত। এজন্যে এখন সবাই ভীষণ চিন্তিত। কি হবে কার ভাগ্যে? একটা একটা করে দিন গুণছে, আর তাদের দুশ্চিন্তাও বাড়ছে।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে সুমিত স্কুলে গিয়ে দেখল নোটিশবোর্ডে একটা নোটিশে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নির্দেশ—আগামী সোমবার পরীক্ষার্থীদের সকলকে বেলা এগারোটায় স্কুলে হাজির হতে হবে। ঐ দিনই টেস্ট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

মাঝে আর মাত্র একটা দিন—শুধু রবিবার। প্রচণ্ড উদ্বেগ নিয়ে মাঝের রবিবারটা কাটল। রাতটাও সুমিতের কাটল প্রায় না ঘুমিয়ে। বেশ বুঝতে পারল যে, তার মাও প্রায় জেগেই সারারাত কাটিয়েছেন।

ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ায় এই সোমবারে সূর্যোদয়ের অনেক পরে সুমিতের ঘুম ভাঙল। মাঝে কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময়। কাছাকাছি দু'এক জন বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে সময়টা ব্যয় করতে লাগল। সময় আর জলের স্রোত কারো জন্যে অপেক্ষা করে না। অদূরে হেডঅফিসের পাহারাওলা লোহার ঝুলন্ত রেলটায় ঢং ঢং করে ন'টা আওয়াজ করল। সুমিতরা রোজই শোনে ঐ আওয়াজ, কিন্তু আজকের আওয়াজ যেন তার শঙ্কিত মনের পর্দায় হাতুড়ির ঘা মারছিল।

সময় নির্দেশক আওয়াজ শোনামাত্র সুমিত ছুটে এল বাড়ি। তখন তার গলায় না আছে জোর, মুখেও নেই রুচি। মায়ের আন্তরিক শান্ত্বনার বাণীও তাকে শান্ত করতে পারছিল না। পা ছড়িয়ে বসে গরম গরম ভাত দলা পাকিয়ে গিলে উঠে হাত-মুখ কোনোমতে ধুয়ে মুছতে মুছতে ছুটল স্কুলের দিকে। তখনও দশটা বাজেনি। স্কুলে পোঁছে দেখলো ইতিমধ্যে বহু ছেলেরা এসে হাজির হ'য়েছে। সকলেই লাইব্রেরী রুমের কাছে জটলা করছে। ওরা উঁকিঝুঁকি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছে যদি কোন মাষ্টারমশাই একটু আশার ইঙ্গিত দেন। না, কেউ না, ওনাদের মুখে কোনই কথা নেই। সকলেই অস্বাভাবিক নিরুত্তর, কেউবা মাঝে মাঝে লাইব্রেরীর বারান্দায় এসে অশান্ত ছাত্রদের তাড়া দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছেন।

হেডমাস্টার মশাই খুব বিরক্ত হ'য়েছেন বোঝা গেল। একটা বেত হাতে করে হঠাৎ বেরিয়ে এলেন। ভয়ে সুমিতরা সকলেই ছুটে গিয়ে ঢুকল ওদের নির্দিষ্ট ক্লাসের ঘরে।

স্কুলের ঘণ্টা পড়ল ঠিক এগারোটায়। বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে ওরা সবাই তখন অফিস ঘরের দিকে চেয়ে রয়েছে। দেখা গেল বাংলার মাষ্টারমশাই মাননীয় বিভূতিবাবু হেলে দুলে ওদের ক্লাসের দিকে এগিয়ে আসছেন। কারো মুখে আর কোন কথা নেই। সুমিতের

তো হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবার মতো অবস্থা। সকলে এমনিতেই চুপ করে থাকায় অন্যদিনের মতো মাষ্টারমশাইকে ঘরে এসে চুপ করার জন্য ধমক দিতে হ'ল না।

এসেই মাষ্টারমশাই এক এক করে সকলের নাম ডাকলেন। আজ আর কেউ অনুপস্থিত নেই। নাম ডাকা শেষ হলে হাজিরা খাতা বন্ধ করে সকলের দিকে একবার তাকালেন উনি এবং ছোট একটা বক্তৃতাও দিলেন। সেই বক্তৃতার মূল বক্তব্য : 'যারা এবার পাশ করেছো তাদের সামনে কিন্তু বিরাট দায়িত্ব। সেকথা মনে রেখে তাদের অনলস পরিশ্রম করতে হবে। যারা পাশ করতে পারোনি, তাদের আবার সংকল্পকে স্থির করে আগামী বৎসরের জন্য তৈরী হতে হবে। পরাজয় তাদের ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করবে—এটাই আমার ধারণা।

অফিস ঘর থেকে আবার একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। সকলকে আবার স্থির হয়ে বসতে বলে মাষ্টারমশাই বললেন, কেউ কোন কথা বলবে না। আমি এবার যে নামগুলি ডাকব, তারা টেষ্ট পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়েছ।

ঐ নির্দেশ শোনামাত্র ছাত্ররা সবাই একটু নড়েচড়ে বসল। সব জিজ্ঞাসার শেষ মুহূর্তে এসে হাজির হ'য়েছে। সুমিতের গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ। মাষ্টারমশাই তাঁর পকেট থেকে একটা লম্বা কাগজ বের করলেন। অমনি ক্লাশ-ঘরে মৃদু গুঞ্জন শুরু হ'য়ে গেল।

সেদিকে কর্ণপাত না করে মাষ্টারমশাই আবার এক এক করে নাম ডাকতে শুরু করলেন। যাদের নাম ডাকা হ'চ্ছে তারা দাঁড়িয়ে উঠে 'ইয়েস স্যার' বলে বসে পড়তে লাগল। মুখে ওদের হাসির ছোঁয়া ঝিলিক দিয়ে উঠছিল। আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পাশের বন্ধুদের হাত জড়িয়ে ধরছিল কেউ কেউ

উদ্বেগে সুমিতের মনটা আড়ষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। কৈ, তার নামটা তো ডাকা হচ্ছে না। তার দু'চোখে জল এসে গিয়েছিল। আবছা দৃষ্টি দিয়ে শুধু মাস্টার মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে রইল সে। এর মধ্যেই উনি হঠাৎ একবার তার নামটা ডেকে দিলেন। শোনামাত্র তড়াক ক'রে উঠে 'ইয়েস স্যার, বলে বসে পড়ল সুমিত। তার চোখের কোণে জমে থাকা দু'ফোঁটা জল হতাশার পরিবর্তে আনন্দাশ্রু হ'য়ে টপ করে মাটিতে ঝরে পড়ল।

মাষ্টারমশাই নাম লেখা লম্বা কাগজটা পকেটে রেখে* সকলকে

আবার একবার ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দিয়ে বললেন, যারা পাশ করেছো তাদের আগামী পনেরো দিনের মধ্যে ফাইনাল পরীক্ষার ফর্ম ও ফি জমা দিতে হবে।

এই বলেই উনি সেদিন ওদের ছুটি ঘোষণা করলেন। ছাত্ররা ওনাকে প্রণাম করে লাইন করে আফিস ঘরের দিকে ছুটে গেল। আফিস ঘরে অন্য যে সব মাণ্টারমশাইরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সকলকে প্রণাম করে যে যার বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করল। কে কে ফেল করল তা জানার সময় নেই, বাড়িতে গিয়ে মাকে আগে খবরটা দিতে হবে।

এক দৌড়ে বাড়ি পৌঁছেই ধপ্ করে একটা প্রণাম করেই মাকে জড়িয়ে ধরল সুমিত। মায়ের চোখে জল। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন মা। এই কান্নার কারণটা সুমিতের বোধগম্য হ'ল না।

রুদ্ধকণ্ঠে মা বললেন, আজ যদি তোর বাবা বেঁচে থাকত···।

খবরটা ছড়িয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। সমস্ত পাড়া জুড়ে একটা আনন্দের জোয়ার বয়ে চলেছে। যারাই টেণ্টে পাশ করেছে, তারা সবাই ঘুরে ঘুরে সকলকে খবর দিচ্ছে। সুমিতও তাই করছিল। সব শেষে সে গেল দীনাদার বাড়ি।

দীনাদাকে প্রণাম করতেই উনি খুশী হ'য়ে বললেন, এবার আসলটার জন্য ভাব। এই আনন্দই কিন্তু সব নয়।

দীনাদার বাবা মাকেও প্রণাম করে এসে সুমিত বলল, এবার আমি যাই দীনাদা, পরে আবার আসব।

রান্নাঘর থেকে দীনাদার মা স্নেহমাখা স্বরে ডেকে বললেন, একটু ব'সো বাবা, মিষ্টি খেয়ে যাও।

লজ্জিত হ'ল সুমিত। পাশ করেছে সে, অথচ মিষ্টি খাওয়াবেন উনি, এটা কেমন কথা! ভেবেচিন্তে বলল, না না আমি কেন মিষ্টি খাব, বরং আমি আপনাদের মিষ্টি এনে খাওয়াব মাসীমা।

মাসীমা বললেন, তার জন্যে নয় বাবা, ভারতীও টেণ্টে পাশ করেছে, তাই তোমাকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছি।

তবু তারই মিষ্টি হাতে নিয়ে আসা উচিৎ ছিল। দীনাদাদের বাড়ি বলে কথা। এখানকার সম্পর্কই যে আলাদা। আনন্দের উচ্ছ্বাসে সে সব কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। ভারতীর কথা এবার তার মনে পড়ল। কৈ, ওতো তাদের বাড়ি খবরটা দিয়ে এল না। সুতরাং খুব অন্যায়

করেছে ভারতী। এই সুযোগে নিজের সংকুচিত মনকে শান্ত্বনা দিল সুমিত। এর আগে কোথাও ওকে দেখতে না পেয়ে খবর নেবার সুযোগ পায় নি সে। এখানেও ভারতীকে কাছাকাছি দেখতে পেল না। শেষপর্যন্ত মাসীমাকেই জিজ্ঞাসা করল, ও কোথায়?

মাসীমা জানালেন, এই তো স্কুল থেকে ফিরে এসেই পাড়ায় ঘুরতে বেরিয়েছে। মেয়ের বাড়ির কথা হয়তো খেয়ালই নেই।

সুমিত টেবিলের পাশের খালি চেয়ারটা টেনে বসে পড়ল। একটু পরে মাসীমা একটা বাটিতে করে দুটো রসগোল্লা এনে তাকে দিলেন। রসগোল্লা দেখে সব কিছু ভুলে গেল সে। একটা একটা করে দুটোই প্রায় একসংগে মুখে পুরে দিল। পাছে বিষম লাগে এই ভয়ে যখন সতর্কভাবে দুটোকেই মুখের মধ্যে রাখতে ব্যস্ত তখনই ভারতীর সাড়া পাওয়া গেল।

উঠানের পাশের ফুল গাছটার নীচে থেকে হাঁক দিল মা, আজকে খেয়েই কিন্তু ঘুমোব। কাল রাতে একেবারেই ঘুমোইনি।

কথা কয়টি বলতে বলতে দরজায় এসে হাজির হ'ল ভারতী। সুমিতকে ঘরের মধ্যে দেখে ওর কলরব থেমে গেল। পরে ঢুকে বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বলল, তোর খবর আমি অনেক আগেই পেয়েছি।

ইত্যবসরে সুমিত রসগোল্লা মুখ থেকে গলার মধ্যে নামিয়ে দিয়েছে। বেশ খোসমেজাজেই বলল, আমিও তোরটা পেয়েছি, এই দ্যাখ সেইজন্যে মিষ্টিও খাচ্ছি।

ভারতী এতে খুবই উৎফুল্ল হয়ে কাছে এগিয়ে এসে বলল, আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে!

গোবেচারার মত মুখ করে সুমিত বলল, কেন রে?

—বাঃ হবে না? দুজনেই টেস্টে পাশ করলাম যে!

ভারতীর মুখের ঐ কথা শুনে সুমিত দারুণ মুগ্ধ হ'য়ে গেল। আর কোনো কথা বলতে পারল না। ভারতীও মন-কেমন-করা ভঙ্গীতে চেয়ে রইল সুমিতের দিকে।

এই মুহূর্তে আর কি বলা যায় ভেবে পাচ্ছিল না সুমিত। অবশেষে নীরবতা ভাঙ্গতে সে এক গ্লাস জল চেয়ে বসল। দ্রুত পায়ে এক গ্লাস জল এনে দিল ভারতী। জলটুকু পান করে ওকে বিদায় জানিয়ে সেদিনের মত বাড়ি চলে এল সুমিত।

পরের দিনটা সকলের পক্ষেই বিশ্রামের দিন। কোনো উদ্বেগ নেই, পড়াশোনা নিয়ে কোনো বকাঝকা নেই, সবাই নিজের নিজের বাড়িতে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। সুমিতও সারা দুপুর লম্বা একটা ঘুম দিল।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠেই দেখে মা গালে হাত দিয়ে বসে আছেন।

সুমিত বলল, আবার কি ভাবছ মা?

মলিন হাসি হেসে মা বললেন, ভাবনার কি শেষ আছে। এইবারই তো আসল ভাবনা। কি করে ফী-এর তিরিশ টাকা জোগাড় করব তাই ভাবছি।

যাদের পক্ষকালের সম্বল মাথা পিছু মাত্র চার টাকা নয় আনা, তাদের কাছে তিরিশ টাকা ভীষণ ব্যাপার।

হঠাৎ কি যেন ভেবে মা বললেন, চল্, সবাই আজ একবার দুতকুণ্ডি থেকে ঘুরে আসি।

মেদিনীপুরের দুতকুণ্ডি শিবির থেকে সরকারী ট্রান্সফার ব্যবস্থায় এখানে এসে আশ্রয় পেয়েছেন কয়েকটি পরিবার তাদের বসবাসের অঞ্চলটিকে এখানকার সবাই দুতকুণ্ডি বলত।

ওখানে এসেছিলেন সুমিতদের এক জ্যাঠামশাই। এই জ্যাঠামশাই শ্রীমৃগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় বেশীর ভাগ সময় কলকাতাতে থাকলেও মাঝে মধ্যে দিনকয়েকের জন্য ওখানে এসে জ্যাঠাইমার কাছে থাকতেন।

মা কোন কোন দিন বিকালের দিকে একলাই ঐ জ্যাঠাইমার কাছে যেতেন কলকাতার সব আত্মীয়স্বজনদের খবরাখবর নিতে। আজ কিন্তু তার নিজের প্রয়োজনে যাওয়া।

সুমিতকে বললেন, এরপর আর সময় হবে না। আজই চল্ তোদের জ্যাঠাইমাকে জানিয়ে আসি তোর খবরটা, শুনলে উনি খুব খুশী হবেন। আর যদি তোর জ্যাঠামশাই কোলকাতা থেকে এসে থাকেন তো ওনাকে সব বলব।

সব বলা মানে কিছু সাহায্য পাওয়ার আশা। ডুবন্ত মানুষরা ভাসমান খড়কুটোকেও আশ্রয় করতে চায়।

সুমিত আর ছোট ভাই সুজিতকে সঙ্গে নিয়ে মা চললেন মৃগেন জ্যাঠামশাই এর আস্তানায়।

বড় রাস্তার এক পাশে পঁচিশ নম্বর গ্রুপ এবং এই গ্রুপের শেষে অন্যদিকে পড়ে আট নম্বর গ্রুপ। আট নম্বর গ্রুপের বাসিন্দাদের অনেকের

সঙ্গে তাদের চেনা পরিচয় আছে। এই গ্রুপের মহিলারা কেউ কেউ সংসারের কাজকর্ম শেষ করে এসে সারিবদ্ধভাবে রাস্তার পাশে বসে ঘুঁটে দিচ্ছিলেন।

ওদেরই মধ্যে কে একজন সুমিতদের মাকে দেখে বললেন, কি গো দিদি, এদিকে সবাইমিলে কোথায় যাচ্ছেন ?

যেতে যেতে মা উত্তর দিলেন, এই যাই—একটু দিদিব বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

অন্য একজন মহিলা প্রশ্ন করলেন, সে কি গো, এখানে আবার তোমার দিদি কে ?

প্রশ্নটা নেহাতই তুচ্ছ হলেও বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ ছিল। কারণ প্রায় দশ বৎসর এই উদ্বাস্তু শিবিরে তারা বাস করছে। যাতায়াত বা ঘনিষ্ঠতা নেই বলে তাদের কোনো নিকট আত্মীয় কাছাকাছি থাকেন বলে ওরা কেউ জানতেন না বা কল্পনাও করতে পারেন নি। খবরাখবরের জন্য মা একলা কদাচিৎ এই পথ মাড়াতেন। কারো নজরেই পড়তো না সে যাওয়া। আজ ছেলেরা সঙ্গে থাকায় ওদের দৃষ্টি পড়েছে এবং কৌতুহলী হ'য়ে উঠেছেন।

মহিলাটির প্রশ্নের উত্তরে মা 'সোনার মা—' এই পর্যন্ত বলে সুমিতকে দেখিয়ে বললেন, ওর বাবারই তো আপন বৌদি

মায়ের মুখে উত্তরটা শুনে মহিলাটি এক দলা গোবর হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে ধপ্ করে দলাটা গোল করে মাটিতে ফেলে বললেন, হ্যাঁ দিদি, এখন তো কত কথা শুনি, আরো কত কথাই না শুনতে হবে। কেউ দিদি, কেউ জ্যাঠা—এরা সব এর আগে ছিল কোথায় ?

পরের ব্যাপারে মুখরোচক আলোচনা করা এখানকার অধিকাংশ মহিলাদের অভ্যাস এই মহিলাটি হয়তো সেই অভ্যাসের বশে আরো কিছু প্রশ্ন করতেন। কিন্তু হঠাৎ অদূরে ওর দৃষ্টি পড়ায় চঞ্চল হ'য়ে বলে উঠলেন, ঐ যাঃ, ছাগলটা ক্ষেতে ঢুকে সব খেয়ে ফেললো গো—।

চিৎকার করতে করতে মহিলাটি নিজের বাড়ির দিকে দৌড়লেন।

মা ও সুমিতরা অযথা প্রশ্নবান থেকে বাঁচল। মা আবার তাদের নিয়ে পথ চলতে লাগলেন

সুমিত বিস্মিত হ'য়ে দেখল পথের পাশে লম্বালম্বি অনেকটা জায়গা জুড়ে লাউ গাছের মাচা। কত লাউ সেই মাচার নিচে সার সার

ঝুলছে, গুণে শেষ করা যায় না। কোথাও বেড়া গাছের উপর দিয়ে শিম গাছ লতিয়ে গেছে, কোথাও বা বরবটি। স্পষ্টই চোখে পড়ছে শিবিরের পরিশ্রমী ও উদ্যমী লোকরা সময় পেলেই নিষ্ঠার সঙ্গে কিছু না কিছু করে আপন সংসারের শ্রীবৃদ্ধি বা অর্থের সাশ্রয় করার চেষ্টা করছে।

কংক্রিটের বিশাল চওড়া রাস্তাটায় পৌঁছে তারা দেখতে পেলো এই রাস্তার দু'ধারে সারি সারি অগুনতি ঘর। এটাই সাত নম্বর গ্রুপ। এই গ্রুপের প্রথম দু'খানা ঘরের পরেই তাদের জ্যাঠামশাইএর ঘর। ঘরের দরজায় গিয়ে পৌঁছলো তারা :

জ্যাঠামশাই তখন টকটকে লাল রং-এর বস্ত্র পরিহিত। মা কালীর আসনের সামনে বসে আছেন তিনি। মা কালীর আশেপাশে দুর্গা থেকে শুরু করে স্বর্গরাজ্যের সমস্ত দেবদেবীরা ফটোতে বিরাজ করছেন এবং উদ্বাস্তু শিবিরের মহিলাগোষ্ঠী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হ'য়ে রয়েছেন তাদের জ্যাঠামশাই। তার পাশেই বসে আছেন জ্যাঠাইমা। সুমিতরা শুনেছিল ওরা কিছু শিষ্য ও শিষ্যা করে বেশ ভালই পসার করেছেন। ভক্তিতে গদগদ হয়ে সকলে তখন জ্যাঠামশাই-এর মুখনিঃসৃত পাঠ শুনছিলেন।

এমন সুন্দর পরিবেশটা হঠাৎ যেন নষ্ট হয়ে গেল সুমিতদের আগমনে। জ্যাঠামশাই-এর রক্তবর্ণ চোখের দৃষ্টি এসে পড়ল তাদের উপর।

মা মাথার ঘোমটা বড় করে টেনে মুখটা ঢেকে ঘরের মধ্যে একটা পা বাড়িয়ে দিলেন। ছোট ভাই ও সুমিত মায়ের দু'টো হাত ধরে রইল।

জ্যাঠাইমা বললেন, আয় সুনন্দা; উনি হঠাৎ কাল সকালে কোলকাতা থেকে এসেছেন। সেই থেকে ভীষণ ভীড়। তার ওপর আজ আবার বহু লোককে দীক্ষা দিলেন। তাই বাড়িতে এই পুজোপাঠ চলছে।

বাড়ির পরিবেশ দেখে তাই মনে হ'ল। যেন একটা উৎসব চলছে। তাদের নাকে বিভিন্ন রান্নার গন্ধ এসে পৌঁছলো।

ছোট ভাই সুজিত একটু থমকে মাকে কানে কানে বলল, মা, মাংসের গন্ধ পাচ্ছি, আমি মাংস খাব।

মা চুপি চুপি ওকে বললেন, না না, ওকথা বলে না। চোখের ইঙ্গিতে ওকে শাসানি দিয়ে চুপ করিয়ে দিলেন।

এতো কাছে থেকেও যখন তারা এই মহোৎসবের খবর পায়নি, তখন

এখানে আর তাদের দাঁড়ানো সম্ভব নয়। হকচকিয়ে মা তাদের নিয়ে ঘরের এক কোণে গিয়ে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

জ্যাঠামশাই পাঠ থামিয়ে বললেন, কি সুনন্দা, ওর তো আজ টেস্টের ফল বেরিয়েছে ?

মা ঘোমটার আড়াল থেকে নিম্নস্বরে শুধু 'হুঁ' বললেন।

উনি তার কি অর্থ বুঝলেন জানিনা, পরমুহূর্তে নিজেই বলে চললেন, জানো—এই বংশে এসব হবে না। এটা অভিশপ্ত বংশ, আমাদের কেউই স্কুলের গন্ডি পার হতে পারেনি। তোমার এতো ভাবনার কি আছে ? পাশ করেই বা ও কি করবে ? চাকরির যা বাজার ! বেশ বড় তো হ'য়েছে, যদি পার সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে ধরে কণ্ডাকটারিতে দিয়ে দাও। আয় করাই তো সকলের লক্ষ্য, তা হ'য়ে যাবে।

যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য পাবার আশায় ছুটে এসে এত হৃদয়বিদারক কথা শুনতে হবে তা কি মা ভাবতে পেরেছিলেন ! নিরুত্তর হ'য়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

জ্যাঠাইমা বললেন, সে বাপু ওর ব্যাপার, তোমার অতো বলার কি হ'য়েছে ? সুনন্দা বোসো, ছেলে লাটসাহেব হ'লে ওরই তো ভাল।

সুমিত টেস্টে পাশ করেছে, এই কথাটা বলার উৎসাহ মার নিভে গিয়েছিল। তবু এসেই যখন পড়েছেন তখন বলেই ফেললেন, ও পাশ করেছে, আপনাদের সেই খবরটাই দিতে এলাম।

ছেলেদের জ্যাঠামশাই ও জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করতে আদেশ করলেন। যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে তারা মায়ের আদেশ মত উভয়কে প্রণাম করল।

জ্যাঠাইমার নির্দেশে তারা শিষ্যাশিষ্যাদের পিছনে একপাশে নীরবে বসল। আবার রামায়ণ পাঠ শুরু করলেন জ্যাঠামশাই। মা চুপ করে খানিকক্ষণ 'সীতার বনবাস' পালা শুনলেন। সন্ধ্যা হ'তে বেশী দেরী নেই বুঝে মা এক সময় জ্যাঠাইমাকে বললেন, এবার আমরা চলি, সন্ধ্যা হ'লে পথটা চলা যাবে না।

প্রত্যুত্তরে কেউ কোনো নিষেধ-বাধা দিলেন না। ছেলেদের হাত ধরে মা ঘরের বাইরে এলেন।

লুব্ধ চোখে সুমিত ও সুজিত দেখল পাশের ঘরে বড় বড় হাঁড়ি, কড়া, হাতা ইত্যাদি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। হাঁড়ি ও কড়ার গায়ে মাংসের টুকরো লেগে রয়েছে। বোঝা গেল এখানে দুপুরে বিরাট ভোজ হ'য়েছে।

অস্তপ্রায় সূর্যের স্নিগ্ধ রক্তিম আলোয় তখন পথঘাট প্লাবিত হচ্ছে। মাঠ থেকে গরু ও ছাগলগুলি যার যার আস্তানার দিকে রওনা হ'য়েছে। পাখীরা গাছের ডালে ডালে কিচিরমিচির শব্দ করে নাচছে। সবাই আপন নীড়ের দিকে চলেছে। তারাও মায়ের হাত ধরে তাদের ডেরার উদ্দেশ্যে পথ চলছে। আর একটু পরেই শিবিরের সর্বত্র নিস্তব্ধতা নেমে আসবে। মায়ের মুখে তখন অব্যক্ত যন্ত্রণার ছবি ভাসছিল।

কিছুক্ষণ চলার পর মা আর তার মনের কষ্ট চেপে রাখতে পারলেন না। ছেলেদের উদ্দেশ্য করে হঠাৎ এক সময় বললেন, এত বড় উৎসব হ'ল অথচ জ্যাঠামশাই একবার তাদের জানালেন না। উল্টে পরীক্ষার বিষয় নিয়ে কত সব কটূক্তি শোনালেন।

এই পর্যন্ত বলেই থামলেন এবং কি যেন ভেবে আবার দৃঢ়তার সঙ্গে সুমিতকে বললেন, না, তোর এসব ভাবার দরকার নেই, তুই নিজের কাজ করে যা। শেষে না হয় একবার কলকাতা যাবি। ওখানে আরো তো জ্যাঠা, কাকা, দাদারা রয়েছেন। কিছু কিছু করে চাইলে ওরা নিশ্চয়ই দেবেন। মাত্র ত্রিশ টাকা—ওরা পাঁচ জনে মিলে সাহায্য করলেই হ'য়ে যাবে। আমি এ নিয়ে কিছু চিন্তা করি না।

উত্তেজনায় মার হাত কাঁপছিল। সুমিত বেশ বুঝতে পারছিল যে মা ঐসব বলে নিজেকে একটু হালকা করতে চেষ্টা করছেন।

সেদিন নিজের ঘরে পৌঁছেই মা খোঁজ করতে লাগলেন পরদিন কেউ কলকাতায় যাবেন কিনা। হঠাৎ মঞ্জুর মাকে পেয়ে গেলেন। তিনি যাবেন কলকাতা।

তাদের পাশের বাড়িতেই থাকতেন মঞ্জুর মা। তাকে মা অনেক করে বুঝিয়ে বললেন, সুমিত যদি আপনার সঙ্গে যায়, আপনি ওকে একটু শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিয়ে দেবেন দিদি ?

সব ব্যাপারটা শোনার পর মঞ্জুর মা সুমিতকে সঙ্গে নিতে রাজী হ'লেন।

সেই রাতেই মা সুমিতকে নিয়ে বসলেন শলাপরামর্শ করতে। তাকে বোঝাতে লাগলেন কিভাবে শিয়ালদহ থেকে বারাসত, বারাসত থেকে দত্তপুকুর এবং দত্তপুকুর থেকে হাবড়া যেতে হবে। তাদের নিকট আত্মীয়রা এখন ঐসব জায়গায় স্থায়ী বসবাস করছেন। একটা পুরোনো ডায়েরী থেকে ওদের সব ঠিকানা কাগজে লিখে নিতে বললেন।

ঠিকানাগুলো টুকে নিতে নিতে হঠাৎ একটা পাতায় সুমিতের দৃষ্টি আটকে গেল। সেই পাতার একটা জায়গায় বড় বড় অক্ষরে শুধু লেখা রয়েছে ১৬ই চৈত্র, তেরশ' ষাট সাল। বছর ও তারিখটা ঐভাবে কেন ওখানে লেখা রয়েছে তার কোন অর্থই বুঝতে পারল না সে। কৌতুহল দমন করতে না পেরে মাকে জিজ্ঞাসা করল, মা, এখানে এই তারিখ আর বছরটা লেখা কেন?

তারিখটার ওপর দৃষ্টি পড়তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মা বললেন, না বাবা, ওটা কিছু না। ওটা আমার কপাল পোড়ার দিনটাই মাত্র।

অস্পষ্টভাবে সুমিতের মনে পড়ল মায়ের সেই বুকফাটা কান্নার মাঝে চিরনিদ্রায় শায়িত তাদের বাবার কথা। পাশ ফিরে চাইতেই দেখে মা তার জামাকাপড় গুছিয়ে দেবার জন্য উঠে যাচ্ছেন।

এখন বড় হ'য়েছে সুমিত। বুঝতে পারল শুধু জামাকাপড় গোছানো নয়, উদ্গত অশ্রুকে আড়াল করবার জন্যই তিনি তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে গেলেন।

সে রাতে তার চোখে ঘুম আসছিল না। অনেকক্ষণ ধরে তার চোখে ভাসছিল শৈশবের দেখা সেই রাজপুরী কলিকাতা। সেই নিম গাছ, যার নীচে কতদিন সে গুলি খেলেছে। সেই গঙ্গা, যার পার ধরে খিদিরপুরের দিকে কতবার পথ হেঁটেছে। সেই কলিকাতাকে আবার স্বচক্ষে দেখতে পাবে সুদীর্ঘ দশ বছর পরে। এই সব ভাবতে ভাবতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল জানেনা।

ভোরবেলাতেই মা ডেকে বললেন, এই ওঠ, যাবি না?

চোখের নিমেষে ধড়পড়িয়ে বিছানার ওপর উঠে বসল সে। ইতিমধ্যে মা সেই কাক-ভোরে উঠে তার জন্য খানচারেক রুটি ও তরকারি বানিয়েছেন। এত সকালে ওসব খেতে তার ইচ্ছা হচ্ছিল না। তার হাবভাবে মা বুঝতে পেরেই ধমকের সুরে বললেন, সেই দুপুরে গিয়ে পৌঁছবি। কোথায় কি পাবি তার ঠিক নেই। শিগগির খেয়ে নে এগুলো। মঞ্জুর মা এলো বলে।

জলযোগ সারতে না সারতেই মঞ্জুর মা এসে হাজির।

মা ব্যস্ততার সঙ্গে মঞ্জুর মাকে বললেন, ওকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিয়ে দিলেই হবে।

তারপর তার দিকে ফিরে বললেন, কিরে যেতে পারবি না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব পারব। সোৎসাহে বলল সুমিত। তার মনে তখন দারুণ সাহস এসে গেছে। নিজের খেয়ালে খুশীমত এমন একা কলকাতা দেখার সুযোগ ভয় পেয়ে হারাতে সে রাজী নয়।

মঞ্জুর মা বললেন, তবে বাপু ট্রেনে কিন্তু চুপ করে বসে থাকবে। লাফালাফি, ছোটাছুটি করতে পারবে না, তোমার মায়ের সামনেই বলে দিচ্ছি।

—না না, কিছু করব না। প্রতিজ্ঞার ঢঙে কথা কটি বলল সুমিত।

যথারীতি প্রণামাদি সেরে বাইরের দিকে পা বাড়াতেই মা বললেন, সাবধানে যাবি, আর তাড়াতাড়ি ফিরবি। এখন একদিন পড়াশোনা না করা মানে বিরাট ক্ষতি, মনে থাকে যেন।

ভায়েরা পাশ থেকে বলে উঠল, আমাদের জন্য লজেন্স আনবি বড়দা।

ট্রেন আসবার অনেক আগেই মঞ্জুর মা সুমিতকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে পৌঁছে গেল। তিরিশ টাকা সংগ্রহ করার জন্য মা তার শেষ সম্বল চার টাকা সুমিতের হাতে তুলে দিয়েছেন। এই টাকায় তাকে যাতায়াত এবং পকেট-খরচা চালাতে হবে।

সুমিত ভাবছিল, দাদা, কাকা, জ্যাঠামশাইরা এতদিন পর হঠাৎ তাকে দেখে কি বলবেন! এই দেখাসাক্ষাৎ নিশ্চয়ই আনন্দের হবে। তার সাফল্যে ওনারা নিশ্চয়ই তাকে উৎসাহিত করবেন। ওদের প্রত্যেকেরই এখন ক্ষমতা আছে। এই কটা টাকা সাহায্য দেওয়া ওদের পক্ষে কি-ই বা এমন।

অপেক্ষমান যাত্রীদের মধ্যে কে যেন বলে উঠলেন, ঐ তো ট্রেন আসছে।

ট্রেন এল একটু পরে। মঞ্জুর মায়ের সঙ্গে সুমিত সানন্দে উঠে পড়ল ট্রেনে। জানলার ধারের জায়গা পাবার জন্য তার মনটা ভীষণ আনচান করছিল। শেষ পর্যন্ত পেয়েও গেল জায়গাটা। যে ভদ্রলোক একটু সরে বসে তাকে জায়গা দিয়েছিলেন তিনি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন।

ট্রেন থেকে সুমিত দেখছিল তার দশ বৎসর কালের পরিচিত ধুবুলিয়ার মাঠ ঘাট। এমন সময় হঠাৎ তার মনে হ'ল টেস্ট পরীক্ষায় পাশ করেছে বলেই তো আজ গাড়ী চড়তে পারল। মা তো প্রায়ই বলতেন—লেখাপড়া

করে যে, গাড়ীঘোড়া চড়ে সে। মায়ের মুখে শোনা ছোটবেলাকার সেই প্রবাদ বচনটা আজ সত্যি হ'য়ে দাঁড়াল। বহুদিন পরে ট্রেনে উঠে ছোট-বড় স্টেশনগুলো পেরোতে পেরোতে আনন্দময় ট্রেন ভ্রমণের স্বাদ তার মনকে দুলিয়ে দিচ্ছিল বারবার। রাণাঘাট, কাঁচড়াপাড়া, নৈহাটী ইত্যাদি স্টেশনগুলি দিনের বেলায় এই বয়সের নতুন চোখে দেখতে পেয়ে অনির্বচনীয় পুলকে তার মনটা ভরে গেল। অবশেষে শিয়ালদহ স্টেশনের প্লাটফর্ম স্পর্শ করল তাদের ট্রেন।

সুমিত ধীরে ধীরে সকলের পিছু পিছু স্টেশনে নামল। মনে মনে সাজিয়ে নিল তার পরবর্তী গন্তব্য স্থানগুলি। প্রথমে যাবে হাবড়ায় তার জ্যাঠামশাই শচীন্দ্রবাবুর বাড়ি। সেখান থেকে আসবে বড়দা অর্থাৎ তার বড় জ্যাঠামশায়ের ছেলে পরেশবাবুর বাড়ি। তারপর বারাসত। এখানে শুশান্তদা'র এবং শোভনদার বাড়ি হ'য়ে যাবে কাকার বাড়ি। সকলের কাছে তার একটাই প্রার্থনা, পরীক্ষার ফী দেবার মত সামান্য অর্থ সাহায্য চাই।

মঞ্জুর মাকে ছেড়ে সে এবার মেইন স্টেশন পেরিয়ে চলে এল নর্থ প্লাটফর্মে। এখান থেকে ছাড়বে হাবড়া যাবার গাড়ি।

হাবড়া যাবার জন্য বনগাঁ লাইনের ট্রেনের উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করছিল সে। নির্দিষ্ট ট্রেনটা ইতিমধ্যে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছাড়বার জন্য অপেক্ষা করছে। গাড়ীতে জায়গার অভাব নেই। তার মনটা মুক্তপাখীর মত উড়ু উড়ু করছিল। স্থির হ'য়ে কোন জায়গায় বসে থাকতে পারছিল না। দশ বছর আগেকার সেই মুহূর্তটিকে স্মরণ করতে চেষ্টা করছিল যে মুহূর্তে এইখান থেকেই তাদের এই শহর ছেড়ে দূরের ঐ ক্যাম্প জীবনের আশায় যেতে হ'য়েছিল। সেইদিন সে সময়ে ঠিক কোন্ জায়গায় তাদের গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল তা ঠিক তার স্মরণে আসছিল না। আজ সেইখানে একাকী পায়চারি করছিল। আজও এখানে কত লোকের সমাগম। একবার সে ভাবল আজ ভায়েরা সংগে থাকলে এইসব দেখে কতইনা খুশী হ'ত। ওদের ভাগ্যে নেই। ভবিষ্যতে ওরাও নিশ্চয়ই এই জায়গাটা একদিন দেখবে।

আপন মনে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ একসময় দেখল প্লাটফর্মে ঢুকবার দিকের গেটের কাছাকাছি যাত্রীরা ভীড় করে কি নিয়ে যেন জটলা করছে। সকলের মুখে চিৎকার শোনা যাচ্ছে— এই যাঃ, বোধ হয় শেষই

হ'য়ে গেল!

সুমিত দ্রুত এগোল ঐ ভীড়ের দিকে। একজন বৃদ্ধ নাকি পা পিছলে মেঝেতে পড়ে গেছেন। তার হাতে ছিল বাজারের দুটি ব্যাগ। খুব সম্ভব মাসের বাজার নিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্যাগের মালগুলি ছিটকে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে।

মাথা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে ভীড়ের মধ্যে ঢুকে বৃদ্ধের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছে বৃদ্ধকে দেখে চমকে উঠল সে। আরে, ইনিতো তাদের জ্যাঠামশাই শচীন্দ্রবাবু। প্রথমে এঁর কাছেই তার যাবার কথা।

জ্যাঠামশাইকে চিনতে পেরে সে সযত্নে তার ছড়ানো মালগুলি কুড়িয়ে ব্যাগগুলির মধ্যে ভরতে লাগল। লক্ষ্য করল, শচীন্দ্রবাবুর সারা দেহ ছড়ে গেছে।

ততক্ষণে উনি নিজেকে সামলে নিয়েছেন। ব্যাগ দুটি সে হাতে তুলে নিল। উনিও সুমিতকে চিনতে পেরে যেন একটু ভরসা পেলেন এবং তাকে অনুসরণ করে বনগাঁ লোকাল-এর কামরায় এসে উঠলেন।

মনে মনে সুমিত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল। যার বাড়ি যাচ্ছিল তার সঙ্গে পথেই দেখা হ'য়ে গেল। তবে এমন আঘাতের জন্য তার খুব দুঃখ হচ্ছিল।

তাদের ট্রেন ছাড়তে তখনও বেশ কয়েক মিনিট দেরী আছে। ইতিমধ্যে দু'জনে পাশাপাশি বসে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। হঠাৎ শচীন্দ্রবাবু লক্ষ্য করলেন সুমিতের পায়ে কোন জুতো নেই। গ্রামের চাষা বালকদের মতো ধুলো কাদা মাখা খালি পায়ে সে বসে আছে। এই দেখে উনি দস্তুরমতো রেগে গেলেন। গম্ভীর হ'য়ে বল্লেন, কোথায় যাচ্ছিস?

সুমিত অত্যন্ত সুবোধ বালকটির মত বলল, আপনার ওখানে, মা পাঠিয়েছেন।

ভ্রূকুটি করে বললেন, কেন?

—আমার স্কুল ফাইনালের টেস্ট পরীক্ষা হ'য়ে গেছে, পাশও করেছি। এখন ফাইনাল পরীক্ষার ফী-এর টাকা জমা দিতে পারছি না। অথচ এটা না দিতে পারলে পরীক্ষা দিতে পারব না।

তাকে আর কিছু বলতে না দিয়ে শচীন্দ্রবাবু রাগত স্বরে বলে উঠলেন, আমার বাড়িতে কেউই খালি পায়ে যায় না। এটা কলিকাতা, তোদের গ্রাম নয়। এখানে খালি পায়ে গেলে লোকে আমার নিন্দা

করবে। আমার ওখানে তোমার যাওয়ার দরকার নেই। আর, এই মুহূর্তে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করার মত আমার সংগতিও নেই। আমার বিরাট সংসার, নিজেই ভালভাবে সামলাতে পারছি না। সুনন্দাকে বলিস, যদি কিছু পারি তো আমি পাঠিয়ে দেব।

সুমিতদের মাকে ওনারা বরাবর নাম ধরেই ডাকতেন। মায়ের নাম ধরায় তাই সে বিচলিত হয়নি, কিন্তু শচীন্দ্রবাবুর কথাগুলি তার বুকে শেলের মত বিঁধছিল। ওদের সামগ্রিক পরিবারের মধ্যে সেও তো একটা ছেলে!

পিতৃবিয়োগের পর আজও তারা একবার চটি পবার সুযোগ পায়নি। আর জুতো না পরে বাড়ি গেলে কিনা ওনাদের সম্মানহানি হবে!

মনে মনে স্থির করে ফেলল জ্যাঠামশাই-এর বাড়ি সে আর যাবে না। তাছাড়া, যে কারণে যাওয়া সে বিষয়ে উনি তো ওনার অক্ষমতা জানিয়েই দিলেন। তবে মিছামিছি কেন আর যাওয়া?

হাবড়ার টিকিট রয়েছে তার পকেটে। তবু ঠিক করল সে বারাসাতে নেমে পড়বে। ওখানে শোভনদা ও তার অন্য দুই ভাই মিলে বাড়ি করেছেন।

এইসব ভাবতে ভাবতে মর্মান্তিক দুঃখে তার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। অতি কষ্টে উদ্‌গত অশ্রু দমন করতে হচ্ছিল তাকে। তার পাশেই শচীন্দ্রবাবু বসে রয়েছেন। শচীন্দ্রবাবুর সামনে কাঁদতে পারছিল না, অথচ চোখের জল বাধা মানতে চাইছিল না। এই অবস্থায় হেঁচ্‌কি ওঠার সংগে সংগে তার নাক দিয়ে জল গড়াতে শুরু করল, চোখমুখ লাল হয়ে গেল।

জ্যাঠামশাই ভাবলেন তার বোধ হয় সর্দি হয়েছে। একটু ভৎসনার সুরেই বললেন, খালি পায়ে চলাফেরা করবি, সর্দি লাগবে না তো কি? সর্দির ওষুধ খেতে পারিস না?

হায় ভগবান! কি ভাষায় ওনাকে বোঝাবে যে এ তার সর্দি নয়। ক্ষুব্ধস্বরে বলল, না ও কিছু নয়, ঠিক হয়ে যাবে।

এমন সময় লজেন্স হাতে একজন ফেরিওয়ালা তাদের কামরায় উঠল। সর্দির প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে একটা পিপারমেণ্ট লজেন্স তাকে কিনে দিলেন শচীন্দ্রবাবু। লজেন্সটা মুখে দিয়ে সে সময় গুণতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে সেই শুভমুহূর্ত এসে হাজির হ'ল। হৃদয়পুর থেকে ট্রেন ছাড়তেই সুমিত বলল, বারাসতে নামবো আমি। ওখানে শোভনদার সঙ্গে আগে একবার দেখা করে যাই।

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শচীন্দ্রবাবু বললেন, সেই ভাল। ওরা এখন খুব ভাল আছে। তিন ভাই আয় করছে, ওদের পক্ষে দানধ্যান করা সম্ভব। যা. নিশ্চয়ই ওদের কাছ থেকে টাকাটা পেয়ে যাবি।

বারাসতে পৌঁছলে তাদের গাড়ী। সুমিত সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে শচীন্দ্রবাবুকে প্রণাম করে ওখানেই নামার অনুমতি চাইল।

সম্মতি জানিয়ে উনি বললেন, তোর মাকে বলবি আমার শরীরটা ভাল নেই। আমার নিজের আর্থিক অবস্থাও এখন ভাল নয়। যখন পেরেছি তখন সকলের জন্য করেছি, আজ আমার সে ক্ষমতা নেই।

সামান্য কয়েকটা টাকা দিয়ে সাহায্য করার পরিবর্তে এত সব অজুহাত দেখিয়ে ওনার প্রত্যাখ্যান করাটা সুমিতকে নিদারুণভাবে মানসিক আঘাত করেছিল। শচীন্দ্রবাবু তার আবেদন উপেক্ষা করবেন ভাবতেই পারেনি সে।

বারাসত স্টেশনে নেমে ওনার সুমুখ থেকে আড়াল হ'তেই দ্রুত পা চালিয়ে স্টেশনের বাইরে যেতেই সুমিতের মনের ভার কিছুটা লাঘব হ'ল। বারাসতের রাস্তাঘাট এবং লোকজন দেখে ভাঙ্গা মনে আবার যেন জোর পেলো সে। এমন ব্যস্ত শহর ছেলেবেলার পর আর চোখে পড়েনি তার। ধীরে ধীরে কলোনীর মোড় পেরিয়ে সুভাষ ময়দানটা ডাইনে রেখে ছোট-বাজারের দিকের পথে চলতে লাগল সে। ছোটবাজারের কাছে পৌঁছেই 'বরিশাল ভাণ্ডার' নামের মুদিখানা দোকানের মালিকের সাহায্য প্রার্থনা করল। দাদার বাড়ির ঠিকানাটা ওনাকে জিজ্ঞাসা করতেই উনি সঠিক পথনির্দেশ করে দিলেন

সেই পথ ধরে দাদার বাড়ি পৌঁছে গেল সুমিত। বাড়ির সকলকে প্রণাম করে নিজেদের কুশল জানাল সে। অবাক হ'য়ে সে ভাবছিল শৈশবে যাঁদের দেখেছিল আজ তাঁরা কেউ বৃদ্ধ, কেউবা প্রৌঢ় হ'য়েছেন।

মাতৃসমা শোভনদার মা এতদিন পর সুমিতকে দেখে যেন আকাশের চাঁদ হাতের কাছে পেলেন। ছোটবেলার স্মৃতিগুলো দ্রুত তার মনের পর্দায় ছুটোছুটি করতে লাগল।

আনমনা ভাবে জ্যাঠাইমা বলতে লাগলেন, এ পরিবারের বৌ হ'য়ে

এসে শরৎকে ছোট ভাই-এর মতো দেখেছিলাম, সেই শরৎএর ছেলে তুই। আজ যদি ও বেঁচে থাকত, কি আনন্দই না পেত।

স্মৃতির রোমন্থন করে এই সব কত কথাই না বলে ফেললেন জ্যাঠাইমা।

সকলে বলতে লাগলেন সুমিত কতই না বড় হ'য়েছে। আর কিছুদিন পরে সেই সুমিত স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা দেবে, এ যেন ভাবাই যায় না।

প্রণামের পাট মিটিয়ে জামাটা খুলে বসে পড়ল সে বারান্দায় রাখা চৌকিটার উপর। বাবার আমলের কাজ করা এই সেগুন কাঠের চৌকিটা ক্যাম্পে যাবার সময় সংগে নেওয়া সম্ভব হয়নি বলে মা দাদাকে ওটা দিয়ে দিয়েছিলেন। পিতৃস্মৃতি জড়ানো এই সামান্য জিনিষটাও যেন অতীতের বহু ঘটনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

নানা বিষয়ের আলোচনার পর সুমিত তার আসার প্রকৃত প্রসঙ্গটা তুলল। সঙ্কোচের সংগে বলল, সামান্য ত্রিশটা টাকা জোগাড় করতে তারা অক্ষম।

মাত্র দশ বৎসর সুমিতরা তাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। এর মধ্যেই কলিকাতা ও তার পার্শ্বস্থ সব অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেছে। বিধাতার এমনই বিচিত্র লীলা।

দাদাদের সংসার ইতিমধ্যে বড় হ'য়েছে। সেই সংগে তাদের দায়-দায়িত্ব বেড়েছে। বাজার এতো খারাপ যে সারাদিন পরিশ্রম করেও তারা কিছু করতে পারছে না। তাদের এখন দিন চলা ভার।

তাদের এইসব আলোচনা প্রসংগত শুনতেই হ'ল সুমিতকে। তবে দাদারা শচীন্দ্রবাবুর মতো শুধু হাতে বিদায় করলেন না।

দাদাদের এবং অন্যান্য আত্মীয়দের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাত্র পনেরো টাকা সাহায্য হিসেবে জোগাড় হ'ল। গত দশ বৎসরের ধুবুলিয়া ক্যাম্পে বসবাস কালে এই সহৃদয় আত্মীয় বা বন্ধুরা একটা চিঠি দিয়েও সুমিতদের খোঁজ রাখেন নি, তবু সবাই মিলে যেটুকু দিলেন তাই সম্বল করে ফিরে যেতে হ'ল তাকে। পথে আরও সাহায্যের আশায় সময় নষ্ট করার উপায় ছিলনা তার। টাকা জমা দেবার শেষ দিন এগিয়ে আসছে।

ঐ পনেরো টাকার মধ্যে যাতায়াতের খরচা বাবদ ছয়-সাত টাকা খরচও হ'য়ে গেল। ফিরতি পথে ট্রেনে বসে তাই ভাবছিল সুমিত, এত পরিশ্রম আর সময় নষ্ট না করে চারপাঁচটা দিন জন খাটলে হয়তো এই টাকা ক'টা

জোগাড় করে ফেলতে পারত সে।

সত্বর ক্যাম্পে ফিরে মাকে অর্থ সংগ্রহের সব ঘটনাগুলির বিবৃতি দিতেই ওনার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। এখন কি হবে! কেমন করে এই অল্পদিনের মধ্যে বাকী টাকার ব্যবস্থা করবেন তিনি?

অসহায় কণ্ঠে সুমিতকে বললেন, টাকার জন্য এখন কি করি বলতো?

এমন সময় উঠোন থেকে হাঁসদুটির প্যাক্ প্যাক্ এবং কালি নামের ছাগলটির ব্যা ব্যা ডাক হঠাৎ যেন তাদের মনে একটা উপায়ের সন্ধান দিল।

মাস কয়েক আগে কালির একটা বাচ্চা হ'য়েছিল। আদর করে মা ওর নাম দিয়েছিলেন বুদ্ধু। প্রায় সাত মাস বয়সের ঐ বুদ্ধুর গায়ের রঙ্ মিশমিশে কালো। বেশ নাদুসনুদুস শরীর। পাঁঠা বলেই সর্বদা ঘোত্ ঘোত্ করে চলতো। একটু বিরক্ত করলেই সদ্য গজানো খাঁড়া শিং দুটো দিয়ে সজোরে ঢু মারতো।

সুমিতের পরীক্ষার ফী-এর বাকী টাকাটা জোগাড় করার দায় এসে পড়ল শেষপর্য্যন্ত ঐ বুদ্ধুর উপর। বুদ্ধু বলেই ও হয়তো কিছু বুঝতে পারল না। পরের দিন ও নির্বিবাদে কশাই-এর মাজার গামছায় ধরা দিল। দাম নেহাত কম হ'ল না। সুমিতের কাজ চলার মতো তো বটেই, তার চেয়ে কিছু বেশীই পেল। বোকা পাঁঠাটা একবার মুখ ফিরে তাকালো না। ভ্রমণের নেশায় মত্ত হ'য়ে অজানার পথে পাড়ি দিল। ওর ঐ ক্ষুদ্র পশু জীবন উৎসর্গ করে সেদিন তাকে প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করে দিয়েছে, এ কথা যখনই সুমিতের মনে পড়ে তখন অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে বৈ-কি।

পরের দিনই মহানন্দে স্কুলে গিয়ে ফর্ম এবং ফি-এর টাকা যথারীতি জমা করে দিল সুমিত। সেই দিনের আলোয় সে পেল স্নিগ্ধ উজ্জ্বল্যের এক মধুর আস্বাদ। কল্পনার এক মনোরম ভবিষ্যত যেন তাকে হাত তুলে ডাকছে। সেই স্বপ্নময় ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভেবে আনন্দে বিভোর হ'য়ে পড়ছিল সে।

বাড়ি ফিরে আসতেই মা মাথায় আশীর্ব্বাদ করে চুমু খেয়ে বললেন, তোর পরীক্ষায় পাশ করা চাই-ই। এই পাশের সঙ্গে তোর ও আমাদের সকলের ভবিষ্যৎ যেমন জড়ানো, তেমনি তোর বাবার কল্পনাও। তোর

বাবা প্রায়ই বলতেন—তুই একদিন বড় হবি, লেখাপড়া করবি, আমাদের সমস্ত কষ্ট দূরে হয়ে যাবে।

কথাগুলি বলতে বলতে মায়ের চোখদুটো ছলছলিয়ে উঠল, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

এবার জয়লাভের জন্য সুমিতের প্রস্তুত হবার পালা। মনে তার দারুণ আশার সঞ্চার হ'ল। এই জীবনযুদ্ধে জয়লাভ তাকে করতেই হবে। মনকে আরও দৃঢ় করে প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। সামনে আর মাত্র আড়াই মাস সময়। মূলবান এই সময়টুকু নষ্ট করার কোন উপায় নেই। সময়টাও এতো দ্রুত ছুটছে যে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাত নেই, দিন নেই, খেলা নেই, বন্ধু নেই—সব ভুলে গেল সে। তার এখন একমাত্র লক্ষ্য আগামী পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে।

দিন গুনতে গুনতেই ফাইনাল পরীক্ষা চলে এল। স্কুলের কালো নোটিশ বোর্ডটায় পরীক্ষার রুটিনও ঝোলান হ'ল একদিন। খবর পেয়ে সেবারের পরীক্ষার্থীরা সকলেই ছুটল স্কুলের দিকে। সবার সঙ্গে সুমিতও রুটিনটা টুকে নিয়ে এল। সদাশয় মাষ্টারমশায়েরা নানা কথা বলে তাদের উৎসাহিত করলেন।

এর দু'চার দিন পরেই এসে গেল পরীক্ষার তারিখসহ এ্যাডমিটকার্ড এবং কার কোথায় সিট পড়েছে তার সঠিক বিবরণ। নাম ও রোল নম্বর লেখা এ্যাডমিট কার্ডটা হাতে নিয়ে সুমিত দেখল যে তার সিট পড়েছে কৃষ্ণনগর এ. ভি. এম স্কুলে।

এবার তার আর একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিল। কৃষ্ণনগরে থাকবে কোথায়? এখান থেকে রোজ ওখানে গিয়ে পরীক্ষা দেওয়া মানে পথবর্তী নানা বিপদের ঝুঁকি নেওয়া।

অগত্যা দীনাদার স্মরণাপন্ন হ'ল সে। উনি তার এই সমস্যার ব্যাপারেও দয়াপরবশ হ'য়ে একটা ব্যবস্থা করে দিলেন। কৃষ্ণনগরে 'চিত্রমন্দির' সিনেমা হলের কাছেই ওনার এক মাসীর বাড়ি। ভারতী ওখানে থেকে পরীক্ষা দেবে। দীনাদা সুমিতের জন্যও ওখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

পরীক্ষা শুরু হবার মাত্র দু'দিন আগে সে তার জামাকাপড় এবং সমস্ত বইপত্র গুছিয়ে নিয়ে মাকে প্রণাম করে কৃষ্ণনগরের পথে রওনা হ'ল। সুমিত প্রণাম করাব সঙ্গে সঙ্গে ওর মা দু'নয়ন বন্ধ করে ইষ্ট দেবতাকে

স্মরণ করলেন। প্রাণের আশা আকাঙ্ক্ষা একটা রূপ নিতে চলেছে। ভগবান নিশ্চয়ই মুখ তুলে চাইবেন। নানান কথা ভাবতে ভাবতে সুমিতের গতিপথের উপর নজর রাখছিলেন। যতক্ষণ সুমিতকে আপছা আপছা দৃষ্টি পথে আসছিল, ততক্ষণ উনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভগবানের কাছে ওনার প্রাণের প্রিয় আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করছিলেন। এবার সুমিত দৃষ্টি পথের অগোচরে চলে গেল, করজোড়ে দেবকুলের উদ্দেশ্যে আর একবার প্রণাম জানিয়ে ঘরে ফিরলেন।

সুমিতের মনেও ভীষণ চিন্তা। মায়ের কল্পনার সার্থক রূপ দিতেই হবে। সে যত কষ্টই হোক বা যেমন করেই হোক পাশ ওকে করতেই হবে। এমন কত কথা চিন্তা করতে করতে নির্বোধ মনটা পৃথিবীর বাহ্যিক কোন বস্তুর দিকেই নজর করল না। শুধু মাত্র ট্রেনটায় উঠল এবং যথাসময়ে কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে নেমে পরল। এর মধ্যে অন্য কোন জগতের কথা একটি বারও ভাবতে পারল না, শুধু একটিই ভাবনা, পরীক্ষা। জীবনে উত্তরনের প্রথম ধাপ। যে করেই হোক, অতিক্রম করতে হবে।

কৃষ্ণনগরে দীনাদার মাসীবাড়িটা অনেকগুলো ঘর নিয়ে প্রকাণ্ড বড় একটা বাড়ি। বাড়ির বাইরের দিকটায় অনেক ঘরই ফাঁকা পড়ে থাকে। ঐ বাড়িতে সুমিতের থাকার অসুবিধা হ'লো না। একটা বড় ঘর ওনারা ছেড়ে দিলেন তার জন্য। ভারতীর জন্য অন্দরমহলে আলাদা থাকার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

তবু দুজনে একই বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে ভেবে সুমিতের যে কি আনন্দ হ'য়েছিল তা বলে শেষ করা যাবে না।

ভারতীর সিট্ পড়েছে খয়রা নদীর পারে গভর্ণমেন্টস্ গার্লস স্কুলে, আর সুমিতের এ. ভি. এম স্কুলে।

পরীক্ষার আগের দিন বিকেলেই ওরা দুজনে একসাথে বেরিয়ে পড়ল নির্দিষ্ট স্কুলগুলির দূরত্ব ও অবস্থান দেখে নিতে। পরের দিন তাহলে নিশ্চিন্ত মনে পরীক্ষা দিতে যেতে পারবে।

পথে নেমেই সুমিত বলল, ভাগ্যিস দীনদা তোদের মাসীবাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন, নয়তো আমার পক্ষে এই পরীক্ষা দেওয়াটা দারুণ কষ্টের হ'ত।

ভারতী সুমিতের কাছাকাছি সরে এসে বলল, সে তো করবেনই, দাদা বরাবরই তোকে স্নেহ করেন। ওসব কথা থাক, এখন বল তো তোর

প্রিপ্যারেশান কেমন হ'য়েছে ?

—প্রিপ্যারেশান যথাসাধ্য করছি। এখন ফল ভালো হওয়া না হওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। বলেই সুমিত ভারতীর দিকে অসহায় ভাবে তাকালো।

—ভাবিস না, তুই যেভাবে খেটেছিস্ তাতে ঠিক উৎরে যাবিই।

—সে তো তুই আমার ভালো চাস্ বলে বলছিস্! কিন্তু তোর অবস্থাটা কেমন। দীনাদার সাহায্য তুই তো বেশীই পেয়েছিস।

—পেলে কি হবে, আমি কিন্তু নার্ভাস হ'য়ে পড়ছি। কাল পড়তে বসে মনে হচ্ছিল কিছুই যেন মনে থাকছে না।

—সেটাত আমারও হচ্ছিল, কিন্তু নার্ভাস হলে তো চলবে না। এদিক ওদিক হলে দীনাদার কাছে মুখ দেখাবো কি করে ?

অদূরে একটা উঁচুমত বিশেষ ধরনের বাড়ির দিকে দৃষ্টি পড়তেই ভারতী বলে উঠল, ঐ দ্যাখ, ওটাই বোধ হয় একটা স্কুল।

ঠিকই তাই। হাঁটতে হাঁটতে প্রথমে ওরা এ. ভি. এম স্কুলে পৌঁছে গেল। দু'জন দারোয়ান বসেছিল গেটে। দারোয়ানরা ওদের বলল, অসময়ে স্কুলের ভেতর কারো ঢোকা নিষেধ। বিশাল প্রাচীর দেয়া স্কুলটাকে তাই নেহাতই বাইরে থেকে দেখে ফিরল ওরা। এরপর ভারতীর জন্য খয়রা নদীর দিকে গভর্নমেণ্ট গার্লস স্কুলের খোঁজে এগোলো দুজনে।

সেই স্কুলটারও হদিস মিলতেই ওদের দুজনার সে কি আনন্দ। স্কুলগুলি দেখার পর সন্ধ্যা হওয়ার আগেই বাড়ি ফিরে এসে যে যার নির্দিষ্ট ঘরে চলে গেল ওরা।

প্রথম দিন বাংলা পরীক্ষা, ইমপরটেণ্ট দেখে বাছাই করলেও পড়তে হবে অনেক রাত পর্যন্ত। একটু পরেই বাড়ির লোক এসে যথারীতি চা ও জলখাবার দিয়ে গেল সুমিতকে। বলে গেল, রাতের রান্না হলে ডেকে নিয়ে যাবে। সে জানে যে আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি নেই এদের। পরের বাড়ির ছেলে বলে ওকে ভাবতেই দেওয়া হচ্ছে না। সে নিশ্চিত মনে শেষ প্রস্তুতিতে মন দিল।

একে একে তারপর পরীক্ষার দিনগুলি কেটে যেতে লাগল।

দীনাদার এই আত্মীয় বাড়ির সকলের যত্ন সহযোগিতা এবং সহানুভূতি সুমিতের চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সুমিত খোঁজ নিয়ে জানল তার মত ভারতীও সকল পরীক্ষা বেশ

ভালভাবেই দিচ্ছে। ঐ খবরে তার উৎসাহ এবং প্রেরণা যেন আরও বেড়ে যাচ্ছিল।

শেষ পরীক্ষার দিন তার ছুটি হতেই ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গেল ভারতীকে সঙ্গে নিয়ে আসতে। এগোবার পথে ভারতীর সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র তার সকল ক্লান্তি যেন দূরে হয়ে গেল।

দু'জনে একত্রে ফিরছিল বাড়ির দিকে। একথা সেকথা বলতে বলতে পরীক্ষার প্রসঙ্গ ছেড়ে ভারতী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, পাশ করে কি করবি ?

উদ্দীপ্ত স্বরে সুমিত জবাব দিল, কেন, কলেজে পড়ব, চাকরি করব, জীবনে আরও এগোবার কথা ভাবতে হবে।

সুমিতের উত্তরটা ভারতীকে বোধ হয় খুশী করতে পারল না। ও বলল, ছেলেরা কেমন স্বার্থপর! তুই পাশ করবি, আবার কলেজে পড়তে কলকাতা চলে যাবি। তারপর চাকরি করবি, কত দূরে দূরে ঘুরবি। আর আমরা ? মেয়ে হয়েছি বলে জীবনভোর শুধু সংসার আগলে বসে থাকবো।

ওর ঐ আবেগপূর্ণ কথাগুলির কোন বিরূপ মন্তব্য না করে সুমিত বলল, এটাই তো নিয়ম। ছেলেরা যদি কিছু না করে তবে মেয়েরাই বা সুখী হবে কি করে ? সুখের দায়িত্ব যে নিতে চায় সে কি কিছু না করে চুপ করে বসে থাকতে পারে ?

—কিছু করার শক্তি অর্জনের জন্যই তো আরও পড়া। অবশ্য আমার সাংসারিক প্রয়োজন পড়াশোনায় আরও এগোবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবুও এরই মধ্যে আমাকে সুযোগ খুঁজতে হবে যাতে কলেজের পড়ার ছেদ না পরে।

—কিন্তু অতিরিক্ত উচ্চাশা অনেক সময় পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

ভারতীর এই কথাটার আসল লক্ষ্য কি বুঝতে পেরে সুমিত একটু থেমে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, না রে, যেখানেই থাকি না কেন, আর যা-ই করিনা কেন, তোকে আমি ভুলবই না।

কথা বলতে বলতে বাড়ি পৌঁছে গেল ওরা। ঠিক হল কাল সকালের গাড়ী ধরে দু'জনেই ধুধুলিয়া ফিরে যাবে।

আজ রাতে আর কোনো কাজ নেই। বইগুলি যেন অনেক পর হয়ে গেল। ধীরে ধীরে হাতমুখ ধুয়ে এসে কাল সকালে চলে যাবার জন্য

নিজের জিনিষপত্র গোছাতে লাগল সুমিত। যারা তাকে এই কয়দিন আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদের কি বলে ধন্যবাদ জানাবে মনে মনে ভাবছিল সে। এমন সময় সহাস্য বদনে ভারতী ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে তার ঘরে এসে উপস্থিত হ'ল।

সুমিত খুশী হয়ে ওর দিকে চাইতেই ও বলল, এই নে তোর চা। খুব গোছগাছ করছিস্ দেখছি। মনে হচ্ছে তুই যেন আমাকে রেখেই চলে যাবি ?

ওর কথা শুনে হকচকিয়ে উঠল সুমিত কি উত্তর দেওয়া যায় ভেবে পাচ্ছিল না। ও আবার বলতে লাগল, এটাই তোদের ধর্ম দিন এলে ছেলেরা আমাদের কথা ভুলে যায়।

এবার আর চুপ করে না থেকে বলে উঠল সুমিত, না না কাল ভোরে আর কিছু করব না। একটু বেলায় উঠলেও চলবে, তাই কাজগুলি এগিয়ে রাখছি।

ততক্ষণে চৌকির এক পাশে চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে ভারতী বলল, বোস্, চট্ করে আমার চা-টাও এখানে নিয়ে আসি।

সুমিত তার বইপত্রগুলি গুছিয়ে রেখে চৌকির উপর উঠে বসতে না বসতেই ভারতী নিজের কাপটা হাতে নিয়ে এসে তার পাশে বসে পড়ল।

ঘরের বিজলীবাতির আলোয় ওর বড় বড় লাল ফুলের ছাপা জামাটা জ্বল জ্বল করছিল। তারপর চা খেতে খেতে ও সুমিতের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল

ও বলল, এই, তুই পাশ করে চাকরি করতে বাইরে চলে গেলে আমাকে মনে রাখবি তো ?

ওর প্রশ্নটা সুমিতকে বিব্রত করে তুললো। এ আবার কেমন কথা ! মানুষ আবার মানুষকে ভুলতে পারে নাকি ? কিছু জবাব না দিয়ে আর চুপ করে থাকা যায় না। সুমিত বলল, ভুলব কেন ? এত দিনের পরিচয় কি সহজে ভুলে যাওয়া যায় ?

—ও, পরিচয়টাই শুধু বুঝি মনে রাখবি ? পাল্টা প্রশ্ন করে ভারতী চোখমুখ কুঁচকে তার দিকে তাকাল।

সুমিত ও ঠিক এর চেয়ে ভাল উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না। কি বলা যায় ভাবতে ভাবতে সে বলল, তুই শুধু শুধু অবান্তর প্রশ্ন করিস কেন বলতো ? আমার বুঝি মন নেই ? মন যত তোদেরই আছে। এমনভাবে

বলছিস যেন মায়া, দয়া, স্নেহ, মমতা শুধু তোদের জন্য, আমাদের কিছুই নেই।

ভারতী ঈষৎ সংযত হ'য়ে বলল, না না সেজন্য নয়। জানিস আমি কি ভাবছি ?

কি ?

—মা বলেছেন এবার পাশ করলেই আমার বিয়ে দিয়ে দেবে, দাদারও তাই ইচ্ছে। তোর যদি তাড়াতাড়ি একটা চাকরি হ'য়ে যেত তাহ'লে—

—তাহ'লে কি ?

—ওঃ, তোকে আর বোঝানো যাবে না। তুই চিরদিনের হাঁদা হ'য়ে রইলি।

—কি, বল না।

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে ওর দিকে একটু জড়সড় হ'য়ে ঝুঁকে বসল সুমিত। ওর মুখে আর কথা নেই। লাল হ'য়ে উঠল ওর মুখটা। বিজলী বাতির উজ্জ্বল আলোয় ওর মুখটা ভীষন সুন্দর লাগছিল।

একটু সময় চুপ করে থেকে ও বলল, দেখ্ চাকরি তুই যেখানেই করিস্ না কেন, আমাকে দূরে ফেলে রাখতে পারবি না। আমাকে কিন্তু তোর কাছে কাছে রাখতে হবে। তোর মা-ভাইদেরও কাছে নিয়ে রাখবি।

এত সহজভাবে ওর নিজের কথা বলতে শুরু করল যে সুমিত পুলকিত বিস্ময়ে চঞ্চল হ'য়ে উঠল। ওর ঐ প্রস্তাবের উপর তার মতামত দেবার জন্য তৈরীও ছিল না সে। সবেমাত্র সে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। কি ভবিষ্যৎ, কি চাকরি, কোনটারই তার স্থিরতা নেই, অথচ আজই ওর কাছে তাকে অঙ্গীকার করতে হবে। এখনই কি বলবে ওকে ?

একটু থেমে একটু ভেবে সে বলল, আগে চাকরি পাই তারপর তো সংসার।

—পুরুষ লোক চাকরি পাবে না, এমন তো হয় না। একদিন তো পাবেই।

—সে তো অনেক দিন দেরীও হোত পারে।

—হোক্গে দেরী, আজ কথাটা বলে রাখ্না, দেরী হয়তো আমি বুঝবো।

উচ্ছ্বসিত হ'য়ে শেষের কথাটা বলেই খিল খিল করে হাসতে হাসতে বিছানার উপর গা এলিয়ে দিল ভারতী।

কি ভীষণ মুহূর্ত! আজ, এখনই ওকে জবাব দিতে হবে।

সাহসে ভর করে সুমিত বলল, আচ্ছা-তোর কথা তো শুনে রাখলাম, আমার এর বিপক্ষে কিছু বলার নেই। সে ছাড়া, তোদের ঋণ স্বীকার না করলে পাপ হবে।

—এতে আবার ঋণের কি আছে? এ তো শুধু আমার পাওনা, দেবার মালিক তুই। বলেই হাতটা বাড়িয়ে সুমিতের হাতটা টেনে নিয়ে আবেগজড়িত স্বরে আবার বলল, বল্ তুই, কথা দে—

ওর উষ্ণ হাতের স্পর্শ সুমিতের দেহের মধ্যে বিদ্যুতের শিহরণ জাগিয়ে দিল। ভয়ও পেল সে। এটা একটা অন্য লোকের বাড়ি। এখানে সে আশ্রিত। এই পরিবেশে সে নিজেকে যদি সংযত না রাখতে পারে তাহ'লে কি ভয়ানক কেলেঙ্কারি হ'য়ে যাবে।

ফিস্‌ফিসিয়ে বলল সে, এই, হাতটা ছাড়্, তোর মাসী এসে পড়বেন, আমার দারুণ লজ্জা করছে।

ভারতী আরও ঘনিষ্ট হ'য়ে তার পায়ের উপর নিজের মাথাটা রেখে বলল, মাসীকে আমি সব বলেছি। ও খুব মাইডিয়ার আছে, কিছু বলবে না।

সুমিতের বুকে তখন কম্পন শুরু হ'য়ে গেছে। ভারতীর মুখের উপর তার সমস্ত দেহটার ছায়া কাঁপছে। একটু আলগা হ'য়ে নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইল সে। কিন্তু ওর দু-বাহুর বন্ধন ছাড়াতে পারল না। চার দেওয়ালের ঘেরা নির্জন এই ঘরের মধ্যে এমন এক অকল্পনীয় দৃশ্যের সে তখন নায়ক।

ঐ অবস্থায় ভারতী নির্ভয়ে বলল, কিরে, তোর এতো ভয়? তবে শেষরক্ষা করবি কি করে?

ততক্ষণে সুমিত নিজেকে সামলে নিয়েছে। দৃঢ়তার সঙ্গে মৃদুভাবে বলল সে, এই চল্, রাত হ'য়েছে। ভাত খেয়ে শুয়ে পড়বি, আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে ঘুমোব। কাল সকালে আবার যেতে হবে না? দেরী করে লাভ নেই।

ভারতী তবুও নাছোড় বান্দা। বলল, মাসীকে বলে এসেছি, রান্না হলে আমাদের ডাকবে।

যতই বলুক না কেন তার কিন্তু ভালো লাগছিল ওর কথাগুলো, ওর স্বচ্ছন্দ প্রকাশভঙ্গীটাও! পুলকিত হ'য়ে ভাবল মাসীকে জানিয়েই তাহলে

ও তার সঙ্গে এই সব করতে এবং বলতে এসেছে। তবে তো আর উপায় নেই এই মুহূর্তে ওর হাত থেকে রেহাই পাবার।

এমন একটা মাধুর্যময় উপলব্ধির সান্নিধ্য তার জীবনে এই প্রথম। চোখের সামনে সে দেখতে পাচ্ছে এক উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী সম্ভোগের সামগ্রী নিয়ে তার সর্ব দেহ শিথিল করে সুমিতের কাছে মেলে ধরেছে। বোধ হয় বয়সের অনভিজ্ঞতায় তার মনের দুর্বলতা তখনো প্রকাশ করতে না পারলেও ওর নিবীড় স্পর্শটুকু তার গলার স্বরকে ক্ষীণ করে দিল। ওর পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে, ওর মাথার এক রাশ কালো চুল বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়ায় কেমন সুন্দর উড়ছে তাই দেখতে লাগল সুমিত। ওর গায়ের জামাটা থির্ থির্ করে হাওয়ায় কাঁপছিল। দেখে দেখে সুমিতের চোখদুটো বিভোর হয়ে যাচ্ছিল।

বাইরে খুট্ করে হঠাৎ যেন কিসের শব্দ হ'ল। চকিতে ভ্যাজানো দরজার দিকে তাকাল সুমিত। ভয়ে জড়সর হ'য়ে উঠল সে।

তার মানসিক অবস্থাটা বুঝতে ভারতীর অসুবিধা হ'ল না। শুয়ে থেকে নিরুদ্বেগ কণ্ঠেই ও বলল, না না কেউনা, ওরা সব রাত দশটার আগে আসেই না। তোর শুধু ভয় আর ভয়। আমি যদি পুরুষ হতাম—

—কি করতিস্ তুই ? এই মুহূর্তে আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতিস ?

—দূর., তোর দ্বারা বোধ হয় আর কিছু হবে না। নে, অন্য কথা বল। কথাক'টি বলে ও তার হাতটা টেনে এবার ওর কপালের উপর রাখল।

ওর একরাশ চুলের মধ্যে হাত বোলাতে লাগল সুমিত। কি নিদারুণ সংশয়, আবার কি ভীষণ আনন্দ! এই টানাপোড়েনে তার মন ভয়ানক আন্দোলিত হতে লাগল।

ভারতী ওরই মধ্যে তার হাতটাকে এক একবার জড়িয়ে ধরে নিজের গালে, কপালে, বুকের মাঝখানে চেপে ধরতে লাগল। সে কি ভীষন জোর। তার শিথিল হাতখানা ওর ঐ খেয়ালীপনায় কোনো বাধা দিতেই পারল না। মাঝে মাঝে সুমিত 'এই কি হচ্ছে—এই থাম্—আর টানিস্ না' ইত্যাদি টুক্রো টুক্রো কথা ছাড়া আর কোন কথাই বলতে পারল না।

এই সময়ে ওদের খাবার ডাক পড়ল। হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচল সুমিত।

এ যেন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের জন্য লড়াই করা। এমন লড়াই এর আগে কখনও তাকে করতে হয়নি।

ভাক শুনেও ও তাকে ছাড়তে চাইছিল না। একটু শিথিল ভঙ্গীতে বলল, এখন তো পড়া শেষ, তবু আমাদের বাড়ি যাবি কিন্ত।

সুমিত ওর গালে হাত বোলাতে বোলাতে গাঢ়স্বরে বলল, তোকে না দেখে আমি থাকতেই পারবো না।

খাওয়াদাওয়া সেরে এসে সে রাতে বিছানায় শুয়ে সুমিত অনিদ্রায় ছটফট করছিল। ভারতীর অনাবৃত দেহলাবণ্য স্বপ্ন হ'য়ে দেখা দিল তার মনে। ভারতী তাহলে চিরদিনই তার হ'য়ে থাকতে চায়! কিন্তু এখনই তার পক্ষে ঐ অবস্থাটা কি করে মেনে নেওয়া সম্ভব? একজন নারীকে কেন্দ্র করে এমন মধুর অথচ জ্বালাময় সমস্যা তাকে জড়িয়ে ধরতে পারে তা সে কোনোদিনও কল্পনা করতে পারেনি।

ভাবতে ভাবতে তার মাথাটা যেন গরম হ'য়ে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল, বাইরে ঘরে এল এবং পাশের কুঁজোয় রাখা জল খেয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করল। অবশেষে মাথার উপরকার ফ্যানের স্বইচ্ টিপে দিল। এইভাবে নানা কথা ভাবতে ভাবতে মাঝরাতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে, সেই জানে না।

পরের দিন বাড়ীর লোকেরাই ডেকে দিয়েছিল। সকালের ট্রেনে ভারতীর সঙ্গে আবার ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু শিবিরে ফিরে এল সুমিত। তার পরীক্ষা ভালো হ'য়েছে শুনে সকলেই খুশী হলেন।

এতদিন সে এবং তার পরিবার অনেক সমস্যা পেরিয়ে এসেছে, কিন্তু এবার যে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হ'ল তাকে যা তার জীবনের সব চেয়ে বড় সমস্যা।

সরকারের নিয়ম অনুযায়ী স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করলে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছেলেকে সাবালক বলে ধরা হয় এবং সুমিত পাশ করলেই ঐ নিয়মমাফিক শিবির ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে তাকেও নিজ পরিবারের সকলকে সঙ্গে নিয়ে।

সরকারের পুনর্বাসন দপ্তর শিবির ছেড়ে যাবার সময় দেবে মাত্র তিন বা চার কাঠা জায়গা, ঘর বানাবার জন্য চোদ্দশো পঞ্চাশ টাকা এবং ব্যবসা করার জন্য আরো সাতশো পঞ্চাশ টাকা। সবটা মিলিয়ে বাইশশো টাকা উদ্বাস্তু জীবনের শেষ পাওনা বা শেষ সম্বল। দয়াপরবশ হ'য়ে

অতিরিক্ত দেবে পনের দিনের রেশন।

আর মাত্র তিন মাস পর স্কুল ফাইনালের পাশের খবরে যদি নাম থাকে তাহলে সুমিত সাবালকত্বে উন্নীত হবে এবং উপার্জনশীল বলে গণ্য হবে। তারপরই তার জীবনে নেমে আসবে পরিবারস্থ সকলের ভার বহনের ঝুঁকি। অনিশ্চিত জীবন সংগ্রামের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে তাকে।

সকল উদ্বাস্তুদের এই অবস্থার শিকার হোতেই হয়। এর থেকে পরিত্রাণ পাবার কোনো উপায় নেই।

উদ্বেগাকুল চিত্তে সর্বদা সেই কথা ভাবতে হচ্ছে সুমিতকে। তাদেরও শিবির ছেড়ে চলে যেতে হবে। তেমন সময়ে কোথায় যাবে তারা? কি করে চারজনার সংসার চলবে? সে নিজে বাইরের জগতের কতটুকুই বা বোঝে? ঐ সামান্য টাকায় কিইবা ঘর বানাবে আর কিইবা ব্যবসা করবে?

ঐ তো রামের মা মাত্র দু বছর আগে পুনর্বাসন নিয়েছে। এরই মধ্যে খবর পেয়েছে যে রাম আজও বেকার। কোনো চাকরি রাম পায়নি। ঘর বানাবার জন্য সরকারী টাকা ভেঙ্গে ভেঙ্গে এতোদিন ওরা খেয়েছে। ব্যবসার জন্য যে ঋণের টাকা পেয়েছিল তাও শেষ। আজ আবার রামরা পথের ভিখারী। এখন কি নিদারুণ অবস্থা ওদের। ট্রেনে ট্রেনে বাদাম বিক্রি করে বেড়ায় রাম। ইতিমধ্যে দেহ জীর্ণ হ'য়েছে, চোখে মুখে দুঃখত্বের ছাপ ফুটে উঠেছে, তার সর্বাঙ্গে দেখা যায় অনাহারের চিহ্ন।

রামদের পরিণতির গল্প শুনে শিউরে উঠতেন মা। সেই সঙ্গে সুমিতও। কিন্তু উপায় নেই। উদ্বাস্তুদের খাতায় একবার যখন নাম লিখিয়েছে তখন তাদেরও নিয়মমাফিক বিদায় নিতেই হবে।

কিন্তু তারপর? আত্মীয়দের দ্বারস্থ হবে, তেমন সুযোগ নেই। মাঝে মাঝে মা বলতে লাগলেন, এরপর কি হবে?

সাহসে ভর করে মাকে প্রবোধ দিতে লাগল সুমিত, এতদূর যখন আসতে পেরেছি তখন নিশ্চয় একটা পথ হয়ে যাবে। অতো ভেবো না মা, আগে দেখাই যাক না পরীক্ষার ফলটা কি হয়।

এরপর সুদীর্ঘ তিন মাসের অবসর। অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ঝর্ণাধারা যেন নেমে এল সুমিতের জীবনে। সুদীর্ঘকাল কঠিন নিয়মের

বন্ধনের একঘেয়েমীতে তার সময় কেটেছে। মাঝে মাঝে মরূদ্যানের মতো ভারতীর সান্নিধ্য তাকে সঞ্জীবিত করলেও ভারহীন মুক্তির স্বাদ সে পায়নি। সেই মুক্তি এখন সে পেয়েছে দু-এক দিনের জন্য নয়, একেবারে মাস তিনেকের জন্য। পড়াশোনা করছে না বলে কেউ ধমকাবে না। ভারতীর সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে অতিরিক্ত কিছু সময় ব্যয় হ'লেও কেউ বোকবে না। এমনকি সঙ্গীদের সঙ্গে হা-ডু-ডু খেলতে গিয়ে অথবা অদূরের বনেজঙ্গলে কিছু বেশী সময় ঘুরে বেড়ালে ভারতী নিজে মৃদু অনুযোগ করলেও আগের মতো শাসাবে না। কথায় আছে, দুঃখের দিন যেন কাটতেই চায় না, কিন্তু সুখের দিন ফস্ করে কেটে যায়। সুমিতের তিন মাসের বাধা বন্ধনহীন সুখের দিনগুলি দ্রুত কেটে যেতে লাগল।

বলতে বলতে ফল প্রকাশের দিনটা কাছে চলে এল। হঠাৎ একদিন উদ্বাস্তু শিবিরের ছাত্রবন্ধুদের মুখে মুখে শোনা গেল, কাল রেজাল্ট আসছে।

পরদিন যথাসময়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে এবং মায়ের আশীর্বাদ সম্বল করে প্রতিবেশী বন্ধুদের সঙ্গে স্কুলের চত্বরে এসে হাজির হল সুমিত। তখনও স্কুলের কালো বোর্ডটায় নোটিশের কাগজ লাগানো হয় নি। তাদের প্রধানশিক্ষকমশাই রুদ্ধদ্বার লাইব্রেরী ঘরে কি যেন করছিলেন। ঘরের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ।

কিছু সময় পর প্রধানশিক্ষক মাননীয় শ্রীঅন্নদাচরণ ভৌমিক মহাশয় লাইব্রেরী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। গম্ভীর স্বরে বললেন, তোমরা অফিস ঘরের বারান্দার নীচে নেমে একসঙ্গে দাঁড়াও। আমি নাম ডেকে তোমাদের ফলাফল জানিয়ে দিচ্ছি।

গায়ের ঢোলা-পাঞ্জাবির পাশ-পকেট থেকে একখণ্ড ভাজ করা কাগজ বার করলেন উনি। সতীর্থদের সঙ্গে সুমিত বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠায় অস্থির চিত্তে সময় গুণতে লাগল।

একবার সকলের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে উনি ওনার হাতের ঐ কাগজটির ভাজ খোলার আগে বললেন, আজকে ফলাফল জানার পর সবাই বাড়ি চলে যাবে। যারা পাশ করেছো তারা জানবে, এটা মাত্র শিক্ষা জগতে প্রবেশের অধিকার পেলে। আরও অনেক সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠতে হবে তোমাদের। এখানেই কিন্তু শেষ নয়। আর যারা ফল ভাল করতে পারোনি, তারাও হতাশ হবে না, আবার নতুন করে প্রস্তুতি নিয়ে এগোতে হবে।

প্রাথমিক ভূমিকাটা দিয়েই উনি ঐ কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন। কাগজের প্রথম নামটা পড়েই উনি একবার তাকালেন কৃতী ছাত্রটির দিকে। ছাত্রটি সজোরে একটা প্রণাম করে হৈ হৈ করতে করতে ছুটে বেরিয়ে গেল। এমন করে একে একে আটদশটা নাম পড়া হ'য়ে গেল। সুমিতের নাম এখনো এল না। তবে কি এবার হ'ল না। ওর চোখের কোণে জল এসে গেল। না, তাই বা হবে কেন? পরীক্ষায় যা লিখেছে তাতে তার সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস আছে যে সে পাশ করবেই।

সুমিতের চিন্তার খেই হারিয়ে গেল ওনার কথা শুনে। হঠাৎ উনি ওর নামটা বলে উঠলেন। নিজের নামটা শোনামাত্র আনন্দে তার চোখের কোণে জমা জলবিন্দু টপ্ করে মাটিতে ঝরে পড়ল। শিক্ষক মশায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেই দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হ'য়ে বাড়ির দিকে ছুটল সে।

রোদ, পথেরকাঁকর, বালি, পাথরকুঁচিও তেতে ওঠা পিচের রাস্তার উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ি পৌঁছেই মা মা' বলে চিৎকার করতে লাগল।

চিৎকার শুনে ঘর থেকে মা দ্রুতবেগে বেরিয়ে এলেন।

মাকে জড়িয়ে ধরে নাচতে শুরু করে দিল সুমিত। মুখে তার কোনো কথাই সরছিল না। তার এমন রকমসকম দেখে মা ফলটা নিমেষে বুঝে নিয়েছিলেন।

হাসিমুখে মা বললেন, আমি জানতাম, তুই পাশ করবি।

এতক্ষণে একটু শান্ত হ'য়ে সুমিত প্রশ্ন করল, কৈ, কোনদিন তো বলনি।

মা বললেন, এত কষ্ট, এত যত্ন, এত নিষ্ঠা কি বৃথা যায়? আমি মুখ ফুটে কিছু বলিনি বটে, কিন্তু মনে মনে জানতাম ভগবান এবার মুখ তুলে চাইবেন।

বাড়িতে আর দাঁড়াল না সুমিত। সদ্যমুক্ত পাখীর মত ওড়ার আনন্দে ছুটল সে পাড়ার সকলকে সুখবরটা দিতে।

কয়েকটা বাড়ি ঘুরেই অবশেষে দীনাদার বাড়ি।

খবর শুনে দীনাদা খুশী, দীনাদার মতো ও বাড়ি সাবরই।

প্রণাম করে মাথা তুলে দাঁড়াতেই দীনাদার মা হাসিমুখে বললেন, ভারতীও পাশ করেছে-বাবা।

ক্রমশঃ সুপারিনটেণ্ডেন্টের কানেও পাশের খবর গিয়ে পৌঁছুল।

—সুপার সাহেবকে বলে এখানে থেকে আমার কলেজে পড়া চালানোর ব্যবস্থা করলে কেমন হয়, একদিন চল না ও'নাকে গিয়ে অনুরোধ করি। কথা কয়টি সুমিত তার মাকে বলল।

যদি সরকারী নিয়ন্ত্রনে থেকে কলেজের পড়াশোনা করা যায় তাহলে এখনই পুনর্বাসন চায় না সুমিতরা। বিশেষতঃ যখন তার ছোট ভাই দু'টি এখনও স্কুলেই পড়ছে। কোনো মতে সুমিত যদি এখানকার সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ আর একটু এগোতে পারে তাহলে তাদের মুখরক্ষা হয়। প্রবাদই তো আছে— আপন থেকে পর ভালো। তারা তো দেখেই নিয়েছে যে আত্মীয়রা তাদের জন্য বিশেষ কিছু করেনি, আর পড়াশোনায় সুমিতের উন্নতির ব্যাপারে মাথা খুঁড়ে মরলেও কেউ কিছু করবে না। এখানে সুপারিনটেণ্ডেন্ট তাদের আত্মীয় নন। তাকে বিশেষ করে ধরলে কি সুমিতের পড়াশোনা চালাবার জন্য ঐ বিশেষ সুযোগটা পাওয়া যাবে না?

আশায় বুক বেঁধে মা গেলেন সুমিতের হাত ধরে একদিন সুপারিনটেণ্ডেন্ট এর কাছে।

সমস্ত আবেদন মনোযোগ দিয়ে শুনে উনি বললেন, তা হয় না, এ ব্যাপারে আমি তোমাদের কিছু সাহায্য করতে পারবো না। সরকারি সাধারণ নিয়মটাতো কারো মুখের দিকে তাকিয়ে ভাঙ্গা যায় না।

ব্যর্থ হ'য়ে মা ফিরে এলেন ঘরে। সুমিতের 'পাশ'কে কেন্দ্র করে তাদের আনন্দের জোয়ারের রেশটুকু মিলিয়ে যেতে না যেতেই অমনি বেজে উঠল বিপদের সুর।

সুপারিনটেণ্ডেণ্ট আবার একদিন ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার পুনর্বাসন নিতে হবে, তোমরা কোথায় যেতে চাও।

যথেষ্ট বিনয় এবং আগ্রহের সঙ্গে জানালো সুমিত, কলিকাতার কাছাকাছি কোথাও দেবেন স্যার, ওখানে দিলে অন্ততঃ মজুর খেটেও খেতে পারবো।

তাদের আবেদনে উনি সাড়া দিয়েছিলেন। উদ্বেগের সংগে একদিন একদিন করে আরও ছ'মাস কেটে যাবার পর হঠাৎ একদিন খবর এল তাদের 'গাড়িয়া' পুনর্বাসনে যেতে হবে। নাম এসেছে তাদের মতো আরও ত্রিশটা ফ্যামিলির। নামগুলি সব দপ্তরের নোটিশবোর্ডে টাঙিয়ে

দেওয়া হয়েছিল।

গড়িয়ার নাম এর আগে সুমিত শোনেনি বা কোনোদিন ঐ দিকে যায় নি।

মাঝে আর মাত্র দু'দিন সময়। এরই মধ্যে তাদের সংসারের সমস্ত জিনিষপত্র বেঁধে তৈরি হতে হবে নতুন পথের যাত্রায়। জিনিষ বলতে নেই নেই করেও সহস্র রকমের আসবাবপত্র। বাতিল করতে হবে কিছু কিছু। কিন্তু নিতে হবে অনেক ছাঁটাই বাছাই করে ধীরে ধীরে সঙ্গে নেবার মালপত্র গুছিয়ে বাঁধতে শুরু করল সুমিত।

কৈশোরের বেলাভূমি ছেড়ে যেতে তার মন চাইছে না। যেদিন আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা পরিত্যাক্ত হয়ে মায়ের আঁচল ধরে ধুবুলিয়ার উদ্বাস্তু শিবিরে এসেছিল, সেদিন ভাবতেও পারেনি, এই শিবির আবার একদিন ত্যাগ করতে হবে এবং সেটা মনের দিক থেকে কঠিন ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াবে।

প্রথম উদ্বাস্তু হিসেবে এই শিবিরে এসেছিল তখন শিবির ছিল মরুভূমির মত নির্জন, শুষ্ক। আর আজ সেই শিবির হয়েছে শস্যশ্যামলা। চারিদিকে ঘর, বাড়ি, জনকোলাহল, সমস্তটা মিলে শিবির যেন তার প্রাণ পেয়েছে। যদিও উদ্বাস্তুরা তাদের বাঁচার তাগিদে সম্মিলিতভাবে শিবিরকে প্রাণ দান করেছে, তবুও এক কথায় বলা যায়, শিবির যেন একটা মায়াবিনী রূপসী কুহকী জায়গা। ওর হাতছানি সুমিতের মনকে রাহুর মত আকর্ষণে অবিরত টানছে।

সুমিত কিছুতেই পারছে না ওকে ভুলে যেতে। জিনিষপত্র বাঁধা ছাঁদা, গোছানোর ফাঁকে ফাঁকেই সে ছুটে যাচ্ছিল বন্ধুদের বাড়ি, কখনো কখনো মাঠে, পুকুরে, গাছতলায় এবং কাছাকাছি ফসলের ক্ষেত পেরিয়ে আরও কত জায়গায়।

না বন্ধু, না কৈশোরের স্মৃতি জড়ানো রম্যস্থল, কাউকেই বলতে পারছিল না সে—বিদায়! বিদায়! সে চিরদিনের মত তাদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছে।

নিজে মনে মনে ভাবছিল সে, আর বোধ হয় কোনদিন পাবে না গাছের এমন মিষ্টিমধুর স্নিগ্ধ ছায়াতল, মাঠে মাঠে খেলার সাথীদের অথবা এমন করে পুকুরে স্নান করার আনন্দ।

ওদিকে তার সাথীদেরও মন খারাপ। খেলতে পারছে না ওরা,

আসন্ন বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করে মনমরা হয়ে তার সকল রকমের সংগ থেকে বিমুখ হ'য়ে থাকছে।

অথচ এই ছাড়াছাড়িটা সমস্ত উদ্বাস্তুদের জীবনেই যে ঘটবে, সে সত্যটা কেউ মানতে পারছে না।

ঘরে ফিরে এসে দেখল মাও কাঁদছেন। দুদিন তাদের বাড়িতে রান্নাবান্নার তেমন সোরগোল নেই। যেমন তেমন ভাবে একটু ডালসিদ্ধ আর ভাত ছাড়া কিছুই হ'ল না। এক একবার প্রতিবেশীদের কারো কারো বাড়ি যাচ্ছেন আর হাউ হাউ করে কাঁদছেন। হঠাৎ এই ক্যাম্পে এসে একদিন তারা উঠেছিল, সুখেদুঃখে অজান্তেই একটা নৈকট্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সকলের সংগে, এবার আবার কোথায় কাদের কাছে যাচ্ছে কে জানে।

সামনের অনিশ্চয়তার কথা ভেবে ভেবে মা কেমন যেন উদাসীন আনমনা হ'য়ে গেছেন ইতিমধ্যে। তাঁর অতি প্রিয় ছাগল কালি রোজকার পাওনা জল-ফ্যান পাচ্ছে না, হাঁসগুলিও খাবার পাচ্ছে না। ওদের কাতর স্বরে ডাকাডাকিতে মা বিরত হ'চ্ছেন, বিরক্ত হচ্ছেন। মায়ের মনের অবস্থা বুঝে সুমিতের কষ্ট হ'ল। সে নিজেই ওদের পরিচর্য্যা করতে লেগে গেল।

প্রায় চার-পাঁচ কাঠা জায়গা সমেত বাড়িটা পেয়েছিল সুমিতরা এই ক্যাম্পে। ফেলে না রেখে সমস্ত জায়গা জুড়ে কত কত রকমারি গাছ পুঁতেছিলেন সুমিতের মা। লাউ, শিম, কুমড়ো, বকফুল, ডাঁটা—আরও কত কি। এতদিন তাদের প্রাণধারণের ঐগুলো ছিল নিত্যসংগী। কালই ঐগুলো চিরদিনের জন্য এখানে ফেলে রেখে তাদের চলে যেতে হবে। যতই ভাবছিল সেকথা, ততই মনটা বিষাদে ভরে যাচ্ছিল সুমিতের। সে বেশ বুঝতে পারছিল মানুষের মতো বহুদিনের সংগী প্রকৃতির সংগে বিচ্ছেদও একই প্রকার মনকে ব্যথিত করে।

ওদিকে ভারতীর মানসিক অবস্থা জানতে গিয়ে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। একেবারেই ভেংগে পড়েছে ভারতী। তার সামনে দাঁড়িয়ে ও আর কথা বলতে পারছে না। যখনই দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে তখনই কান্না ছাড়া কিছুই বলতে পারছে না, সুমিত ওকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল অনেক, কিন্তু প্রত্যুত্তরে ও শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

ওকে কথা দিল সুমিত ঃ আবার আসবো আমি, তোর জন্যই এখানে মাঝেমধ্যে আসবো, চিঠি দেবো, কোন চিন্তা করিস না। একটা চাকরি-বাকরি পেয়ে গেলেই মাকে বলবো সব কথা।

কিন্তু কাকে সে বলছে ওসব কথা! ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তার এত প্রতিশ্রুতিতেও ও যেন ভরসা পাচ্ছে না। কাঁদতে কাঁদতে ওর চোখদুটো জবাফুলের মতো লাল হয়ে গেছে। ক্লান্তিতে, অবসাদে ও যেন ভেংগে পড়েছে।

ওর এতো কষ্ট দেখে সুমিত ভীষন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়ল। তবু ওকে ছেড়ে দিয়ে আসতেই হ'ল তাকে। তাদের শেষ পাওনা বুঝে নিতে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছুটতে হ'ল অফিসে। পুনর্বাসনে যাবার আগে অফিসের কর্তারা পনেরো দিনের মত রেশন দিয়ে দিল, আর হাতে দিল পনেরো দিনের নগদ আর্থিক সাহায্য।

শেষবারের মতো বাড়িতে বয়ে নিয়ে এল সুমিত এখানকার রেশনের চাল, গম ও ডাল। আজ তাদের ধুবুলিয়া শিবিরবাসের শেষ দিন। এতদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে যে সূর্য্য দেখে তার মনটা আনন্দে চঞ্চল হ'য়ে উঠত, সেই সূর্য্য আজ সকাল থেকেই যেন ম্রিয়মান।

এদিন বাইরে যাবার সুযোগ নেই। বাঁধাবাঁধি ইত্যাদি সমস্ত ঘরের কাজগুলি দ্রুত সেরে ফেলতে হচ্ছে। সন্ধ্যার একটু পরেই সরকারি লরি চলে আসবে মালপত্রসহ তাদের নিতে, পোঁছে দেবে ধুবুলিয়া ষ্টেশন পর্যন্ত।

তাদের দুপুরের খাওয়ার হাংগামা মাকে নিতে দেননি ভারতীর মা। বাসনকোসন এঁটো হ'লে আবার সেগুলি মেজে বস্তাবন্দী করতে অনেক সময় লেগে যাবে, তাই উনি আগেভাগেই তাদের সকলের দু'বেলার খাওয়ার ভার তুলে নিয়েছেন নিজের হাতে।

দুপুরে সদলবলে চলে গেল দীনাদাদের বাড়ি। চোখ ছাপিয়ে কান্না এল সুমিতের, শিবিরের স্নেহ-মায়া-মমতা জড়ানো অন্ন বহু কষ্টে গলধঃকরণ করছিল। ভাত বেড়ে দিতে গিয়ে ওদের হাত থর থর করে কাঁপছিল। নিয়মের কশাঘাতে এতোদিনের যোগসূত্র নিদারুণভাবে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। বাড়ীর কোথাও ভারতীর সাড়া পাওয়াও গেল না। ও নিশ্চয়ই কান্নায় ভেংগে পড়েছে।

খাওয়ার পরই আর বসে গল্প করা বা বিশ্রাম করার সময় নেই। বাকী

বাঁধাবাঁধির কাজ সন্ধ্যার আগেই শেষ করে ফেলতে হবে। সন্ধ্যার পরই লরী পাঠিয়ে তাদের স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হবে বলে বড় কর্তাদের নির্দ্দেশ আছে।

দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে গেল। শিবিরের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে গেল সন্ধ্যার পড়ন্ত ছায়া। ঘরে ঘরে জ্বলে উঠল আলো, অথচ সুমিতরা আজ নিস্প্রদীপ অবস্থায় বসে আছে।

রাতে মা কিছু খেলেন না, দীনাদাদের বাড়ি থেকে খাবার জন্য তাদের আবার ডাক পড়ল। সময় নষ্ট করবার উপায় নেই। গাড়ী চলে আসতে পারে, তার আগে তাড়াতাড়ি খাওয়ার কাজটা সেরে রাখতে হবে।

ছোট ভাইদের নিয়ে সুমিত চলে গেল ওদের বাড়ি। এই বেলা ভারতী নিজেই খাবার বেড়ে দিচ্ছিল। কারণ ওর মা তখন সুমিতের মায়ের সংগে শেষ বারের মত কথা বলছিলেন। পাড়ার সকলেই মায়ের কাছে ভীড় করে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। সুখদুঃখের আলোচনা করছিল সবাই।

এদিন ভারতীর পরণে ছিল একটা শাড়ি। এর আগে ওকে কখনও শাড়ি পরতে দেখেনি। ওকে দেখে সুমিতের মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত ব্যথা গুমরে গুমরে উঠছিল। 'আর কিছু দেব' বা 'পেট ভরে খেয়ে নে' ছাড়া অন্য কোনো কথাই ও বলছিল না। মনের কষ্ট মনে চেপে রেখে নীরবে নিজের কর্ত্তব্য শেষ করল ভারতী।

খাওয়ার পর হাত-মুখ ধোবার জন্য সুমিত চলে গেল, ওদের লেবু গাছটার তলায়। পিছু পিছু ভারতী গিয়ে মগ থেকে তার হাতে জল ঢেলে দিল, কাঁধের উপর থেকে গামছাটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল। সুমিত হাতমুখ মুছে নিল। এইভাবে রাতের অন্ধকারে তাকে শেষবারের মত আদর আপ্যায়ন করল ভারতী। কি করুণ এই দৃশ্য। কল্পনায় এলে আজও সুমিতের প্রাণে শিহরণ জাগে।

ঐ অন্ধকারে ভারতী হঠাৎ সুমিতের পা দুখানা জড়িয়ে ধরল এবং তারপর কি তার ব্যাকুল কান্না!

কি, দেবে সান্ত্বনা ওকে তখন কিছু বলতেও পারছিল না সুমিত। তবু ওর হাত দুটো ধরে ওকে তুলে নিল। ওর চোখের জল মুছিয়ে দিল নিজের হাতে। মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, তুই ভাবিস না, আমি

তোরই।

সুমিতের কথায় ও আরও হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। ওকে শান্ত করার কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না সুমিত। বাধ্য হ'য়ে ওর হাতটা ধরে ওকে ঘরে নিয়ে এল। ওর কাছ থেকে শেষ বিদায় নিতে বুক ফেটে যাচ্ছিল সুমিতের। তবু বিদায় নিতেই হ'ল।

নিজেদের জায়গায় ফিরে গিয়ে দারুণ ব্যথা বুকে নিয়ে শিবির ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল সুমিত।

মাঝে মাঝে খেলার সাথীরা আসছিল। বিষণ্ণ বদনে তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলছিল, চিঠি দিবি কিন্তু, আমাদের ভুলে যাবি না তো?

কমল নামে এক বন্ধু বলল, আমরা যে যেখানেই যাইনা কেন, বছরে একবার করে একত্রে দিন কাটাবো। কি, তোর মনে থাকবে তো?

সাধ্যমত ওদের সব জিজ্ঞাসার উত্তর দিচ্ছিল সুমিত। এমন সময় অদূরের বিশাল চওড়া রাণওয়েটা হঠাৎ একটা তীব্র আলোর আলোয় ঝলমল করে উঠল। সকলেই চুপ করে দাঁড়িয়ে আলোটা দেখতে লাগল। আলোটা দ্রুতগতিতে আরও কাছে এগিয়ে আসছিল। আর একটু কাছে আসতেই বোঝা গেল ঐ আলোটা একটা অগ্রসরমাণ লরীর হেড-লাইট। এবার লরীর ইঞ্জিনের ভীষণ কর্কশ শব্দটা কানে এসে বাজতে লাগল। লরীটা অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে সুমিতদের এযাবৎ ব্যবহৃত ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। থামা মাত্র লরী থেকে চটু করে নামলেন সরকার বাহাদুরের প্রতিনিধি হিসেবে সকলের চিরপরিচিত তুলসীবাবু। পকেট থেকে একটা বড় কাগজখন্ড বের করে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নাম সুনন্দা চ্যাটার্জী?

ক্ষীণস্বরে মা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ।

এইগুলিই আপনার জিনিষপত্র? প্রশ্নের সংগে সংগে ওনার আংগুলের নির্দেশে কোনগুলি তাদের মালপত্র বুঝে ফেলতে কর্মচারীদের অসুবিধাটাই হ'লো না।

মায়ের মুখ থেকে সংক্ষিপ্ত 'হ্যাঁ' কথাটা বের হবার আগেই কর্মচারীদের তৎপরতায় তাদের মালগুলি ধুপধাপ করে গাড়ীর উপর পড়তে লাগল। মনে হল, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সমস্ত কাজটা শেষ হ'য়ে গেল।

তুলসীবাবুর দ্বিতীয় নির্দেশ হল: এবার আপনারা সবাই গাড়ীতে উঠুন। কোনো উত্তর করার সময় নেই। গাড়ীর চালকের নির্দেশে

ইঞ্জিন সজোরে শব্দ করছিল।

বন্ধুবান্ধব, মাসীমা, প্রতিবেশী ইত্যাদি সকলকে বিদায় জানিয়ে সুমিতরা গাড়ীতে উঠল। সমবেতদের এক কোণে তখনও ভারতী দাঁড়িয়ে। হেড লাইটের তীব্র আলোয় ওর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল সুমিত। দেখছিল ওর নির্বাক, বিবর্ণ ও বিষণ্ণ মুখটা কাঁপছে। ওকে সান্ত্বনা দেবার সময়টুকুও আর পেল না সুমিত।

ততক্ষণে বিশাল রাণওয়ের উপর দিয়ে লরীটা ছুটতে শুরু করল। সুমিতের চোখের সম্মুখ থেকে ক্রমশঃ অপসৃয়মান হতে থাকল বিগত দশ বছরের সাহচর্যে গড়ে ওঠা এখানকার বন্ধুবান্ধব, মাসীমা, প্রতিবেশীরা এবং ভারতীও। লরীতে দাঁড়িয়ে তারা হাত নাড়ছিল। ওরাও স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বিদায় জানাচ্ছিল।

তাদের গ্রুপ থেকে বেরিয়ে লরীটা ছুটে চলল সাত নম্বর গ্রুপের মধ্য দিয়ে। দু-ধারের প্রত্যেকটি বাড়িতে তখনও সন্ধ্যার আলো জ্বলছে। ঘরে ঘরে উদ্বাস্তুদের জটলা এবং চলাফেরা লক্ষ্য করছিল সুমিতরা। তারা ওদের কাছ থেকে আজ চিরদিনের জন্য বিদায় নিচ্ছে। এই ঘটনা তাদের জীবনে একটি বিশেষ অধ্যায়। যারা রয়ে গেলেন তাদের কাছে কিন্তু এই চলে যাওয়াটা প্রতিদিনের নিছক সাধারণ ব্যাপার। এরা এমনভাবে প্রায়ই সমপর্যায়ের বহু বন্ধুদের রাতের অন্ধকারে বিদায় জানিয়ে থাকে।

ছুটন্ত লরীটা সাত নম্বর গ্রুপের চত্তর ছাড়িয়ে এসে পড়ল কাঁঠাল বাগানের মধ্যে। সামনেই দেখা যাচ্ছে ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস। অফিসের পাশেই সেই বিশাল বটগাছটা দাঁড়িয়ে আছে। ওরই পাশে ঐ ত সেই পুকুর, যার সঙ্গে তার শৈশবের বহু অভিযানের সুখ-স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এই সব ছাড়িয়ে লেবেল ক্রশিং পেরিয়ে তারা অবশেষে ধুবুলিয়া স্টেশনে পৌঁছল।

লরীটা স্টেশনের সংলগ্ন বরান্দার কাছে থামতে না থামতেই কর্মচারীরা ভীষণ তৎপর হ'য়ে উঠল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তাদের মালপত্র নামানো হ'য়ে গেল। মাকে নিয়ে সুমিতদেরও নামতে হ'ল তৎক্ষণাৎ। এখনই এই লরী আবার যাবে অন্যান্য উদ্বাস্তু পরিবার বয়ে আনতে। হয়তো এরা সারারাত ধরে উদ্বাস্তু পারাপারের দায়িত্ব নিয়েছে। প্লাটফর্মে পৌঁছেই তারা দেখল দুটো খালি বগি দাঁড়িয়ে আছে। একটির মধ্যে কর্মচারীরা তাদের মালগুলি ধরাধরি করে তুলে দিল। এমনি ভাবে

সেদিন একসংগে ত্রিশটা পরিবারের মালপত্র দু'টো বগির মধ্যে লোকজন সমেত তুলে দেওয়া হ'য়েছিল। বগির একপাশে জায়গা নিয়ে তারা রাতের অন্ধকারে সময় গুণছিল, কখন তাদের যাত্রা শুরু হবে। জানতে পারল, শেষ রাত তিনটায় যে ট্রেনটা ধুবুলিয়া আসবে, সেই ট্রেনের সংগে তাদের বগি দু'টো জুড়ে দেওয়া হবে।

মাকে খবরটা পেঁ'ছে দিল সুমিত। সারারাত ধরে তাদের সকলের মাঝখানে মা জড়সড় হ'য়ে বসে রইলেন। এদিক ওদিকে অন্যান্য পরিবারগুলির ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ট্রেনের মেঝের উপর, কেউবা মালের গাদার উপর মাথা এলিয়ে দিয়ে ওরা ঘুমোচ্ছে।

সুমিত ঠিক কোন্ সময় নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছিল তা বলতে পারবে না, তবে তার স্মরণ আছে যে বিরক্ত হ'য়েই শেষ পর্যন্ত আর রাত জাগতে না পেরে বাক্সগুলির উপর শুয়ে পড়েছিল।

ঠিক ভোর ভোর সময় সেই ট্রেনটা তাদের নিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে এসে দাঁড়াল। সকলের চিৎকার চেঁচামেচিতে সুমিতেরও ঘুম ভেংগে গেল। সংগে সংগে এখানে কোন সরকারী সাহায্য পাওয়া গেলো না। নিজেরাই হাতে হাতে যে যার মালপত্র নামিয়ে শিয়ালদহের প্লাটফর্মের উপর রাখল। তাদের গাইড হিসেবে ক্যাম্প থেকে একজন মাত্র অফিসের বাবু সংগে এসেছেন। ওনার দায়িত্ব কলকাতার বাবুদের হাতে তাদের বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে যাওয়া। কলকাতার উদ্বাস্তু অফিসের বাবুরা পরবর্তী গন্তব্য স্থল গড়িয়ায় গাড়ী করে তাদের সময়মত পেঁ'ছে দেবেন। শিয়ালদহ স্টেশনেই এই উদ্বাস্তুরা অন্য কর্তার হাতে হস্তান্তরিত হবে।

তখনও কলকাতার বাবুরা এসে পেঁ'ছোয়নি। কখন ওনারা আসবেন তাও কেউ জানে না।

অধৈর্য হয়ে সুমিত সংগে আসা বাবুকে জিজ্ঞাসা করল, আমাদের এবার কোথায় নিয়ে যাবেন?

উনি উত্তর দিলেন, কলকাতার অফিস থেকে অন্য লোক এবং গাড়ী আসবে। ওরা আপনাদের ত্রিপল দেবে এবং গড়িয়ায় পেঁ'ছে দেবে।

ওনার কথা শুনে সুমিত বুঝতে পারল, আবার নতুন করে তাবুতে বাসা বাঁধতে হবে তাদের।

সকালের আলো ইতিমধ্যে স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। সমস্ত প্লাটফর্মটা পরিষ্কার হ'য়ে গেল। তাদের নিয়ে যে গাড়ীটা এসেছিল, সেটাও ছেড়ে

চলে গেল। এখন প্লাটফর্মে শুধু তারা কয়েকটি উদ্বাস্তু পরিবার ক্ষণকালের জন্য অস্থায়ী বাসিন্দা হ'য়ে বসে রইল। অন্যান্য ট্রেনের যাত্রীরা কৌতূহলী হ'য়ে তাদের যেন অনুকম্পাভরে দেখে যাচ্ছিল। যতই বেলা বাড়তে লাগল, পূব গগনের সূর্য্য আরও প্রখর তেজ নিয়ে ঊর্দ্ধ গগনে উঠতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে নিত্য যাত্রীদের যাওয়া আসা দারুণ ভাবে বাড়তে লাগল। এক-একটা ট্রেন এসে প্লাটফর্মে দাঁড়াচ্ছে, আর হু-হু করে লোক নামছে। মনে হয় এ যেন এক জন সমুদ্র। স্রোতের পর স্রোত। এর আর শেষ নেই।

এর মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে আছে উদ্বাস্তুর দল। সঙ্গে তাদের অতি সামান্য ভাঙ্গা-চুরা জিনিষ পত্র। কেউ ওদের এমন নোংরা চেহারা দেখে নাকে রুমাল চেপে চলে গেল, কেউবা মন্তব্য করল, এবার বুঝি আবার শিয়ালদহর প্লাটফর্মটা ওদের বাড়িঘর হয়ে যাবে। এত উদ্বাস্তু আসছে কোথা থেকে ?

কেউ বা তারই কথার রেশ টেনে বলতে লাগল, এরা আবার উদ্বাস্তু নাকি মশাই, সরকারি দাঁও মারার ধান্দা! দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই তো এদের রাজত্ব চালু হয়েছে। একটু ফাঁকা জায়গা পেলেই হয়। দেখুন আবার কার জায়গায় বসবে, ভেবে এসেছে।

এমন বহুজনের বহু মত, বহু অবজ্ঞার কথা সুমিতের কর্ণকুহরে পাষাণের মত বিঁধছিল। কিন্তু অর্থহীন নিরুপায় মানুষের প্রতিবাদের ভাষা নেই। শুধু মনের জ্বালা মনেই দুমড়ে মরছে।

এবার সুমিত এদের কথার বন্যা থেকে নিজে রেহাই পেতে চাইল।

ক'দিন ধরে ভীষন পরিশ্রম হয়েছে। অবসন্ন শরীরটা একটু চাঙ্গা করার জন্য মাকে সুমিত বলল, আমি স্টেশনের ওপাশের দোকান থেকে একটু চা খেয়ে আসি ?

ভায়েরা মায়ের পাশে জড়োসড়ো হ'য়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ঘুমোচ্ছিল।

মা বললেন, পয়সা পাবি কোথায় ?

মাকে বলল সুমিত, আমার কাছে আছে।

বহুদিন ধরে এক একটা করে জমানো পয়সা মিলে সুমিতের সর্বশেষ সম্বল হ'য়েছে মাত্র চার আনা। এই চার আনার উপর ভরসা করে চা খেতে এগোল সে।

মা সাবধান করে দিলেন ঃ বেশী দূরে যাবি না, হারিয়ে যাবি। তাছাড়া মালপত্রগুলি স্টেশনে পড়ে থাকছে—লক্ষ্য রাখা দরকার।

'এখুনি চলে আসব' বলে কয়েক পা এগিয়েই স্টেশনের একপাশে ঝুপড়ি মতো একটা দোকানে ঢুকে চায়ের অর্ডার দিল সুমিত।

একজন বৃদ্ধ অতি কষ্টে একটা কাঁচের গেলাসে চা করে দিল।

চায়ের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ভাবছিল সুমিত ঃ মাকে এবার সংসারের ভার একা বইবার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতেই হবে। মায়ের এত কষ্ট আর সহ্য করা যায় না। বৃদ্ধের চায়ের দোকানের চেহারাটা দেখে ভাবল, এমনই একটা দোকান করলে তো কিছু আসান হয়।

সত্যিই কি আগামী দিনের ভয়াবহ সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবে, এত বড় সংসারের বিরাট দায়িত্ব একা নিজের ঘাড়ে সে তুলে নিতে পারবে? এইসব ভাবতে ভাবতে মনটা ভীষণ অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল তার। হঠাৎ তার হাত থেকে চায়ের গ্লাসটা স্লিপ করে রাস্তার উপর পড়ে গেল এবং সংগে সংগে গ্লাসটা ভেংগে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল।

তার হাত ফস্কে যাওয়ায় অবাক হ'য়ে গেল সুমিত। নিজের অপরাধটিকে কিছুটা লাঘব করার জন্য কাঁচের টুকরোগুলি কুড়োতে লাগল।

সেই মুহূর্তে বৃদ্ধ দোকানদার 'এ্যাঁ' শব্দ করে বলল, না না খোকাবাবু তোমার ওতে হাত দিতে হবে না, আমি ঝাঁটা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছি।

বৃদ্ধের সহানুভূতিসূচক কথাগুলি সুমিতের মনকে স্পর্শ করল। ওর কথায় নিজের অপরাধী মনটা একটু যেন নিশ্চিন্ত হল। খুব বিনয়ের সংগে সে বলল, আমার চায়ের দাম কত হ'ল?

বৃদ্ধ বলল, তুমি বাপু চায়ের জন্য দাও এক আনা, আর গ্লাসের জন্য দাও তিন আনা, মোট চার আনা।

হিসাব শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল সুমিতের। তার তখন শেষ সম্বলই আছে মাত্র চার আনা, নিজের হাতে সংসারের ভার আসতে না আসতেই তাও খরচ হ'য়ে গেল!

কথা কটা মনে মনে ভাবতে লাগল। সারা দুনিয়াটা তার চোখের সামনে আবছা হয়ে গেল। শরীরের মধ্যে হীম প্রবাহ বইতে লাগল।

তার কল্পনার মূলধন নিঃশেষ হতে চলেছে। এরপর তার আর কোন সম্বলই রইল না। এমনি একদিন দশ বৎসর আগে রিক্ত হস্তে ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু শিবিরের জন্য সে রওনা হয়েছিল। আজও ঠিক দশ বৎসর পর শিবির ত্যাগ করে, কলিকাতার বুকে রিক্ত হস্তে হাজির হল। সেই দিনের সংগে আজকের দিনের সামান্যই তফাত। সেদিন তার বয়স ছিল মাত্র সাত বৎসর, আর আজ সে আটারো বৎসরে পা দিয়েছে। সেদিন সে মায়ের ভরসায় শিবিরের বাসিন্দা হয়েছিল। আর আজ মা তার ভরসায় শিবির ত্যাগ করে এসেছে। সব কথা ভেবে ভেবে সে নির্বাক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আবার বৃদ্ধ বলল, কৈ খোকাবাবু পয়সাটা দাও।

সুমিতের চৈতন্য ফিরে এল, ও হ্যাঁ বলে—ধুবুলিয়ার উদ্বাস্তু শিবির থেকে পাওয়া ডোরাকাটা জামার পকেটে হাতটা ঢুকিয়ে দিল। হাতে তুলে নিল তার শেষ মূলধনটি। ঠোঁটটা আবেগে কাঁপছিল, হাতটাও সম্ভবত কাঁপছিল তবুও তারই মধ্যে বলল সে, নিন।

পয়সাটা বৃদ্ধকে বুঝিয়ে দিয়ে রিক্ত হস্তে মায়ের কাছে এসে মাথা নীচু করে প্লাটফর্মের মেঝেতে বসে পড়ল।

কলকাতার উদ্বাস্তু অফিসের বাবুরা তখনো এসে পৌঁছোয় নি।